সূচীপত্র

ভূমিকা গ]

প্রথম পরিচ্ছেদ পৃষ্ঠা

প্রাগৈতিহাসিক বিশ্বের চিন্তাধারা—ব্যাবিলন, মিশর ও সিন্ধু সভ্যতা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ পৃষ্ঠা ১৯

বৈদিক সভ্যতা ও অধ্যাত্ম-চিন্তা—বেদের কাল, বেদের সমাজ, বেদের ধর্ম, বেদের দেবতা, ঈশ্বর চিন্তার সূত্রপাত, আত্মা ও পরলোক, ব্রাহ্মণ-আরণ্যক ও উপনিষদে ঈশ্বর চিন্তা

তৃতীয় পরিচ্ছেদ পৃষ্ঠা ৫৩

ভারতীয় দর্শন—ষড বেদাঙ্গ, ষড় দর্শন, কপিল ও সাংখ্য দর্শন, কণাদ ও বৈশেষিক দর্শন, গোতম ও ন্যায় দর্শন, পতঞ্জলি ওযোগদর্শন, জৈমিনি ও মীমাংসা দর্শন, বেদব্যাস ও বেদান্ত দর্শন, চার্বাক ও চার্বাক দর্শন

চতুর্থ পরিচ্ছেদ পৃষ্ঠা ৭৯

হিন্দু শাস্ত্রে ধর্মতত্ত্ব—স্মৃতিশাস্ত্র, পুরাণ, গীতা, তন্ত্র

পঞ্চম পরিচ্ছেদ পৃষ্ঠা ৯১

বিশ্বের অন্যান্য ধর্মমত—পার্শ্ব, মহাবীর ও জৈনধর্ম, বুদ্ধ ও বৌদ্ধ ধর্ম, জরথুশ্‌ত্র ও মজ্‌দা য়স্ন, লাও-ৎসু ও তাওবাদ, কন্‌ফুশিয়স ও তাঁর ধর্ম, ইহুদী ও জুডা ধর্ম, যীশুখ্রীষ্ট ও খ্রীষ্ট ধর্ম, হজরত মোহাম্মদ ও ইসলাম ধর্ম, গুরু নানক ও শিখ ধর্ম

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ পৃষ্ঠা ১২৮

হিন্দুধর্মে বিভিন্ন মতবাদ—শঙ্কর ও অদ্বৈতবাদ, রামানুজ ও বিশিষ্টা-দ্বৈতবাদ, নিম্বার্ক ও স্বাভাবিক দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, মধ্ব ও দ্বৈতবাদ, রামানন্দ ও ভক্তিবাদ, চৈতন্যদেব ও অচিন্ত্য ভেদাভেদ বাদ, বল্লভ ও শুদ্ধাদ্বৈতবাদ

সপ্তম পরিচ্ছেদ পৃষ্ঠা ১৫০

হিন্দুধর্মে সম্প্রদায় ভেদ—বৈষ্ণব সম্প্রদায়, শ্রীসম্প্রদায়, ব্রহ্মসম্প্রদায়, রুদ্র

সম্প্রদায়, সনকাদি সম্প্রদায়, রামানুজ সম্প্রদায়ের শাখাপ্রশাখা—আচারী, রামানন্দী বা রামাৎ, কবীর পন্থী, দাদূপন্থী, রুইদাসী, সেনপন্থী, খাকী, মলূক দাসী, রাম সনেহী, মীরা বাঈ, তুলসী দাস, বারকরী বা বিট্‌ঠল সম্প্রদায়, চৈতন্য সম্প্রদায় ও তার শাখা প্রশাখা, শঙ্কর দেব ও মহাপুরুষিয়া সম্প্রদায়, শৈব সম্প্রদায়—দশনামী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়, দণ্ডী, সন্ন্যাসী, নাগা, অঘোরী, আমেখিয়া, দঙ্গলী, তপস্বী সন্ন্যাসী, ঠিকরনাথ, স্বর্ভঙ্গী, ব্রহ্মচারী, যোগী, নাথ সম্প্রদায়, বসব ও লিঙ্গায়েৎ সম্প্রদায়, আতুর মানস ও অন্তসন্ন্যাসী, ভোপা, দশনামী ভাঁট; শাক্ত সম্প্রদায়—কাপালিক, করারী, ভৈরব ও ভৈরবী, চলিয়া-পন্থী; গাণপত্য সম্প্রদায়; সৌর সম্প্রদায়

অষ্টম পরিচ্ছেদ — পৃষ্ঠা ১৯৩

আধুনিক যুগের অধ্যাত্মবাদ—রামমোহন রায় ও ব্রাহ্মসমাজ, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ব্রাহ্মধর্ম, কেশবচন্দ্র সেন ও নববিধান, সহজানন্দ স্বামী ও স্বামীনারায়ণ সম্প্রদায়, দয়ানন্দ সরস্বতী ও আর্যসমাজ, রামকৃষ্ণ পরমহংস, বিবেকানন্দ ও রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন, নারায়ণ গুরু, শ্রীঅরবিন্দ, রমণ মহর্ষি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নবম পরিচ্ছেদ — পৃষ্ঠা ২০৭

উপসংহার

গ্রন্থপঞ্জী — পৃষ্ঠা ২১৫

ভূমিকা

ঈশ ও ঈশ্বর এই দুটি শব্দই ঈশ্‌ ধাতু থেকে উৎপন্ন এবং সমার্থক। প্রভু, নিয়ন্তা, সমর্থ, স্বকার্যকরণক্ষম ইত্যাদি নানা অর্থে এদের ব্যবহার। সাধারণত ঈশ শব্দটি অন্য শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয় এবং ঈশ্বর শব্দটি একক ও যুক্ত দু রকম ভাবেই ব্যবহৃত হয়। ঈশ্বর শব্দের বিশেষ অর্থ উপনিষদের ভাষায় ব্রহ্ম এবং প্রচলিত ভাষায় ভগবান। স্কন্দ পুরাণে একটি শ্লোক পাওয়া যায়।—

ঈশ এবাহমত্যর্থং ন চ মামীশতে পরে।
দদামি চ সদৈশ্বর্যং ঈশ্বর স্তেন কীর্তিতে॥

এর অর্থ আমিই সকলের নিয়ন্তা এবং আমার কোন নিয়ন্ত্রা নেই। আমি সর্বদাই ঐশ্বর্য দান করি বলে লোকে আমাকে ঈশ্বর বলে। ঈশ্বর শব্দ এই গ্রন্থে ব্রহ্ম বা সৃষ্টিকর্তা ভগবান রূপেই ব্যবহৃত হয়েছে।

ধর্ম আর একটি বিতর্কিত শব্দ। ধৃ ধাতু থেকে উৎপন্ন বলে এর অর্থ যা ধৃত হয় বা যার দ্বারা কিছু ধৃত হয় অথবা যা কিছুকে ধারণ করে তা ধর্ম। ঋগ্বেদে যজ্ঞের নাম ধর্ম ; ক্রমে এই ধর্মের মধ্যে সত্য, অহিংসা, ব্রহ্মচর্য, অস্তেয় প্রভৃতি শাস্ত্র-বিহিত কর্তব্য কর্মও যুক্ত হয়। কর্মের ফলও ধর্ম, বস্তুর স্বভাব গুণ বা শক্তিও ধর্ম এবং মত ও সত্যও ধর্ম। সত্যই ধর্ম এবং ধর্মই সত্য। একসময়ে ইংরেজী religion শব্দে জুডা, খ্রীষ্ট ও ইসলাম এই তিনটি সেমেটিক গোষ্ঠীর একেশ্বরবাদী ধর্ম বোঝাত এবং জৈন, বৌদ্ধ, কনফুশীয় প্রভৃতি নিরীশ্বরবাদী মতকে religion না বলে লাতিন fides থেকে উৎপন্ন faith বলা হতো। এখন অবশ্য religion শব্দে সব মতবাদই বোঝায়। ধর্ম শব্দটির অর্থ আরও ব্যাপক এবং এই ব্যাপক অর্থেই ধর্ম শব্দটি এই গ্রন্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

হিন্দু শব্দটি পুরাকালে প্রচলিত ছিল না। মনে হয় পারসীকরাই প্রাচীনকালে সিন্ধু নদীর উপত্যকাবাসী ভারতীয়দের হিন্দু বলত। গ্রীকদের মুখে এই হিন্দু শব্দ ইন্দুতে রূপান্তরিত হওয়ায় India শব্দ পাশ্চাত্যে প্রচলিত হয়েছে। কিন্তু ভারতীয়রা হিন্দু শব্দটি বর্জন করে নি ; ভারতের সনাতন ধর্মের নাম হয়েছে হিন্দুধর্ম। পরবর্তীকালে ভারতেরই মাটিতে উদ্ভূত জৈন বৌদ্ধ ও শিখধর্মকে আর ভারতীয় ধর্ম বা হিন্দুধর্ম বলা হয় না।

এই গ্রন্থে হিন্দুধর্মের আলোচনার পুর্বে প্রাগৈতিহাসিক বিশ্বে ঈশ্বর চিন্তার আলোচনা করা হয়েছে। হিন্দুধর্ম ও দর্শনের মূল তত্ত্বালোচনার পরে বিশ্বের অন্যান্য ধর্মের কথাও সংক্ষেপে বলা হয়েছে। তারপর হিন্দুধর্মের বিভিন্ন মতবাদ ও সম্প্রদায়ের পরিচয় দেবার চেষ্টা হয়েছে। এই সব সম্প্রদায়ের এত শাখা প্রশাখা এবং তাদের মধ্যে মিল এমন সূক্ষ্ম ও জটিল যে তার পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ কতকটা অসম্ভব বলে তা থেকে বিরত থাকা হয়েছে। কিছু সন্ত ও সাধকেব পরিচয়ও সন্নিবিষ্ট হয়েছে; কিন্তু স্বল্প পরিসরের মধ্যে সকলেব পরিচয় দেওয়া সম্ভব হয় নি। আধুনিক যুগের অধ্যাত্মচিন্তার কথাও সংক্ষেপে বলা হয়েছে; কিন্তু সকলের চিন্তাব কথা বলবার সুযোগ হয় নি। বিশ্বেব, বিশেষ করে ভারতেব, অধ্যাত্ম চিন্তার একটা ধাবাবাহিক বিবরণ স্বল্প পরিসরের মধ্যে লিপিবদ্ধ কবতে অনেক সম্প্রদায়ের এবং সঠিক ও মহাপুরুষের কথা অনিচ্ছায় বর্জন করতে হয়েছে। পাঠক যদি এই গ্রন্থ পাঠ করে ঈশ্বর ও ধর্ম সম্বন্ধে একটা ধাবণা কবতে পাবেন, তবে গ্রন্থকাবের শ্রম সার্থক হবে। অলমতি বিস্তারেন।

গ্রন্থকার

'রম্যাণি'
বি. এফ. ৭৭, সল্টলেক সিটি,
কলিকাতা

তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো চিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ
সর্বস্মাৎ অন্তরতরং যদয়ামাত্মা।

—বৃহদারণ্যক উপনিষৎ ১ ৪.৮

তোমারে বলেছে যারা পুত্র হতে প্রিয়,
চিত্ত হতে প্রিয়তর, যা-কিছু আত্মীয়
সব হতে প্রিয়তম নিখিল ভুবনে,
আত্মার অন্তরতর, তাদের চরণে
পাতিয়া রাখিতে চাহি হৃদয় আমার।

—রবীন্দ্রনাথ।

প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রাগৈতিহাসিক বিশ্বের চিন্তাধারা

ব্যাবিলন—মিশর ও সিন্ধুসভ্যতা

ব্যাবিলন

তুমি উদিত হলে দেবতারা সমবেত হন ;
তোমার তীব্র দীপ্তি পৃথিবী আচ্ছন্ন করে।
চারিদিক থেকে নানা কণ্ঠের প্রতিধ্বনি ওঠে :
তুমি তাদের অভিসন্ধি জানো, তুমি দেখতে পাও তাদের পদক্ষেপ,
সমস্ত মানুষ একসঙ্গে তোমার দিকে তাকিয়ে থাকে।
যারা কুকর্ম করে তারা তোমার ভয়ে কাঁপে ;
যারা অন্যায় করে তাদের তুমি নিচে থেকে উপরে তুলে আনো।
ও সামস, তোমার বিচার ন্যায়সঙ্গত বলেই,
তোমার নাম জ্যোতির্ময়
যে পথিকের পথ দুস্তর তুমি তার পাশে থাকো,
সমুদ্রের যে যাত্রী বন্যাকে ভয় পায়, তুমি তাকে সাহস জোগাও।
যে পথ আবিষ্কৃত হয় নি সে পথ তুমি শিকারীকে দেখাও,
ও সামস....

সামস বা Shamash সূর্যের নাম। কিন্তু এ নাম এ কালের কোন দেশের ভাষাতেই পাওয়া যাবে না। সূর্যকে এই নামে অভিহিত করেছিল প্রাচীন ব্যাবিলোনিয়ার মানুষ। এশিয়ার পশ্চিম প্রান্তে ছিল এই দেশ, ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস নদীর মধ্যবর্তী উপত্যকায়। এই অঞ্চলকে সুমের ও এখানকার অধিবাসীদের সুমেরীয় জাতি বলা হয়। এইখানেই বিশ্বের প্রাচীনতম সভ্যতার বিকাশ হয়েছিল বলে অনেকের বিশ্বাস।

অনুমান করা হয় যে গত বারো হাজার বছরে পৃথিবীর মানচিত্রের খুব বেশি পরিবর্তন হয় নি। আট ন হাজার বছর আগে মানুষ এশিয়ার বড় বড় নদীর উর্বর উপত্যকায় এবং আফ্রিকার নীলনদের ধারে ছোট বড় উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। মেসোপটেমিয়ার দক্ষিণে এই রকমের একটি বিখ্যাত উপনিবেশ শহরের নাম ছিল ব্যাবিলন। লিপি আবিষ্কার যদি সভ্যতার প্রধান পরিচয় হয় তবে এ কথা স্বীকার করতে হবে যে সে সম্মান ব্যাবিলনেরই প্রাপ্য। পাঁচ হাজার বছর আগেই সেখানে লেখার প্রচলন হয়েছিল। এদের লেখার পদ্ধতি অনুসরণ করেই পরবর্তী কালে কিউনিফর্ম বর্ণমালার প্রচলন হয়।

এই সভ্যতার কথা পৃথিবী থেকে নিঃশেষে মুছে গিয়েছিল। কোন সূত্র থেকেই তা জানার উপায় ছিল না। গত শতাব্দীতে হঠাৎ একটা আবিষ্কার সবাইকে চমকে দিল। বর্তমান ইরাকের সীমানায় মাটির নিচে থেকে বেরোতে লাগল একটা স্বর্ণযুগের নানা নিদর্শন। জানা গেল যে একজন আসিরীয় রাজা খ্রীষ্টের জন্মের সাড়ে ছ শো বছর আগে সে যুগের সমৃদ্ধির কথা মাটির তৈরি ফলকের উপরে লিখে রেখে গেছেন। একটি দুটি ফলক নয়, অসংখ্য মৃৎলিপির একটি লাইব্রেরি। এইসব থেকেই ইতিহাসের উপাদান পাওয়া গেল। সুমেরীয়রা ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস নদীতে খাল কেটে এই উপত্যকার শহর ও নগরগুলি জলপ্লাবন থেকে রক্ষা করার ব্যবস্থা করেছিল। শিল্প বাণিজ্য এমনকি বিজ্ঞানেও অনেক উন্নতি করেছিল তারা। তাদের পরে এক সেমেটিক জাতি অ্যাকাডকে কেন্দ্র করে একটি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। তারপরে আসিরীয়রা আরও উত্তরে এগিয়ে সাম্রাজ্য বিস্তার করে। হ্যামুরাপি বা খ্যামুরাবি নামে একজন পরাক্রান্ত সম্রাটের নাম পাওয়া যায়, তাঁর কাল ২১২৩ থেকে ২০৮১ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দ। তিনি যে আইন বিধিবদ্ধ করে প্রচলন করেছিলেন, সেই কোড বা আইন সংগ্রহ ও আবিষ্কৃত হয়েছে।

ব্যাবিলনীয়দের ধর্মচিন্তা সম্বন্ধেও অনেক কিছু জানা গেছে। প্রতিবেশী মরুভূমি অঞ্চলে তখন দৈত্যপূজার প্রচলন ছিল। প্রথম দিকে তারাও

এতে বিশ্বাস করত। তারপর ধীরে ধীরে দেবতায় বিশ্বাস এলো তাদের। প্রথমে অনেক দেবতার উপাসনা করত, পরে সামস প্রধান দেবতায় পরিণত হলেন। তাঁর উদ্দেশে স্তব রচিত হল, অসংখ্য স্তব স্তোত্র ও মন্ত্র। বলি সঙ্গে উৎসর্গ।

গোড়ায় যে সূর্যের স্তব দেওয়া হয়েছে তা প্রায় দুশো লাইনের একটি কবিতার প্রথমাংশ। এটি Hastings-এর Encyclopedia of Religion and Ethics গ্রন্থে A. Jeremias-এর ইংরেজী অনুবাদ থেকে বাঙলায় অনুবাদ করা হয়েছে। শুধু সূর্যের স্তব নয়, ধর্ম সম্বন্ধে আরও অনেক কবিতার টুকরো পাওয়া গেছে—জীবন সম্বন্ধে চিন্তা ধারণা, পাপের শাস্তি বা ভালো মন্দর কারণ অনুসন্ধান। এর মধ্যেই আছে The Code of Hammurapi—একটি বিরাট পাথরের উপরে খোদাই করা রাজা হামুরাপির প্রচলিত আইনের দুশো-বিরাশিটি অনুচ্ছেদ। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে এটি আবিষ্কৃত হয়েছে।

ব্যাবিলনীয়দের চিন্তাধারার সঙ্গে ইহুদীদের ওল্ড টেস্টামেন্টের আশ্চর্য মিল দেখে অনেকে মনে করেন যে তারা ব্যাবিলনীয় চিন্তাধারায় প্রভাবিত হয়েছিল। ইতিহাস এ কথা সমর্থন করে। ৫৮৬ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে তারা পঞ্চাশ বছরের জন্য ব্যাবিলনে নির্বাসিত হয়েছিল এবং এই সময়েই তারা তাদের ধর্মগ্রন্থ সম্পূর্ণ করে। বাইবেলে সৃষ্টি বন্যা ও ভাষার বিভিন্নতা সম্বন্ধে যে সব কাহিনী আছে তা নিঃসন্দেহে ব্যাবিলন থেকেই সংগৃহীত। আবার ইহুদীরা যে অনেক কিছু নিজেদের পছন্দ মতো বদলে নিয়েছে, তাতেও সন্দেহ নেই। যেমন, ব্যাবিলনের লোক স্যাবাটাম একটা খারাপ দিন মনে করত, কিন্তু ইহুদীরা হিব্রু স্যাবাথ কে বলল একটি পবিত্র বিশ্রামের দিন।

আর একটা কথাও মনে রাখবার মতো। পরবর্তীকালে এ অঞ্চলেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন যীশু খ্রীষ্ট ও হজরত মোহাম্মদ। তাঁদের ধর্মমত যে এই প্রাচীন ব্যাবিলনীয় চিন্তাধারায় প্রভাবিত হয় নি, তা জোর করে বলা যায় না।

মিশর

মিশরের সভ্যতা ব্যাবিলনের আগের না পরের, সে বিতর্কের মীমাংসা এখন আর সম্ভব নয়। কাজেই সমসাময়িক বলে মেনে নেওয়াই যুক্তিসঙ্গত। তবে একটা সত্য মেনে নিতে হয়। কোন এক সময়ে এই দেশে একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। অনেকে বিশ্বাস করেন যে এই মতবাদ তারা ভারত থেকে আমদানি করেছিল এবং পরবর্তী কালে নিগ্রো জাতির সংস্পর্শে এসে তাদের সমাজে বহু দেবতার প্রচলন হয়। কিন্তু সাধারণ ভাবে বিচার করলে মনে হয় যে সমাজে বহু দেবতার আরাধনা থেকেই একেশ্বরবাদের জন্ম হয়। ভয় বা বিস্ময় থেকে যে সব দেবতার কল্পনা, তারই পরিণামে ঈশ্বরের অন্বেষণ। বহু ঋষি মনীষার চিন্তার ফসল রূপেই একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পৃথিবীতে। ভারতেও তাই হয়েছিল। মিশরে তার ব্যতিক্রম হয়েছিল মনে করবার কোন কারণ নেই।

জানা যায় যে মিশরের নানা দেবতার মন্দিরে দেবতারা সপরিবারে পূজিত হতেন। স্বামী স্ত্রী একটি পুত্র বা কন্যা এই তিনজনের বিগ্রহ থাকত মন্দিরে। নগরগুলি এক একজন দেবতার নামে উৎসর্গ করা হতো. ওসিরিস অনহুর আপ্ত বা Ptah রা শু তেফ্‌নেট সেব সেট হোরাস আমেন মেন্থু আত্থু সেবেক—এইসব দেবতার নাম। এর মধ্যে অনেকগুলি নাম সূর্যের নামান্তর। এই দেবতারা বাস করেন স্বর্গে এবং মর্ত্যে যাতায়াত করেন নৌকোর আকৃতি এক রকমের আকাশযানে।

মিশরের জনসাধারণ বিশ্বাস করত যে আত্মার বিনাশ নেই এবং কর্মফল ভোগের জন্য মানুষকে বার বার জন্ম নিতে হয়। পাপপুণ্যের বিচার হয় মৃত্যুর পরে। পুণ্যবানরা স্বর্গসুখ ভোগ করে, আর পাপীদের জন্য আছে নরক যন্ত্রণা। কর্মের তারতম্য অনুযায়ী ফল ভোগ করতে হয়। এর থেকে মুক্তির কোন পথ নেই। সকল মানুষকেই জন্মান্তরে ফল ভোগ করতে হবে।

এই বিশ্বাস সবার মনে যখন গভীরতর হল, তখন মন্দিরের পুরোহিতরা নূতন প্রথার উদ্ভব করলেন। মৃতদেহের উপরে মন্ত্রপাঠ করলে আত্মা

পাপমুক্ত হয়ে স্বর্গের অধিকারী হবে এবং পাথরের শবাধারে এই দেহ সমাহিত করলে স্বর্গে সে সুন্দর গৃহে বাস করতে পারবে। পুরোহিত প্রবর্তিত এই সংস্কার যে কত গভীর ভাবে সকলে বিশ্বাস করেছিল, তার প্রমাণ আজও আছে। ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে শবাধারে মৃতদেহ রক্ষা ও সমাধি-মন্দির নির্মাণ একটা কর্তব্যরূপে গ্রহণ করা হয়েছিল। মোম ও নানা ভেষজ দিয়ে মৃতদেহ রক্ষার ব্যবস্থা হয়। এর নাম মামী। স্বর্গ বা নরক ভোগের পর আত্মা পৃথিবীতে ফিরে এলে এই মৃতদেহে যে নূতন প্রাণের সঞ্চার হবে, এতে আর কারও সংশয় রইল না। সম্রাটরা এই শবাধারের উপরে যে সব বিরাট পিরামিড নির্মাণ করে ভিতরের প্রকোষ্ঠগুলি ধনরত্নে পূর্ণ করে দিতেন, তার থেকেই বোঝা যাবে যে আত্মায় বিশ্বাস তাদের কত গভীর ছিল। শবাধার রক্ষার জন্য তাঁরা পুরোহিত নিযুক্ত করতেন।

এর অনেক দিন পরে চতুর্থ আমেনহোটেপের রাজত্বকালে এক আশ্চর্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এই বিখ্যাত নৃপতির রাজত্বকাল ১৩৭০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দ। তিনি প্রজাদের নির্দেশ দিলেন যে সমস্ত দেবতার পূজা বন্ধ করে শুধু অ্যাটনের পূজা করতে হবে। অ্যাটন বা Aton হলেন সূর্য। এই আদেশ জারির পিছনে হয়তো পুরোহিতদের ক্ষমতা খর্ব করার উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু তার নিজের মনে যে একেশ্বরের চিন্তা উদিত হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। অ্যাটনকে তিনি অনেক দেবতার মধ্যে একজন বলে মনে করেন নি, তিনি তাঁকে সবশক্তিমান ও বিশ্বের স্রষ্টারূপেই কল্পনা করেছিলেন। তার নিজের রচিত অথবা তাঁরই আদেশে রচিত কয়েকটি স্তোত্রে এই ভাবই প্রকাশ পেয়েছে।—

আকাশের দিগন্তে তোমার উদয় অতি সুন্দর,
ও প্রাণবন্ত অ্যাটন, জীবনের জন্মদাতা!
তুমি যখন পূর্বের আকাশে উদিত হও,
তখন পৃথিবীকে পূর্ণ করে দাও তোমার সৌন্দর্যে।
তুমি সুন্দর, মহৎ, দীপ্তিমান, তুমি সবার উপরে,

তোমার রশ্মি এই পৃথিবী ও তোমার সৃষ্টিকে আবৃত করে।
তুমি সর্বময়, সবাইকে বন্দী করে নিয়ে যাও,
বেঁধে রাখো তোমার প্রেম দিয়ে।
তুমি অনেক দূরে আছ,
কিন্তু তোমার রশ্মি আছে পৃথিবীর উপরে ;
তুমি উঁচুতে আছ ঠিকই,
কিন্তু তোমার পদচিহ্ন হল দিন।

J. H. Breasted-এর Development of Religion and Thought in Ancient Egypt গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ থেকে বাঙলা করা হল। কিন্তু এটি মিশরের প্রাচীনতম রচনার নিদর্শন নয়। এর বহু পূর্বে খ্রীষ্টের জন্মের দু হাজার ছশো বৎসর পূর্বে আপ্তু-হোটেপ বা Ptah-hotep নামে এক ধর্মপ্রাণ লেখক বাস করতেন। তার লেখা বলে একখানি গ্রন্থ প্রচলিত ছিল এবং এইটিই বিশ্বের প্রাচীনতম গ্রন্থ বলে অনেকের ধারণা। কিন্তু পণ্ডিতরা মনে করেন যে এই গ্রন্থটি পরবর্তী কালে রচিত হয়ে আপ্তু-হোটেপের নামে প্রচারিত হয়েছিল। তবে এ কথা মেনে নেওয়া হয়েছে যে হাজার চারেক বছর পূর্বেও এই গ্রন্থ মিশরের বিদ্যালয়গুলিতে পড়ানো হতো। এটি কোন ধর্মগ্রন্থ নয়, এতে শুধু সৎভাবে জীবন যাপনের কিছু উপদেশ সংকলিত হয়েছে।

মৃতের গ্রন্থ নামে আরও কিছু রচনা আনুমানিক ১৪০০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে প্রচলিত ছিল। এই গ্রন্থ আরও প্রাচীনকালে রচিত হতে পারে। এতে বলা হয়েছে যে এই গ্রন্থ যার পড়া আছে অথবা যার সমাধিতে এর বিষয়-বস্তু লেখা হবে, তার জন্য স্বর্গে সুন্দর আবাস ও পর্যাপ্ত আহারের অভাব হবে না।

এই সময়ে বা এর পরবর্তী কালে রচিত কিছু কবিতা পাওয়া যায়। পিরামিডের মতো শক্ত সমাধি ভেঙে পড়তে দেখে নানাভাবে দুঃখ প্রকাশ করা হয়েছে। তার ধুয়া ‘কার কাছে আজি আমি এসব কথা বলব !’

সিন্ধু সভ্যতা

প্রাগৈতিহাসিক যুগে ব্যাবিলন ও মিশরে আমরা সূর্যকে প্রধান দেবতা রূপে পেয়েছি। কিন্তু ভারতের আদি গ্রন্থ ঋগ্বেদে আমরা সূর্যের স্তব মাত্র একটি ঋকে পাই। প্রথম মণ্ডলের দ্বাবিংশ সূক্তের পঞ্চম ঋকে কণ্বের পুত্র মেধাতিথি ঋষি গায়ত্রী ছন্দে বলছেন, হিরণ্যপাণি সবিতাকে আমি রক্ষণার্থ আহ্বান করি, সেই দেবতা যজমানের প্রাপ্যপদ জানিয়ে দেবেন।—

হিরণ্যপাণিমূতয়ে সবিতারমুপ হ্বয়ে।
স চেত্তা দেবতা পদম॥ —ঋগ্বেদ ১।২২।৫

পণ্ডিতরা বলেন যে সূর্য আর্য-জাতির প্রধান দেবতা ছিলেন এবং আর্যরাই পৃথিবীর নানা দেশে সূর্যের মহিমা প্রচার করেছেন। কাজেই এ কথা মেনে নিতে হয় যে আর্যদের আগমনের পরেই সূর্যের মহিমা দেশে দেশে বিস্তার লাভ করে।

কিন্তু ভারতে আর্য বা বৈদিক সভ্যতা বিস্তৃত হবার বহু পূর্বে একটা উন্নত সভ্যতা যে বিদ্যমান ছিল, তাতে আর কোন সন্দেহ নেই। এই সভ্যতা সিন্ধু সভ্যতা নামে বিশ্বে পরিচিত হয়েছে। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় অবিভক্ত ভারতের মহেঞ্জোদড়োতে একটি লুপ্ত সভ্যতা আবিষ্কার করবার পরে পণ্ডিতরা মেনে নিয়েছেন যে সিন্ধু নদের উপত্যকাতেও বিশ্বের প্রাচীনতম সভ্যতার নিদর্শন আছে। এই সভ্যতা পাঁচ হাজার বৎসরেরও বেশি পুরাতন এবং ব্যাবিলন ও মিশর সভ্যতার সমকালীন। এ কথাও মেনে নিতে হয়েছে যে এই সব সভ্যতার মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল এবং সমুদ্রপথে যোগাযোগ ব্যবস্থাও ছিল। এদের মধ্যে কোন্ সভ্যতা বেশি পুরাতন এবং কোন একটি কেন্দ্র থেকে এই সভ্যতা বিভিন্ন স্থানে বিস্তার লাভ করেছিল কিনা তা জানবার মতো কোন উপাদান আমাদের হাতে নেই।

সিন্ধু সভ্যতা শুধু সিন্ধু নদের উপত্যকায় সীমাবদ্ধ ছিল না। পূর্ব পশ্চিমে ও দক্ষিণে একটি বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে এই সভ্যতার নানা নিদর্শন মাটি খুঁড়ে

আবিষ্কার করা সম্ভব হয়েছে। পশ্চিমে করাচী থেকে তিনশো মাইল দূরে স্থুক্তাজেন-দর ছিল একটি বন্দর-নগর, আর পূর্বে শতদ্রু নদীর উপত্যকায় রুপার পর্যন্ত চারশো মাইল এই সভ্যতা বিস্তৃত ছিল। হরাপ্পা ছিল ইরাবতী নদীর উপত্যকায়। সিন্ধু নদের তীরে আর একটি জনপদের নাম চান্হু-দরো। মহেঞ্জো-দরোতে প্রাচীন নিদর্শনের সাতটি এবং হরাপ্পায় ছটি স্তর পাওয়া গেছে। দক্ষিণে সৌরাষ্ট্রের লোথাল এবং গুজরাতের ব্রোচ ও সুরাত পর্যন্ত এই সভ্যতার বিস্তার হয়েছিল।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে সিন্ধু সভ্যতার কোন লিখিত বিবরণ পাওয়া যায় না। জানা যায় যে ভাষার রূপ দেবার জন্য চিত্র লিপির সৃষ্টি হয়েছিল এবং এই সভ্যতার লেখ যুক্ত নরম পাথরের শীলমোহর পাওয়া গেছে। কিন্তু সে যুগের চিন্তা-ভাবনার কোন ঐতিহাসিক তথ্য আবিষ্কৃত হয় নি।

অন্য যে সব মূর্তি পাওয়া গেছে, তার মধ্যে অনেকগুলিই বিশেষ তাৎপর্য-পূর্ণ। হিন্দু ধর্মে যে যোগ সাধনা ও লিঙ্গপূজা এখনও বিশেষ সমাদৃত, তা প্রাক-বৈদিক যুগেও যে প্রচলিত ছিল, তার প্রমাণ এই সব মূর্তি। যোগমগ্ন যোগীর একটি পাথরের মূর্তি পাওয়া গেছে, তাঁর চোখের দৃষ্টি নাকের ডগায় নিবদ্ধ। হিন্দু যোগীরা এখনও এইভাবে সমাধিস্থ হবার চেষ্টা করেন। চতুর্ভুজ দেবতার মূর্তি পাওয়া গেছে একটি। সেটি ব্রহ্মা কিংবা বিষ্ণুর হতে পারে। সূর্যের মূর্তি হওয়াও অসম্ভব নয়। কিন্তু আর একটি মূর্তির পরিচয় পেতে অসুবিধা হয় না। যোগাসনে উপবিষ্ট পশু-পরিবৃত একটি মূর্তি, তাঁর তিনটি মুখ—পশুপতি শিব। একটি মৃণ্ময়ী মাতৃকা মূর্তিও পাওয়া গেছে। এর থেকেই অনুমান করা হয় যে শক্তি পূজারও বোধহয় প্রচলন ছিল।

ঐতিহাসিকরা মেনে নিয়েছেন যে লিঙ্গ পূজাই সেকালে প্রধান ছিল। দেবতার নাম ছিল শিশ্নদেব, তাঁর প্রতীক একটি উর্ধ্ব লিঙ্গ, পাশে যোনি চিহ্ন। একই সঙ্গে পুরুষ ও প্রকৃতির পূজা। পরবর্তী কালে এই মূর্তি পরিবর্তিত আকার লাভ করেছিল—গৌরীপীঠে সংযুক্ত লিঙ্গ। আজও পশুপতি শিবকে আমরা এই মূর্তির উপরেই পূজা করি।

এক সময়ে বিদেশীরা যেমন হিন্দুদের পৌত্তলিক বা প্রতিমাপূজারী বলে নিন্দা করেছেন, তেমনি সেকালের আর্যরা এই প্রাচীন জাতির লিঙ্গপূজা দেখে নানা ভাবে নিন্দা করেছেন। আর্যদের নিয়ে অনেক বিতর্ক আছে। পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকরা বলেছেন যে আর্যরা মধ্য এশিয়া থেকে ভারতে এসেছিল। কিন্তু ভারতীয় পণ্ডিতদের মধ্যে অনেকে মনে করেন যে আর্যরা এই দেশেরই মানুষ।

তারা কৃষিকর্ম জানত বলে পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা মনে করেন যে অর্ ধাতু থেকে আর্য শব্দটি উৎপন্ন হয়েছে। অর্ মানে কর্ষণ, তাই আর্য মানে কৃষক। কিন্তু ভারতীয় পণ্ডিতরা বলেন যে সংস্কৃতে অর্ ধাতু বলে কিছু নেই এবং আর্য শব্দটি ঋ ধাতু থেকে নিষ্পন্ন। ঋ শব্দে গমন বা ব্যাপ্তি বোঝায়। তাই নানা দেশে ব্যাপ্ত হয়ে যারা নিজেদের প্রতিষ্ঠা করেছে, তাদেরই আর্য বলা হতো। যারা আর্য নয়, তারাই অনার্য নামে পরিচিত হয়েছিল। দীর্ঘকাল ধরে যুদ্ধ হয়েছিল আর্যদের সঙ্গে অনার্যদের এবং শেষ পর্যন্ত উত্তর ভারত থেকে অনার্যদের তাড়িয়ে আর্যরা আর্যাবর্তের প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিল।

আর্যদের রচিত বেদে এই অনার্যরা কৃষ্ণবর্ণ দাস বা দস্যু বলে অভিহিত হয়েছে। নানা রকমের নিন্দার মধ্যে একটি প্রশংসার কথাও পাওয়া যায়। অনার্যরা নগর-সভ্যতায় অভ্যস্ত ছিল, তারা বসবাসের জন্য পাথরের পুরী নির্মাণ করত ও ধাতুর ব্যবহার জানত। তাই আর্যদের দেবতা ইন্দ্র অনার্যদের পুরী ধ্বংস করে পুরন্দর নামের অধিকারী হয়েছিলেন। বৈদিক ঋষি এই ইন্দ্রের কাছে প্রার্থনা করছেন, 'আমাদের চতুর্দিকে দস্যু জাতি আছে, তারা যজ্ঞকর্ম করে না, তারা কিছু মানে না, তাদের ক্রিয়া স্বতন্ত্র, তারা মানুষের মধ্যেই নয়। 'হে শত্রুসংহারকারী, তাদের নিধন কর। সেই দাস জাতিকে হিংসা কর।'—

> অকর্মা দস্যুরভি নো অমন্তুরণ্যব্রতো অমানুষঃ।
> ত্বং তস্যামিত্রহন্বধর্দাসস্য দম্ভয়॥ —ঋগ্বেদ ১০।২২।৮

এ এক পক্ষের কথা। প্রতিপক্ষের কোন কথা আমরা জানি না। তারা

কিছু লিখে রেখে যায় নি, মুখে মুখেও চলে আসে নি কিছু। তাই সিন্ধু সভ্যতার অধ্যাত্ম চিন্তার কথা আমাদের অবিদিত। আর্য ঋষিরা এই চিন্তাধারা কতটা আত্মসাৎ করেছিলেন, তাও আমাদের জানা নেই। তবু এ কথা মানতে হয়েছে যে সেই মানুষেরা ধর্ম জীবন যাপনে অভ্যস্ত ছিল। কপিল মুনির সাংখ্যদর্শনে পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগে যে বিশ্বসৃষ্টির কথা, সে যুগের মানুষ তা আগেই অনুভব করেছিল। তারই ফল স্বরূপ লিঙ্গ পূজা পেয়েছিল প্রাধান্য। পশুপতি শিবের আরাধনা করে বন্য পশুকে বশ করেছিল নিজেদের নানা প্রয়োজনে। শক্তির সাধনা করত। সর্বোপরি অধ্যাত্ম চেতনার উন্নতির জন্য যোগাভ্যাস করত। পতঞ্জলি মুনির যোগ-দর্শন তাদের আয়ত্তে ছিল না তা বলা যায় না। মাটির নিচে থেকে যে সব মূর্তি ও শীলমোহর ইত্যাদি পাওয়া গেছে, তারই বিচারে সে কালের অধ্যাত্ম চেতনার উন্নতির কথা আমাদের মেনে নিতে হয়েছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বৈদিক সভ্যতা ও অধ্যাত্ম চিন্তা

বেদের কাল—বেদের সমাজ—বেদের ধর্ম—বেদের দেবতা—ঈশ্বরচিন্তার সূত্রপাত—আত্মা ও পরলোক—ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদে ঈশ্বরচিন্তা।

বেদের কাল

এই প্রসঙ্গে বৈদিক ঋষিদের কাল কত প্রাচীন তা আলোচনা করে দেখা উচিত। বৈদিক যুগের কাল নির্ণয়ে বা বেদের প্রাচীনত্ব নির্ধারণের চেষ্টায় আমাদের সংস্কারমুক্ত হতে হবে।

বিষ্ণুপুরাণ ও অন্যান্য পুরাণের মতে বেদ সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার বাক্য এবং তাঁর চতুর্মুখ থেকেই চারি বেদ উৎপন্ন হয়েছে। মনুসংহিতায় আছে যে বেদত্রয় সনাতন এবং ঈশ্বর স্বয়ং যজ্ঞের জন্য অগ্নি থেকে ঋগ্বেদ, বায়ু থেকে যজুর্বেদ ও সূর্য থেকে সামবেদ দোহন করেন।

এ নিয়ে কোন মন্তব্য না করে প্রাচীন বেদ বিষয়ে পণ্ডিতদের মতামত আমরা নির্দ্বিধায় আলোচনা করতে পারি। ম্যাক্স্‌মুলার ও অন্যান্য পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা মনে করেন যে বৈদিক সভ্যতার যুগ ছিল খ্রীষ্টের জন্মের সাড়ে চার হাজার থেকে আড়াই হাজার বছর পূর্বে এবং বেদের সংকলন কাল ২৭৮০ থেকে ১৮২০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দের মধ্যে। রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁর A History of Civilisation in Ancient India গ্রন্থে এই মতেরই সমর্থন করেছেন। কিন্তু বালগঙ্গাধর তিলক তাঁর The Arctic Home in the Vedas গ্রন্থে এই মত মেনে নেন নি। তিনি মনে করেন যে রাশিচক্রের প্রথম ভাগে বেদের মন্ত্রগুলি রচিত হয়েছিল এবং এই রাশিচক্রের যুগ হল পাঁচ হাজার থেকে তিন হাজার খ্রীষ্ট পূর্বাব্দের

মধ্যভাগ পর্যন্ত। যে কোন মতই আমরা মানি না কেন, বেদ নিঃসন্দেহে চার হাজার বছরের বেশি প্রাচীন ; সাড়ে চার হাজার কেন, ছ হাজার বছরেরও বেশি পুরাতন হতে পারে। তাই বেদকে আমরা পৃথিবীর আদি গ্রন্থ বলতে পারি। তার পূর্বে কোন গ্রন্থ লেখা হয়ে থাকলেও তা আমাদের হাতে নেই। এই হিসাবেই আমরা বৈদিক ঋষিদের চিন্তাকেই পৃথিবীর প্রথম অধ্যাত্ম চিন্তা বলে মেনে নিতে পারি।

শতাব্দীর হিসাব দিয়ে কোন সমাজেব বা সংস্কৃতির সঠিক ধারণা করা সম্ভব নয়। কাজেই বৈদিক সমাজকে বুঝতে হলে বেদ থেকে অন্য উপাদান নিয়ে আলোচনার অবকাশ আছে। বিদেশের পণ্ডিতবা বেদকে প্রাচীন সাহিত্যের নিদর্শন বলে মনে করেন। একে শাস্ত্র গ্রন্থও বলা যেতে পারে। কিন্তু এদেশের অনেক পণ্ডিত মনে করেন যে বেদ আমাদের প্রাচীনতম ইতিহাস। ইতিহ শব্দটির অর্থ পরম্পরাগত উপদেশ। অস্ ধাতু প্রত্যয় করে ইতিহাস শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ এই দাঁড়ায় যে এতে পরম্পরাগত উপদেশ আছে। মহাভারতে ইতিহাসের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, যে পূর্বাবৃত্ত কথায় ধর্মার্থকামমোক্ষের উপদেশও যুক্ত আছে তার নাম ইতিহাস।—

ধর্মার্থকামমোক্ষাণামুপদেশসমন্বিতং।
পূর্ববৃত্তকথাযুক্তমিতিহাসং প্রচক্ষতে॥

এখন আমরা ইতিহাসের যে অর্থই করি না কেন, আমরা যে সময়ের আলোচনা করছি সে সময়ের সংজ্ঞায় বেদকেও ইতিহাস বলা চলে। বেদ থেকে বৈদিক সমাজের সর্বাঙ্গীণ পরিচয় পেতে কোন অসুবিধা হয় না।

বেদের সমাজ

পণ্ডিতরা মনে করেন যে পৃথিবীর সমস্ত সভ্যজাতির আদি পুরুষ ছিল আর্য জাতি। বেদেও আমরা এই শব্দটি পাই। বৈদিক ঋষিরা তাঁদের প্রার্থনায় বলছেন, হে ইন্দ্র, কারা আর্য আর কারা দস্যু তা জানো। ঋক্ ১।৫১।৮ ; আর্যদের সামর্থ্য ও ধন বৃদ্ধি কর। ১।১০৩।৩ ; বজ্র দিয়ে দস্যু বধ করে আর্যদের প্রতি জ্যোতির প্রকাশ কর। ১।১১৭।২১ ; বৃদ্ধি
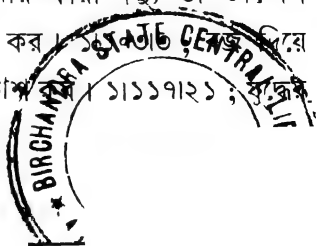
সময়ে ইন্দ্র আর্য যজমানকে রক্ষা করেন। ১।২৩০।৮ ; দস্যুদের হত্যা করে ইন্দ্র আর্যদের রক্ষা করেছেন। ৩।৩৪।৯ ; আমি ইন্দ্র আর্যকে ভূমিদান করেছি। ৪।২৬।২

এই সব ঋক্ পড়ে স্বভাবতই মনে হয় যে বৈদিক ঋষিরা নিজেদের আর্য বলে মনে করতেন, কিংবা তাঁরা আর্য জাতির জন্যই ঐ সমস্ত ঋক রচনা করেছিলেন। এই অনুমানের ব্যতিক্রমও দেখা যায়। যেমন, হে বজ্রধর, তুমি যে সম্পত্তি দিয়ে দস্যু ও আর্য সমস্ত মানব শত্রুকে সুজেয় করেছ। ৬।২২।১০ এবং হে বীর ইন্দ্র, তুমি দস্যু ও আর্য উভয়বিধ শত্রুই সংহার করেছ। ৬।৩৩।৩

ভাবতেব সে কালের সমাজে আর্য ও দস্যু শুধু এই দুটি বিভাগই ছিল। তাদের মানব শত্রু কেন বলা হল তা বোঝা যায় না। মূলে অসুবঘ্ন শব্দটি ছিল বলে মনে করা হয়। তার অর্থ বলবান শত্রুদের হন্তা। দস্যু বা আর্যদের মধ্যে যারা মানুষেব শত্রু, ইন্দ্র তাঁদের বধ করেছেন।

ঋগ্বেদেব প্রথম মণ্ডলের ৩০ সূক্তে অর্জীগর্তের পুত্র শুনঃশেপ ঋষি বলেছেন, ইন্দ্র বহু লোকের নিকটে গমন করেন। পুরাতন আবাস থেকে আমি সেই পুরুষকে আহ্বান করি, যাঁকে পিতা পূর্বে আহ্বান করেছিলেন। এই 'পুবাতন আবাস' নিয়ে মতভেদ আছে। সায়ন বলেছিলেন, পুরাতনস্য ওকসঃ স্থানস্য স্বর্গরূপস্য সকাশাৎ। কিন্তু কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, From the site of our ancient home. এই অর্থ মেনে নিলে স্বীকার করতে হয় যে বৈদিক ঋষিবা অন্য কোন স্থান থেকে বর্তমান নিবাসে এসে এই কথা বলেছেন।

বেদে যে সব রাজার নাম পাওয়া যায় তার মধ্যে প্রধান হলেন ইন্দ্র। অনেকে এই ইন্দ্রকে প্রাচীন আর্য জাতির এক পরাক্রান্ত রাজা বলে মনে করেন। ব্যাবিলনের যে সেমেটিক রাজাকে তিনি ভীষণ যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করেন, তাঁকেই বৃত্র বলে অনুমান করা হয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা চলে যে আসিরীয়দের রাজধানী ছিল অসুর নগরে। বেদের আর একজন প্রসিদ্ধ রাজা সুদাস। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আছে যে রাজা সুদাস

সমগ্র পৃথিবী জয় করেছিলেন এবং এই অদ্বিতীয় বীরকে ইন্দ্র সাহায্য করতেন। ঋগ্বেদের সপ্তম মণ্ডলের অষ্টাদশ সূক্তে আমরা সুদাসের বীরত্বের বর্ণনা পাই। তিনি কবিদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের বংশধর কবিরা তাঁর কাছে অশেষ উৎসাহ পেয়েছিলেন। কবি ত্রিৎসু বা বশিষ্ঠ এই রাজার কাছে বহু স্বর্ণালঙ্কার, দুটি রথ, চারটি অশ্ব ও দুশো গাভী উপহার পেয়েছিলেন। অন্য কবিরাও এই রকমের উপহার পেতেন। বিদ্যা ও ধর্মকাজে উৎসাহ দেবার জন্য তিনি নিয়মিত অর্থ সাহায্য করতেন। সুদাসের মতো আরও অনেক রাজার নাম বেদে পাওয়া যায়। এঁদের মধ্যে কেউ ছিলেন একচ্ছত্র সম্রাট, কেউ ছিলেন করদ মিত্র রাজা। যাঁদের নাম বার বার পাওয়া যায় তাঁরা হলেন তুর্বসু, ত্রসদস্যু, তুবেতি, যদু, পুরু, বৃহদ্রথ, সুশ্রবা, বরুণ, কুৎস, আয়ু প্রভৃতি। এই সব রাজাদের যুদ্ধবিগ্রহের বর্ণনাও বেদে পাওয়া যায়।

তৎকালীন সমাজের একটি সুন্দর চিত্র আছে বেদে। জনসাধারণের প্রধান জীবিকা ছিল কৃষিকার্য। বৃষযুক্ত লাঙ্গলে তারা ভূমি কর্ষণ করত, ঋষিরা যজ্ঞ করতেন বৃষ্টির জন্য। বিদেশী পণ্ডিতরা যে তাদের যাযাবর পশুপালক বলেছেন, তার কোন প্রমাণ বেদে নেই। দেশ তখন ধনধান্যে পূর্ণ ছিল, অন্নকষ্ট বা দুর্ভিক্ষের বিভীষিকা ছিল না। গ্রাম ও নগর ছিল সমৃদ্ধ। গ্রাম থেকে নগরে যাবার পথ ঘাট ছিল। নগরে পাকা বাড়ি ও প্রশস্ত রাজপথ ছিল। গ্রামে বা শহরের উপকণ্ঠে যারা বাস করত, তারা রথে চড়ে নগরে আসত। ঋষিদেরও রথ থাকত। বাণিজ্যের জন্যে মানুষের দেশ বিদেশে যাতায়াত ছিল, সমুদ্রেও তারা পাড়ি দিত। তার জন্য ঘোড়ার গাড়ি নৌকা ও অর্ণবপোত ছিল। তারা সোমরস পান করত, দ্যূত-ক্রীড়ার প্রচলন ছিল। ভয় ছিল শুধু দস্যুর। রাজারা দস্যু দমন করে ধর্মানুসারে প্রজা পালন করতেন। জনসাধারণ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় ও ধর্মপরায়ণ ছিল। ঋষিরা যাগযজ্ঞ করে তাদের ধর্মপথে পরিচালিত করতেন।

সমাজে নারীর স্থান পুরুষের মতোই স্বাধীন ছিল। কক্ষীবানের দুহিতা

ঘোষা (১০।৪০) অত্রির দুহিতা অপালা (৮।৯১) ও অত্রি বংশীয়া বিশ্ববারা (৫।২৮)-ছিলেন বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। শাশ্বতী লোমশাও কবি ছিলেন। গৃহে নারী ছিল কল্যাণকারিণী জায়া, তারা পতির সঙ্গে যজ্ঞ করত। এরাও যজ্ঞের অধিকারী ছিল। রাজা পুরুকুৎস বন্দী হলে তাঁর রাণী বরুণের উদ্দেশে যজ্ঞ করে যে পুত্র লাভ করেছিলেন, তিনি ত্রসদস্যু নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন। মন্ত্রদ্রষ্টা ও ঋষি নারীরা যজ্ঞে ঋত্বিকের কাজ করতেন। বিশ্ববারা তাঁর যজ্ঞের অগ্নিকে বলছেন, দাম্পত্য সম্বন্ধ শৃঙ্খলাবদ্ধ কর। (৫।২৮।৩)। রাজকন্যারা মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিকে বিবাহ করে সুখী হতেন। অত্রিবংশীয় শ্যাবাশ্ব মন্ত্রদ্রষ্টা হবার পরে রাজা রথবীতির কন্যাকে বিবাহ করবার অধিকারী হয়েছিলেন। বেদের কাহিনী থেকেই জানা যায় যে সেকালে নারীর অবরোধ প্রথা ছিল না, বাল্য বিবাহও ছিল না। কুমারী কন্যারা মনোমত পতি নির্বাচন করতে পারত এবং তার পরে পিতা কন্যা সম্প্রদান করত।

পুরুষ একাধিক বিবাহ করতে পারত এবং সমাজে বিধবা বিবাহের প্রচলন ছিল। বেদে ব্যভিচারিণী নারীর কথা আছে, ক্রীতদাস-দাসীর কথাও আছে। কিন্তু সতীদাহের প্রথা নেই, জাতিভেদের কথাও নেই। যাঁরা আছে বলেন, তাঁদের যুক্তি খণ্ডন করার মতো যুক্তি বেদেই আছে। স্বামীর মৃত্যুর পরে জায়া চিতায় আরোহণ করত ঠিকই, কিন্তু তাকে সংসারে ফিরিয়ে আনার মন্ত্র বেদেই আছে। বিধবারা দেবরকে যে পুনর্বিবাহ করত, তার ইঙ্গিতও পাওয়া যায়।

অতি সংক্ষেপে বৈদিক সমাজের কথা বিবৃত হল। এ আমাদেরই সমাজ। প্রাচীন ভারতের কবি ও চিন্তাশীল ঋষির লেখা বেদে এই সমাজের পরিচয় আমরা পাই। প্রকৃতির নানা শক্তিকে এঁরা দেবতাজ্ঞানে উপাসনা করেছেন, তারপরে এক ঈশ্বরের অস্তিত্বের কথা তাঁদের মনে এসেছে। নানা সংশয় ও চিন্তার কথা তাঁরা ছন্দোবদ্ধ কবিতায় লিপিবদ্ধ করে গেছেন।

পৃথিবীর আর কোন দেশের প্রাচীনতর কোন গ্রন্থ এখনও আবিষ্কৃত হয়

নি। মানুষের মত গ্রন্থেরও মৃত্যু আছে। প্রাকৃতিক নিয়মে তা অবলুপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু বেদ শাশ্বত গ্রন্থ। মানুষের শ্রুতি ও স্মৃতির মাধ্যমে পুরুষানুক্রমে তা কালের নিয়মকে লঙ্ঘন করে এসেছে। বেদের মৃত্যু নেই। বেদ অমর হয়ে আছে, অমর হয়েই থাকবে।

বেদের ধর্ম

সংস্কৃত অভিধান শব্দকল্পদ্রুমে ধর্ম শব্দের অর্থ শুভাদৃষ্ট। পুণ্য শ্রেয় সুকৃত ন্যায় স্বভাব আচার অহিংসা প্রভৃতি অর্থেও এর ব্যবহার আছে। ধর্ম শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল যা ধারণ বা পোষণ করে। মানুষের গুণ বা নৈতিক চরিত্রও এই শব্দের দ্বারা বোঝানো হয়। কিন্তু সাধারণ ভাবে ধর্ম বলতে আমরা 'রিলিজিয়ন' বুঝি—ঈশ্বর ও অন্যান্য দেবদেবী. তাদের পূজা উপাসনা, পাপ-পুণ্য, ইহলোক-পরলোক, সামাজিক জীবনযাত্রার নিয়ম-কানুন—এসবও ধর্মের অঙ্গ বলে মনে করা হয়। কিন্তু সূক্ষ্মভাবে বিচার করলে মানতে হয় যে ধর্ম ও 'রিলিজিয়ন' এক নয়। ধর্ম হল নৈতিক নির্দেশ, আর 'রিলিজিয়ন' বলতে পূজা-উপাসনাও বোঝায়। ধর্ম এমন একটি শব্দ যে তার সঠিক সংজ্ঞা নিয়ে বিশ্বের মানুষ আজও একমত হতে পারে নি। আর এই মতভেদ আছে বলেই মানুষ কোন একটি ধর্ম নির্দ্বিধায় অনুসরণ করতে পারে না। যুগে যুগে দেশে দেশে এই ধর্মের ব্যাখ্যা বদল হচ্ছে। কখনও ঈশ্বর বা তার অবতার ধর্মের প্রবক্তা, কখনও তিনি কোন মানুষকে প্রেরণ করেছেন ধর্মের ব্যাখ্যার জন্য, কখনও কোন ঋষি মহা-পুরুষ বা সিদ্ধপুরুষ এই কাজ করেছেন। কিন্তু এ সমস্তই সাম্প্রদায়িক ধর্ম। এই ধর্মবোধ মানুষকে যেমন মহৎ করেছে, গৌরবান্বিত করেছে তার শিল্প সাহিত্য দর্শন ও সামগ্রিক সংস্কৃতিকে, তেমনি এক রকমের ধর্মান্ধতায় পৃথিবীতে অনেক যুদ্ধবিগ্রহ হয়েছে, অনেক অত্যাচার ও রক্তপাতে ইতিহাস কলঙ্কিত হয়েছে। ধর্ম জাত বিদ্বেষ ও হিংসার যুগের আজও সম্পূর্ণ অবসান হয় নি।

অথচ বিশ্বের সমস্ত ধর্মের সার কথার মধ্যে একটি ঐক্য দেখে আশ্চর্য হতে

হয়। খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় ছয়শো বছর পূর্বে চীন দেশে প্রবর্তিত তাও ধর্মে আছে : তোমার প্রতিবেশীর লাভ-ক্ষতিকে নিজের লাভ ক্ষতি বলে মনে কর। সে দেশের কন্‌ফুসিয়াসও একই কথা বলেছেন অন্যভাবে: সারা জীবন ধরে যদি কোন সত্য পালন করতে হয়তো তা হল নিজের জন্য যা করতে পারতে না তা অন্যের জন্যেও কোরো না। এশিয়ার একেবারে পশ্চিম প্রান্তে প্রায় একই সময়ে জরথুস্ত্র বলেছেন, সেই প্রকৃতিই ভাল, যা নিজের জন্য ভাল নয় তা অন্যের প্রতি আচরণে বিরত রাখে। এই রকমের কথা এই অঞ্চলের জুডাধর্মেও আছে : তোমার কাছে যা ঘৃণার, তা তোমার গোষ্ঠীর লোকের প্রতিও করণীয় নয় ; এটিই হল সারকথা, অন্য সব তার ব্যাখ্যা। একই সময়ে ভারতে বুদ্ধ বলেছেন : নিজের যা ক্ষতিকর মনে হবে তা অন্যের জন্যও করবে না। খ্রীষ্টানদের বাইবেলেও আছে এই রকমের কথা : "All things what so ever ye would that men should do to you, do ye even so to them : for this is the law and the Prophets."

এই রকমের কথা ইসলাম ধর্মেও আছে : No one of you is a believer until he desires for his brother that which he desires for himself. এই উদ্ধৃতিগুলি Lewi's Browne-এর The World's Great Scriptures গ্রন্থ থেকে বাঙলায় অনুবাদ করা হল।

বৈদিক ধর্মেও এই রকমের অনেক কথা আছে। ধর্ম শব্দটিও বৈদিক যুগে প্রচলিত ছিল ; কিন্তু বর্তমান অর্থে এর ব্যবহার ছিল না। এখন আমরা ধর্ম বলতে যা বুঝি, সে ধারণার জন্ম সে যুগে হয় নি বলেই মনে হয়। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলে কণ্বের পুত্র মেধাতিথি ঋষি বললেন যে বিষ্ণু হলেন রক্ষক, তাঁকে কেউ আঘাত করতে পারে না। তিনি ধর্ম সমুদয় ধারণ করে তিনপদ পরিক্রমা করেছিলেন।—

ত্রীণি পদা বি চক্রমে বিষ্ণু র্গোপা অদাভ্যঃ।
অতো ধর্মাণি ধারয়ন্॥ —ঋ ১।২২।১৮

এই ধর্ম শব্দটি ঋগ্বেদের অষ্টম মণ্ডলে অঙ্গিরার পুত্র বিরূপ ঋষিও ব্যবহার করেছেন। তিনি বলেছেন যে, মানুষের ঈশ্বর, মহান কর্মের অধ্যক্ষ অগ্নিকে স্তুতি করি, তিনি শুনুন।—

বিশাং রাজানমদ্ভুতমধ্যক্ষং ধর্মণামিমম্।
অগ্নিমীলে স উ শ্রবৎ॥ —ঋ ৮।৪৩।২৪

এই সূক্তে ধর্ম শব্দের ব্যবহার স্পষ্ট হয় নি। পূর্বের শ্লোকটিতেও এই শব্দের অর্থ পরিস্ফুট হয় নি।

অথর্ববেদে ধর্ম শব্দটির অর্থ আমাদের কাছে সুস্পষ্ট। ঋষি বললেন, সবিতা সত্য-ধর্মা। সবিতা যদি সূর্য হল তো তাঁর নিয়মানুবর্তিতার জন্যই তাঁকে যে সত্য-ধর্মা বলা হয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। সত্যই তাঁর ধর্ম, অর্থাৎ যা সত্য তাই ধর্ম। সত্য শব্দটি ঋগ্বেদে দেবতার গুণ হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। এসো আমরা সেই ইন্দ্রের স্তব করি, যিনি সত্যের প্রতীক, অসত্যের নয়।

সত্যম্ ইদ্ বা উ তং ব্যাম্
ইন্দ্রং স্তবাম নানৃতম্॥ —ঋ ৮।৬২।১২

ঋগ্বেদের অষ্টম মণ্ডলেও এই রকমের একটি ঋক্ আছে। হে অশ্বিনী-কুমারদ্বয়, যে তেত্রিশ দেবতা সত্যের প্রতীক, তাঁরা তোমাদের দুজনকেই সত্যের সামনেই দেখছেন।—

যুবাং দেবান ত্রয় একাদশাসঃ
সত্যাঃ সত্যাস্থঃ দদৃশো পুরস্তাৎ॥ —ঋ ৮।৫৭।২

অথর্ব বেদের পৃথিবী সূক্তে বলা হয়েছে যে ধর্মই পৃথিবীকে ধারণ করে আছে।

পৃথিবীং ধর্মণা ধৃতাং। —অ ১২।১।১৭

এই সূক্তেরই প্রথম মন্ত্রে বলা হয়েছে—

সত্যং বৃহদৃতমুগ্রং
দীক্ষা তপো ব্রহ্ম যজ্ঞঃ পৃথিবীং ধারয়ন্তি।
সা নো ভূতস্য ভব্যস্য পত্ন্যুরুং লোকং
পৃথিবী নঃ কৃণোতু॥ —অ ১২।১।১

সহজ ভাষায় এর অর্থ হল যে পৃথিবীকে ধারণ করে আছে বৃহৎ সত্য। উগ্র ঋত, দীক্ষা, তপ, ব্রহ্ম বা প্রার্থনা এবং যজ্ঞ। আমাদের অতীত ও ভবিষ্যতের পত্নী সেই পৃথিবী আমাদের জন্য একটি প্রশস্ত বিশ্ব রচনা করুন। এই দুটি শ্লোক মেলালে এই কথাই মেনে নিতে হয় যে ধর্ম হল এই ছয়টি গুণ যা পৃথিবীকে ধারণ করে আছে। পৃথিবীর ধারক এই ছয়টি গুণ হল ঋত সত্য দীক্ষা তপ ব্রহ্ম বা প্রার্থনা ও যজ্ঞ।

সাধারণভাবে ঋত শব্দের অর্থ সত্য। কিন্তু বেদের নানা জায়গায় এই ঋত শব্দটি একটি গভীরতর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। গমন করা অর্থে ঋ ধাতুর ব্যবহার করা হয়। তাই ঋত শব্দের অর্থে যে সত্য বোঝায়, তা হল একটি গতিশীল বিবর্তমান অনন্ত পরিব্যাপ্ত সত্য। সৃষ্টির মূলে একটি নিয়মধর্মী সত্য অস্ফুট অবস্থায় রয়েছে, ঋত সেই সত্যেরই সক্রিয় ও স্পন্দিত রূপ। ব্রাহ্মণের সন্ধ্যা মন্ত্রে অঘমর্ষণ ঋষি সৃষ্টি দেবতাকে বলছেন, প্রজ্বলিত তপস্যা থেকে ঋত অর্থাৎ যজ্ঞ ও সত্য জন্ম নিল। পরে জন্মাল রাত্রি ও জলপূর্ণ সমুদ্র, সমুদ্র থেকে সম্বৎসর। তিনি দিন রাত্রি সৃষ্টি করছেন, সবাই দেখছে। যথাসময়ে সৃষ্টিকর্তা সূর্য ও চন্দ্রকে সৃষ্টি করলেন। স্বর্গ পৃথিবী আকাশও সৃষ্ট হল।—

ঋতং চ সত্যং চাভীদ্ধাত্তপসোঽধ্যজায়ত।
ততো রাত্র্যজায়ত ততঃ সমুদ্রো অর্ণবঃ॥ ১
সমুদ্রাদর্ণবাদধি সংবৎসরো অজায়ত।
অহোরাত্রাণি বিদধদ্বিশ্বস্য মিষতো বশী॥ ২
সূর্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্বমকল্পয়ৎ।
দিবং চ পৃথিবীং চান্তরিক্ষমথো স্বঃ॥ —ঋ ১০।১৯০।৩

ঋগ্বেদের এই মন্ত্র পাঠ করে ব্রাহ্মণকে প্রতিদিন মার্জনা করতে হয়। এই মন্ত্রে আমাদের সৃষ্টিরহস্য নিহিত আছে। মহাপ্রলয় কালে শুধু ঋত ও সত্য স্বরূপ পরব্রহ্ম ছিলেন, আর সবকিছু ছিল গাঢ় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। ইংরেজীতে ঋত হল 'অর্ডার' বা 'ইটার্নাল ল' এবং সত্য হল 'ট্রুথ্'। সৃষ্টির আদিতে তপস্যার মধ্যে এই দুই গুণের জন্ম। তারপর সর্বতোভাবে

ফলোন্মুখ অদৃষ্টবশত সমুদ্র উৎপন্ন হল, সমুদ্র থেকেই এই জগৎ সৃষ্টির জন্য ব্রহ্মা উৎপন্ন হলেন। সূর্য চন্দ্র তাঁরই সৃষ্টি, এদের জন্য দিন রাত্রি ও সম্বৎর। তারপর ব্রহ্মা পৃথিবী আকাশ স্বর্গ ও অন্যান্য লোকের সৃষ্টি করলেন।

এই হল ঋত ও সত্য সম্বন্ধে আমাদের ঋষিদের প্রথম ধারণা। আজও এই ধারণার পরিবর্তন হয় নি। তাই আজও ব্রাহ্মণেরা ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী পাঠ করেন, যিনি আমাদের ধীশক্তি প্রেরণ করেন আমরা সেই সবিতা দেবের বরণীয় তেজ ধ্যান করি।—

তৎ সবিতুবরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি।
ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ॥ —ঋ. ৩।৬২।১০

সবিতা সত্য ধর্মের প্রতীক। তাই আমরা তাঁরই কাছে বুদ্ধিবৃত্তি লাভের জন্য তাঁর বরণীয় তেজের ধ্যান করি। রবীন্দ্রনাথ এই গায়ত্রী মন্ত্রের অনুবাদ করেছেন—

যাঁ হতে বাহিরে ছড়ায়ে পড়িছে
পৃথিবী আকাশ তারা,
যাঁ হতে আমার অন্তরে আসে
বুদ্ধি চেতনা ধারা—
তাঁরই পূজনীয় অসীম শক্তি
ধ্যান করি আমি লইয়া ভক্তি।

ঋত শব্দ থেকেই কর্ম ও কর্মফলের ধারণা এসেছে। এই দুটি লক্ষণই নৈতিক জীবনের মূলসূত্র। ঋষিরা বললেন, সত্যেরই জয় হয়, মিথ্যার নয়।—

সত্যমেব জয়তে নানৃতম্।

এর পরে দীক্ষা। গুরুর নিকটে শিষ্য দীক্ষা নেবে, তারপর তার ব্রহ্মচর্য বা তপস্যার জীবন শুরু হবে। বেদাধ্যয়ন করে সে মানসিক উৎকর্ষ লাভ করবে, মন্ত্রের প্রভাবে হবে ব্রাহ্মণ। তপস্যায় মানুষের অলভ্য কিছু নেই, ঈশ্বর লাভের একমাত্র পথই হল তপস্যা। তার পরে যজ্ঞ—জ্ঞানযজ্ঞ বা

তপযজ্ঞ। এরই নাম বৈদিক কর্মকাণ্ড। যাগ যজ্ঞ পূজার্চনা দিয়ে আত্মার উন্নতি ও ঈশ্বরলাভের প্রয়াস।

দান একটি সামাজিক কর্ম। ক্ষুধার্তকে অন্নদান করবে। ক্ষুধা হল মৃত্যুর অন্য রূপ। ক্ষুধার্তকে অন্নদান মানে জীবন দান করা। ধনী দরিদ্রকে দান করবে। ধন কারও নিজস্ব নয়। রথচক্রের মতো সদা পরিবর্তনশীল ধন এক এক সময় এক এক জনের কাছে যায়। মূর্খরাই যক্ষের মতো সেই ধন আগলে থাকে, একা ভোগ করে। দান না করে তারা বন্ধুলাভে অক্ষম হয়। নগ্নকে বস্ত্র দাও, রোগীকে নিরাময় কর, অন্ধকে দৃষ্টি দাও, অশক্তকে চলতে দাও। এ হল ঋগ্বেদের কথা।—

অভুর্ণোতি যন্নগ্নং ভিষক্তি বিশ্বং যত্তুরং।

প্রেমন্ধঃখ্যন্নিঃ শ্রোণো ভূৎ। —ঋ. ৮।৭৯।২

ঈশ্বর যে সব গুণের অধিকারী, তারই কল্পনা থেকে বেদের ঋষিরা ধর্মের লক্ষণ নির্ণয় করেছিলেন। কিন্তু কোন ধর্ম মত প্রকাশ বা প্রচার করেন নি, প্রশ্রয় দেন নি কোন সাম্প্রদায়িকতা। বলেছিলেন, সবার বন্ধু ইন্দ্রের কাছে আমরা সাহায্য প্রার্থনা করি।—

সমানম্ ইন্দ্রম্ অবসে হবামহে। —ঋ ৮।৯৯।৮

বলেছিলেন, হে ঈশ্বর, তুমি চিরকাল সকলের দেবতা, তাইতেই তোমাকে আবাহন করি।—

যচ্চিদ্ধি শশ্বতামসীন্দ্র সাধারণস্ত্বং।

তং ত্বা বয়ং হবামহে॥ —ঋ. ৪।৩২।১৩

তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে পৃথিবী কোন একটিমাত্র জাতির নয়, বিভিন্ন ভাষাভাষীর নানা জাতির এই পৃথিবী। তাদের আবাসের বিভিন্নতার মতো ধর্মাচরণও ভিন্ন।—

জনং বিভ্রতী বহুধা বিবাচসং

নানা ধর্মাণং পৃথিবী যথৌকসম্। —ঋ ১২।১।৪৫

তাই বলে বিদেশীকে ঘৃণা করলে চলবে না। তাঁরা বলেছেন, হে বরুণ, যদি আমরা কখনও কোন দাতা মিত্র বয়স্য ভ্রাতা নিকট প্রতিবেশী বা

মূকের কাছে কোন অপরাধ করে থাকি তো তা নষ্ট কর।—

অর্যম্যং বরুণ মিত্র্যং বা
সখায়ং বা যদমিদ্‌ভ্রাতরং বা।
বেশং বা নিত্যং বরুণারণং বা
যৎ সীমাগশ্চকৃমা শিশ্রথস্তৎ॥ —ঋ. ৫।৮৬।৭

শুক্লযজুর্বেদেও আমরা এই বিশ্বমৈত্রীর কথা পাই। ঋষি বলছেন, হে মহাবীর, আমাকে দৃঢ় কর। সকল প্রাণী যেন আমাকে বন্ধুর চোখে দেখে। আমিও যেন তাদের বন্ধুর চোখে দেখি। আমরা সবাই যেন পরস্পরকে বন্ধুর চোখে দেখি।—

দৃতে দৃংহ মা মিত্রস্য মা চক্ষুষা
সর্বাণি ভূতানি সমীক্ষন্তাম।
মিত্রস্যাহং চক্ষুষা সর্বাণি ভূতানি সমীক্ষে।
মিত্রস্য চক্ষুষা সমীক্ষামহে॥ —শুক্ল যজুর্বেদ ৩৬।১৮

এই বন্ধুত্বই মানুষকে নির্ভয় করে ও শান্তি আনে, বিশ্বের সুখ সমৃদ্ধির জন্য মানুষ সচেষ্ট হবার সুযোগ পায়। অথর্ব বেদের ঋষি তাই অভয় প্রার্থনা করছেন, সুহৃৎ থেকে আমরা যেন নির্ভয় হই, শত্রু থেকেও আমরা যেন নির্ভয় হই। জ্ঞাত ও অজ্ঞাত গূঢ় শত্রু থেকে আমরা নির্ভয় হতে চাই। দিনে ও রাত্রিতেও যেন আমরা নির্ভয় হই। মিত্রের মতো সব দিক সর্বদা আমাদের হিতকারী হোক।—

অভয়ং মিত্রাদভয়মমিত্রাদভয়ং
জ্ঞাতাদভয়ং পুরো যঃ।
অভয়ং নক্তমভয়ং দিবা নঃ
সর্বা আশা মম মিত্রং ভবন্তু। —অ. ১৯।১৫।৬

অন্তরীক্ষ আমাদের হউক অভয়,
দ্যুলোক ভূলোক উভে হউক অভয়।
পশ্চাৎ অভয় হোক সম্মুখ অভয়,
উর্ধ্ব নিম্ন আমাদের হউক অভয়।

বান্ধব অভয় হোক শত্রুও অভয়,
জ্ঞাত যা অভয় হোক অজ্ঞাত অভয়।
রজনী অভয় হোক দিবস অভয়,
সর্বদিক আমাদের মিত্র যেন হয়। —রবীন্দ্রনাথ

বেদকে ঋষিরা কোন দেশের বা জাতির বা সম্প্রদায়েব সম্পত্তি বলেন নি। বলেছেন, বেদ বিশ্ব মানবেব জন্য। ঋষি বলছেন, অতএব আমাকে সবার জন্য এই কল্যাণ বাক্য বলতে দাও। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় শূদ্র ও বৈশ্যকে, নিজেব দেশের আত্মীয় ও অনাত্মীয় বি,দশীদেরও।—

যথেমাং বাচং কল্যাণীমাবদানি জনেভ্যঃ।
ব্রহ্মবাজন্যাভ্যাং শূদ্রায় চার্যায় চ
স্বায চাবণায চ। —শুক্ল যজু ২৬।২

তাই অথব বেদেব ঋষি বলছেন, হে জনগণ, তোমবা সমান জ্ঞানযুক্ত হও, তোমাদেব মন এক বকম হোক ও একই সঙ্গে কাজ কব। পুবাকালে যেমন দেবতাবা এক মত হযে যজমানেব পবিকল্পিত হবিব ভাগ গ্রহণ কবতেন, তেমনি তোমবাও পবস্পবেব প্রতি বিদ্বেষশূন্য হয়ে ইষ্টলাভ কব। তোমাদের মন্ত্রণা এক হোক, কাজেব প্রবৃত্তি এক হোক, কাজও এক হোক, অন্তঃকবণও এক হোক। এই জন্যই তোমাদেব সাধাবণ হবি দিয়ে যজ্ঞ কবাচ্ছি। তোমাদেব চিত্ত এক হোক। হে জনগণ, তোমাদেব সংকল্প এক হোক, তোমাদেব হৃদয় এক হোক, তোমাদের মন সমান হোক। তোমাদেব সকল কাজ যাতে একসঙ্গে হয়, তাব জন্যই তোমাদেব একত্র কবছি।—

সং জানীধ্বং সং পৃচ্যধ্বং
সং বো মনাংসি জানতাম্।
দেবা ভাগং যথা পূর্বে
সংজানানা উপাসতে॥১
সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী
সমানং ব্রতং সহ চিত্তমেষাম।

সমানেন বো হবিষা জুহোমি
সমানং চেতো অভিসংবিশধ্বম্ ॥২
সমানী ব আকূতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ।
সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি ॥৩

—অথর্ব বেদ ৬।৭।:।১-৩

বেদের ধর্ম কোন সাম্প্রদায়িক ধর্ম নয়, এ বিশ্বমানবের ধর্ম। তাই এই বেদ পৃথিবী থেকে লুপ্ত হয়ে যায় নি, যুগোত্তীর্ণ হয়ে সগৌরবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে বিশ্বে। বেদের ঋষিরা যে সরল জীবনযাত্রার আদর্শে একটি অধ্যাত্ম বিশ্বাসের ভিত রচনা করে গেছেন, তাই সর্বত্র গৃহীত হয়েছে একই রূপে ও রূপান্তরে।

বেদের দেবতা

অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম্।
হোতারং রত্নধাতমম্ ॥
অগ্নিঃ পূর্বেভি ঋর্ষিভিরীড্যো নূতনৈরুত।
স দেবাঁ এহ বক্ষতি ॥

ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের প্রথম সূক্তের প্রথম দুটি শ্লোকে বিশ্বামিত্রের পুত্র মধুচ্ছন্দা ঋষি গায়ত্রী ছন্দে অগ্নিদেবতার কথা লিখেছেন, অগ্নি যজ্ঞের পুরোহিত ও দীপ্তিমান, তিনি দেবতাদের আহ্বায়ক ঋত্বিক ও বহুরত্ন-ধারী। আমি এই অগ্নির স্তব করছি। তিনি পুরাতন ঋষিদের স্তুতিভাজন ছিলেন, নূতন ঋষিদেরও তিনি স্তুতিভাজন। তিনি এই যজ্ঞে দেবতাদের আনয়ন করুন।

ঋগ্বেদের নানা স্থানে অগ্নিকে পুরোহিত বলা হয়েছে। অগ্নি না হলে যজ্ঞ হয় না বলেই এই নাম। ঋষি অগ্নিকে তাঁর যজ্ঞের পুরোহিত রূপে দেবতাদের আহ্বান করতে বলছেন। অগ্নি নিজেও প্রধান তিন দেবতার অন্যতম। নিরুক্তকার যাস্কের মতে এই তিন দেবতা হলেন পৃথিবীতে অগ্নি, অন্তরীক্ষে বায়ু বা ইন্দ্র এবং আকাশে সূর্য।—ত্রিস্র এব দেবতা

ইতি নৈরুক্তা অগ্নিঃ পৃথিবী স্থানো বায়ুরিন্দ্রো বাহন্তরীক্ষ স্থানঃ সূর্যো দ্যুঃ স্থান।

দ্যোতনাদ্দেবঃ। যিনি দীপ্তিমান, তিনিই দেব। কিন্তু আর্য ঋষিরা ঠিক এই অর্থে দেবতা শব্দ ব্যবহার করেছিলেন কিনা তাতে সন্দেহ আছে। ঋক্ সংহিতার অনুক্রমণিকায় কাত্যায়ন ঋষি বলেছেন, যাঁর কথা তিনি ঋষি এবং যাঁর বিষয়ে কথা তিনি দেবতা। ঋষি বাক্যের প্রতিপাদ্য বস্তুই দেবতা।—

যস্য বাক্যং স ঋষিঃ
যা তেনোচ্যতে সা দেবতা।
তেন বাক্যেন প্রতিপাদ্যং
যদ্বস্তু সা দেবতা॥

ঋগ্বেদে তাই শুধ সূর্য চন্দ্র গ্রহাদিই দেবতা নন, গিরি নদী বনস্পতিও দেবতার মতো স্তুত হয়েছে। কিন্তু দেবতার এই সংজ্ঞা ধীরে ধীরে বদলাতে লাগল। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, স্বর্গে যাঁরা দীপ্তিমান তাঁরাই দেবতা।—

দীব্যতে ক্রীড়তে যস্মাৎ
রোচ্যতে দ্যোততে দিবি।
তস্মাদ্দেব ইতি প্রোক্তঃ
স্তূয়তে সর্বদৈবতৈঃ॥

যাস্কের মতে দেব শব্দটির ব্যবহার হয় নানা অর্থে। যিনি দান করেন তিনি দেব, যিনি দীপ্ত বা দোতিত হন তিনি দেবতা এবং যিনি দ্যুলোকে থাকেন তিনিও দেবতা।—দেবো দানাদ্ বা দীপনাদ্ বা দ্যোতনাদ্ বা দ্যুস্থানো ভবতীতি বা। তিনি বলেন যে দেবতারা ভাগ্যবান, কারণ তাঁদের অনেক নাম। অথবা তাঁদের বিভিন্ন কর্মের জন্যই বিভিন্ন নাম। যেমন হোতা অধ্বর্যু ব্রহ্মা উদ্গাতা। দেবতাও পৃথক হতে পারেন।

প্রাচীন আর্যরা যে তেত্রিশজন দেবতার উপাসনা করতেন সে কথাও আমরা ঋগ্বেদে পাই।—

আ নামত্যা ত্রিভিরেকা দশৈরহি
দেবেভির্যাতং মধুপেয়মশ্বিনা।
প্রায়ুস্তারিষ্টং নী রপারামি মৃক্ষতং
সেধতং দ্বেষো ভবতং সচাভুবা ॥ ১।৩৪।১১

হে নামত্য অশ্বিদ্বয়, তেত্রিশজন দেবতার সঙ্গে এখানে মধুপান করতে এসো। আমাদের আয়ু বর্ধন কর, মোচন কর পাপ। বিদ্বেষীদের প্রতিষেধ করে আমাদের সঙ্গে অবস্থান কর।

ঋগ্বেদের আরও দু জায়গায় তেত্রিশ দেবতার উল্লেখ আছে—৮।২৮।১ ও ৯।৯২।৪ ঋক্ দুটিতে। কিন্তু দেবতাদের নামের উল্লেখ নেই। কৃষ্ণযজুঃ সং-হিতায় পাওয়া যায়, দেবতারা আকাশে এগারো, পৃথিবীতে এগারো এবং অন্তরীক্ষেও এগারো।—

যে দেবা দিব্যেকাদশ স্থ পৃথিব্যামধ্যেকাদশ
স্থাপস্সুযদো মহিনৈকাদশস্থ। ১।৪।১০।১

শতপথ ব্রাহ্মণে (৪।৫।৭।২) এই দেবতাদের নাম অষ্টবসু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, আকাশ ও পৃথিবী। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (২।১৮) একাদশ যাজ, একাদশ অনুযাজ ও একাদশ উপযাজ দেবতা। বিষ্ণুপুরাণেও তেত্রিশ দেবতার উল্লেখ আছে। শতপথ ব্রাহ্মণের মতো অষ্টবসু, একাদশ রুদ্র ও দ্বাদশ আদিত্য, কিন্তু আকাশ ও পৃথিবীর পরিবর্তে প্রজাপতি ও বষট্‌কার—এই তেত্রিশ জন দেবতা।

সেকালে তিনের উপরে কোন বিশেষ আকর্ষণ ছিল বলেই তিন থেকে তেত্রিশ দেবতা হয়েছিল। তিন হাজার তিন শো উনচল্লিশ জন দেবতার উল্লেখও পাওয়া যায়। তাঁরা অগ্নির উপাসনা করছেন।—

ত্রীণি শতাত্রী সহস্রাণ্যগ্নিং
ত্রিংসাচ্চ দেবা নব চাস পর্যন্। —ঋক্ ১০।৫২।৬

সায়ন বললেন যে দেবতা মাত্র তেত্রিশ জন, আর তিন হাজার তিনশো উনচল্লিশজন তাঁদের মহিমা প্রকাশক। পরবর্তী কালে রচিত পুরাণে এই দেবতার সংখ্যা দাঁড়ায় তেত্রিশ কোটিতে।—

সদারা বিবুধাঃ সর্বে
স্বানাং স্বানাং গনৈঃ সহ।
ত্রৈলোক্য তে ত্রয়স্ত্রিংশৎ
কোটি সংখ্যতয়াঽভবন॥

একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে সেকালের ঋষিরা পৃথিবী অন্তরীক্ষ ও দ্যুলোকের যে সব প্রাকৃতিক শক্তি দেখে বিস্মিত মুগ্ধ বা ভীত হয়েছেন, তারই উপরে আরোপ করেছেন দেবত্ব। এই সব শক্তির উপরেই ব্যক্তিত্ব আরোপ করে তাঁদের দেবতারূপে কল্পনা করেছেন। তাঁদের মহিমা কীর্তন করেছেন, তাঁদের কাছে বৈষয়িক সমৃদ্ধি চেয়েছেন এবং রোগ বিপদ বা শত্রুর আক্রমণ থেকে পবিত্রাণ পেতে চেয়েছেন।

ঈশ্বরচিন্তার সূত্রপাত

আমরা কিছু ভিন্ন ধরনের কথা দেখি সামবেদীয় অরণ্যগান রথন্তর সামে। ঋগ্বেদের সপ্তম মণ্ডলে ৩১ সূক্তের ২২ ঋকে বশিষ্ঠ ঋষি বলেছেন, হে শূর, তুমি এই জগতের অর্থাৎ জঙ্গম ও স্থাবর পদার্থের ঈশ্বর ও সর্বদর্শী অথবা অশুদ্ধ ধেনুর ন্যায় তোমার স্তুতি করছি।—

অভি ত্বা শূর নোনুমোঽদুগ্ধা ইব ধেনবঃ।
ঈশানমস্য জগতঃ স্বর্দৃশম শানমিন্দ্র তস্থুষঃ॥ ৭।৩২।২২

অনেকে মনে করেন যে ঈশ্বর সম্বন্ধে মানুষের প্রথম ধারণা এই মন্ত্রেই প্রথম প্রকাশ পেয়েছে।

উতথ্যের অপত্য দীর্ঘতমা ঋষি বললেন, আমি অজ্ঞান, কিছু না জেনেই জ্ঞানার কাছে জানবার জন্য জিজ্ঞাসা করছি, যিনি এই ছয় লোক স্তম্ভন করেছেন, তিনিই কি সেই অনাদি এক?—

অচিকিত্বাঞ্চিকিতুষশ্চিদত্র
কবীন্ পৃচ্ছামি বিদ্মনে ন বিদ্বান।
বি যস্তস্তম্ভষলিমা রজাংস্যজস্য
রূপে কিমপি স্বিদেকং॥ ১।১৬৪।৬

আদিত্যের চিন্তায় দীর্ঘতমা ঋষি এক অনাদি পুরুষকে কল্পনা করে স্পষ্ট ভাষায়, এক নূতন প্রশ্ন জানালেন। বললেন, কে দেখেছিল প্রথম জাতক-কে যখন অস্থিরহিতা অস্থিযুক্তকে ধারণ করল? ভূমি থেকে প্রাণ ও শোণিত, কিন্তু আত্মা এলো কোথা থেকে। বিদ্বানের কাছে কে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতে যায়?—

কো দদর্শ প্রথমং জায়মানমস্থন্বন্তং
যদনস্থা বিভর্তি।
ভূম্যা অসুরসৃগাত্মা ক্ব স্বিৎকো
বিদ্বাংসমুপ গাৎ প্রষ্টুমেতৎ॥ ১।১৬৪।৪

এর পরেই বৈদিক দেবতায় সন্দেহ প্রকাশ করলেন অনেকে। এই সন্দেহ প্রকাশিত হল ভৃগু গোত্রায় নেম ঋষির সূক্তে। তিনি বললেন, হে যুদ্ধাভিলাষী, ইন্দ্র আছেন এ যদি সত্য হয় তো তোমরা ইন্দ্রের উদ্দেশে সত্য উচ্চারণ কর। নেম বললেন, ইন্দ্র নামে কেউ নেই। কে দেখেছে তাঁকে? কার স্তুতি আমরা করব?—

প্র সু স্তোমং ভরত বাজয়ন্ত
ইন্দ্রায় সত্যং যদি সত্যমস্তি।
নেন্দ্রো অস্তীতি নেম উ ত্ব আহ
ক ঈং দদর্শ কমভি ষ্টবাম॥ ৮।১০০।৩

পরের ছুটি শ্লোকে নেম ঋষি নিজেই এই সন্দেহ ভঞ্জন করলেন। ইন্দ্র বললেন, হে স্তোতা, এই আমি তোমার কাছে এসেছি। আমাকে দেখ। সমস্ত ভুবনকে আমি আমার মহিমায় অভিভূত করি। যজ্ঞের প্রদেষ্টারা আমাকে বর্ধিত করে। আমি বিদারণশীল, আমি ভুবন বিদীর্ণ করি।—

অয়মস্মি জরিতঃ পশ্যমেহ বিশ্বা
জাতন্যভ্যস্মি মহ্না।
ঋতস্য মা প্রদিশো বর্ধয়ন্ত্যাদর্দিরো
ভুবনা দর্দরীমি॥ ৮।১০০।৪

নেম ঋষির মতো গৃৎসমদ ঋষিও দেখেছিলেন যে ইন্দ্রের প্রতি অবিচল

বিশ্বাস জনসাধারণের আর নেই। ইন্দ্রের অস্তিত্বে সন্দেহ প্রকাশ করে তারা বলছে, ইন্দ্র কোথায়? ইন্দ্র নেই। তাই তিনি দ্বিতীয় মণ্ডলের ১২ সূক্তে বললেন, যে ভয়ঙ্কর দেবতা সম্বন্ধে লোকে জিজ্ঞাসা করে যে তিনি কোথায় এবং বলে যিনি শাস্তিদাতার মতো শত্রুর সমস্ত ধন বিনাশ করেন তিনি নেই, হে মনুষ্যগণ, তাঁতে বিশ্বাস কর, তিনি ইন্দ্র।—

যং স্মা পৃচ্ছন্তি কুহ সেতি
ঘোরমুতেমাহুর্নৈষো অস্তীত্যেনম্।
সো অর্যঃ পুষ্টীর্বিজ ইবামিনাতি
শ্রদস্মৈ ধত্ত স জনাস ইন্দ্রঃ॥ ২।১২।৫

গৃৎসমদ ঋষি আরও বললেন যে যিনি দ্যোতমান, যিনি জন্মগ্রহণ করেই দেবতাদের প্রধান ও মানুষের অগ্রগণ্য হয়ে তাঁর বীর ধর্মে সকলকে ভূষিত করেছিলেন, যার দৈহিক বলে দ্যাবাপৃথিবী ভীত হয়েছিল, যিনি বহু সেনার নায়ক, তিনিই ইন্দ্র।—

যো জাত এব প্রথমোমনস্বান্দেবো
দেবান্ ক্রতুনা পর্যভূষৎ।
যস্য শুষ্মাদ্রোদসী অভ্যসেতাং নৃম্ণস্য
মহ্না স জনাস ইন্দ্রঃ॥ ২।১২।১

তারপর প্রজাপতি ঋষি বিশ্বদেবগণের স্তুতিতে বললেন যে দেবতাদের মহৎ বল একই।—

দেবানাং একং মুখ্যং অসুরত্বং। ৩।৫৫

এই সূক্তের সমস্ত ঋকের শেষেই এই কথাগুলি আছে। ম্যাক্সমুলার এর অনুবাদ করেছেন, The great divinity of the gods is one. প্রজাপতি ঋষি প্রকৃতির সব কাজে ঐক্য দেখতে পেয়ে দেবতাদের কাজের ঐক্য ও ঐশ্বরিক ক্ষমতার একতা প্রকাশ করেছেন এই সূক্তে। 'অগ্নি বেদীতে বিরাজ করেন, বলে প্রজ্বলিত হন, অকালে উৎপন্ন হন, পৃথিবীতে বিকশিত হন (৪ ঋক); তিনি উত্তাপ রূপে শস্য উৎপাদন করেন (৫ ঋক); সূর্য রূপে পশ্চিম দিকে অস্ত গিয়ে পূর্ব দিকে উদয় হন

(৬ ঋক) ; আকাশে বিচরণ করেন, ভূমিতে বাস করেন (৭ ঋক) ; দিবা ও রাত্রি পরস্পরে সঙ্গত হয়ে আসছে ও যাচ্ছে (১১ ঋক) ; আকাশ ও পৃথিবী পরস্পরকে বৃষ্টি ও বাষ্প রূপে রস দান করছে (১২ ঋক) ; এবং যে নৈসর্গিক নিয়মে এক দিকে বজ্র হচ্ছে, সে নিয়মে অন্য দিকে বৃষ্টি হচ্ছে (১৭ ঋক) ; একই নির্মাণকর্তা মনুষ্য ও পশু পক্ষীকে সৃষ্টি করেছেন (১৯, ২০ ঋক) ; তিনি শস্য উৎপাদন করেন, বৃষ্টি দান করেন, ধনধান্য উৎপন্ন করেন (২২ ঋক)। প্রকৃতির অনন্ত কার্য পরম্পরাকে ভিন্ন ভিন্ন দেবের নামে স্তুতি করা হয়, সে কার্য পরম্পরায় একতা দেখে ঋষি বলছেন, দেবগণের কার্যসমূহ ভিন্ন নহে, তাঁদের দৈব ক্ষমতা, ঐশ্বরিক বল একই। মনুষ্য হৃদয়ে এ রূপেই প্রকৃতির এক নিয়ন্তা, এক ঈশ্বরের অনুভব উদয় হয়।'—

দেবানাং একং মুখ্যং অমুরত্বং .....প্রাবল্যং মহৎ ঐশ্বর্যং।

বরুণের স্তুতিতে অত্রি ঋষিও একই কথা বললেন। 'দৈব কার্য পরম্পরার ঐক্য দেখে এক ঈশ্বরের অনুভব মনুষ্য হৃদয়ে উদয় হয়। যিনি সূর্যদ্বারা অন্তরীক্ষের পরিমাণ নেন (৫ ঋক), তিনি নদী সকলকে এক মহাসমুদ্রে প্রেরণ করেন ; অথচ সে মহাসমুদ্র কখনও পরিপূর্ণ হয় না (৬ ঋক) এবং তিনিই মনুষ্যের পাপ বিনষ্ট করেন ও অপরাধ খণ্ডন করেন (৭ ও ৮ ঋক)। ঋগ্বেদ ৫।৮৫ সূক্ত।'

ঋগ্বেবেদের দশম মণ্ডলে ঋষিদের এক ঈশ্বরের ধারণা আরও স্পষ্টরূপে ব্যক্ত হয়েছে। প্রকৃতির সমস্ত কাজের একমাত্র নিয়ন্তার অস্তিত্ব অনুভব করে বিশ্বকর্মা ঋষি সেই নিয়ন্তাকে বিশ্বকর্মা নামে অভিহিত করেছেন। তাঁর ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে যে দেবতারা এক ঈশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন নাম। তাই তিনি বলেছেন, যিনি আমাদের জন্মদাতা পিতা বিধাতা, বিশ্বভুবনের সকল ধাম যিনি অবগত আছেন এবং নিজে এক হয়েও সকল দেবতার নাম ধারণ করেন। অন্য সব ভুবনের লোক তাঁর বিষয়েই জানতে চায়।—

যো নঃ পিতা জনিতা যো বিধাতা
ধামানি বেদ ভুবনানি বিশ্বা।

যো দেবানাং নামধা এক এব তং
সংপ্রশ্নং ভুবনা যন্ত্যন্যা। ১০।৮২।৩

যিনি এই সৃষ্টি করছেন, তাঁকে তোমরা বুঝতে পার না। তোমাদের অন্তঃকরণ তা বোঝবার ক্ষমতা পায় নি। কুজ্ঝটিকায় আচ্ছন্ন হয়ে লোকে নানা জল্পনা করে, প্রাণের তৃপ্তির জন্য আহারাদি করে এবং স্তবস্তুতি করে বিচরণ করে।—

ন তং বিদাথ য ইমা
জজানান্যদ্যুষ্মাকমন্তরং বভূব।
নীহারেণ প্রাবৃতা জল্প্যা
চাসুতৃপ উক্‌থশাসশ্চরন্তি॥ ১০।৮২।৭

এই বিশ্বকর্মাকেই কবষ ঋষি বিশ্বদেব বলেছেন। তিনি স্বয়ম্ভূ ও শ্রেষ্ঠ। ঋষি বলেছেন, দ্যুলোক ও ভূলোকই শেষ নয়, এদের উপর আরও এক আছে। তিনিই প্রজা সৃষ্টি কর্তা, দ্যুলোক ও ভূলোক তিনিই ধারণ করে আছেন, তিনিই অন্নের প্রভু। সূর্যের অশ্বরা যখন সূর্যকে বহন করত না, সেই পুরাকালে তিনি তাঁর পবিত্র দেহ ধারণ করেছিলেন।—

নৈতাবদেনা পরো অন্যদস্ত্যুক্ষা
য দ্যাবাপৃথিবী বিভর্তি।
ত্বচং পবিত্রং কৃণুত স্বধাবান্যদাং
সূর্যং ন হরিতো বহন্তি। ১০।৩১।৮

তারপর প্রজাপতি ঋষি দশম মণ্ডলের ১২৯ সূক্তে সৃষ্টির বন্দনা করলেন, এখন যা নেই সেকালে তাও ছিল না, যা আছে তাও ছিল না। পৃথিবী ছিল না, সুদূর বিস্তৃত আকাশও ছিল না। আবরণ করে এমন কিছু ছিল? কোথায় কার স্থান ছিল? গহন ও গভীর জলও কি তখন ছিল?—

নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীং
নাসীদ্রজো নো ব্যোমা পরো যৎ।
কিমাবরীবঃ কুহ কস্য শর্মন্নম্ভঃ
কিমাসীদ্গহনং গভীরম্॥ ১০।১২৯।১

কবি প্যারীমোহন সেনগুপ্ত এই সূক্তের অনুবাদ করেছেন—

না ছিল সত্তা নাহি অ-সত্তা,
না ছিল পবন, আকাশতল,
কিবা ছিল ঢাকা ? কোথা ? কে ধর্তা ?
গহন গভীর ছিল কি জল ? ।১।

না ছিল মৃত্যু, অ-মৃত নেই,
না ছিল রাত্রি অথবা দিন,
বায়ুহীন শ্বাস টানি এক সেই
ছিল জাগ্রত সকল-হীন ।২।

ছিল শুধু গূঢ় তমসা গহন,
সীমাহীন জল নাইকো তীর,
সম্ভব ছিল শূন্যে গোপন,
নিজ তপে জাগে 'এক' যে বীর ।৩।

প্রথমে জাগিল কামনা তাঁহার—
সে কাম মনের নবাঙ্কুর ;
জাগিল কবির মনীষা বিভায়
অস্তি-নাস্তি-মিলন-সুর ।৪।

উজলে আঁধার প্রজ্ঞা-গরিমা—
নিম্নে ? উর্ধ্বে ? 'এক' সে কই ?
সৃষ্টি পুরুষ বিকাশে মহিমা
উর্ধ্বে, প্রকৃতি নিম্নে ওই ।৫।

কে জানে সে কথা, আদিম বারতা ?
কিরূপে জন্ম সৃষ্টি সব ?
বিশ্ব প্রথমে, পরে তো দেবতা,
কে তবে জানিবে সে উদ্ভব ? ।৬।

কে জানে সৃষ্টি জাগিল কিরূপ ?—
তিনি কি স্রষ্টা ? অথবা নয় ?

শূন্যে বিরাট আছিল যে ভূপ
সে শুধু জানে, অথবা নয়। ।৭।

প্রকৃতির সৌন্দর্য ও কার্যকে ঋষিরা যে দেবতা বলে মানতেন, তাঁরা তো আদি দেব নন, তাঁরাও সৃষ্ট হয়েছেন। তবে তার কারণ কে? আদিই বা কে? মানুষ যে এ প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম নয়, ঋষি তা স্বীকার করছেন।—

কো অদ্ধা বেদ ক ইহ প্র বোচৎকুত
আজাতা কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ।
অর্বাগ্ দেবা অস্য বিসর্জনে নাথা
কো বেদ যত আবভূব ॥ ৬
ইয়ং বিসৃষ্টির্যত আবভূব
যদি বা দধে যদি বা ন।
যো অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্
যো অঙ্গ বেদ যদি বা ন বেদ ॥ ১০।১২৯।৭

এর পরে দশম মণ্ডলের ১২১ সূক্তে হিরণ্যগর্ভ ঋষি প্রশ্ন করলেন, আমরা কোন্ দেবতার পূজা করব?—কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম। নাম-চিহ্নের অতীত সেই দেবতাই সৃষ্টি ও স্থিতির কর্তা। ঋষি তাঁর পরিচয় দেবার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। কবি প্যারীমোহন সেনগুপ্ত এই সূক্তের সম্পূর্ণ অনুবাদ করেছেন এবং রবীন্দ্রনাথ করেছেন ২ থেকে ৬ ও ৯ ঋকের অনুবাদ।

আপনারে দেন যিনি,
সদা যিনি দিতেছেন বল,
বিশ্ব যাঁর পূজা করে,
পূজে যাঁরে দেবতা সকল,
অমৃত যাঁহার ছায়া,
যাঁর ছায়া মহান্ মরণ,
সেই কোন্ দেবতারে
হবি মোরা করি সমর্পণ! ২

যিনি মহামহিমায়
জগতের একমাত্র পতি,
দেহবান্ প্রাণবান্
সকলের একমাত্র গতি,
যেথা যত জীব আছে
বহিতেছে যাঁহার শাসন,
সেই কোন্ দেবতারে
হবি মোরা করি সমর্পণ ! ৩

এই সব হিমবান্
শৈলমালা মহিমা যাঁহার,
মহিমা যাঁহার এই
নদী-সাথে মহা পাবাবার,
দশ দিক যাঁর বাহু
নিখিলেরে করিছে ধারণ,
সেই কোন্ দেবতারে
হবি মোরা করি সমর্পণ ! ৪

দ্যুলোক যাঁহাতে দীপ্ত,
যাঁর বলে দৃঢ় ধরাতল,
স্বর্গলোক সুরলোক
যাঁর মাঝে রয়েছে অটল,
শূন্য অন্তরীক্ষে যিনি
মেঘরাশি করেন সৃজন,
সেই কোন্ দেবতারে
হবি মোরা করি সমর্পণ ! ৫

দ্যুলোক ভূলোক এই
যাঁর তেজে স্তব্ধ জ্যোতির্ময়

নিরন্তর যাঁর পানে

একমনে তাকাইয়া রয়,

যাঁর মাঝে সূর্য উঠি

কিরণ করিছে বিকিরণ,

সেই কোন্ দেবতারে

হবি মোরা করি সমর্পণ ! ৬

সত্যধর্মা দ্যুলোকের

পৃথিবীর যিনি জলয়িতা,

মোদেব বিনাশ তিনি

না করুন, না করুন পিতা !

যাঁর জলধারা সদা

আনন্দ করিছে বরিষণ,

সেই কোন্ দেবতাবে

হবি মোরা করি সমর্পণ ! ৯

বৈদিক ঋষিরা ইন্দ্রকেও অনেক জায়গায় অজব অমব ও অসীম বলে বন্দনা করেছেন, তাঁরই উপ'রে আরোপ কবেছেন ঈশ্বরত্ব। সামবেদ সংহিতায় এই ভাব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ঋষি বলছেন, হে ইন্দ্র, তোমার পরিমাণ করতে যদি সমস্ত দ্যুলোক ও পৃথিবী শত সংখ্যক হয় তবু তা তোমাকে ছাড়িয়ে যেতে পাববে না। সহস্র সূর্য তোমাকে অনুভব করতে পারছেন না, দ্যাবা পৃথিবীও তোমাকে ঘিরতে পারেন না।—

যদ্দ্যাব ইন্দ্র ! তে শতঙ্ শতং ভূমী রুত স্যুঃ।

ন ত্বা বজ্রিংৎ সহস্রঙ্ সূর্যা অনু ন জাত মষ্ট রোদসী॥

—সাম ১।৩।২।৪।৬

ঋষিরা ইন্দ্রকেই পরমাত্মা ভেবে বলেছিলেন, হে ইন্দ্র, সর্বভূতের প্রকাশক পরমাত্মা, পিতা যেমন পুত্রকে বিদ্যা বা ধন দান করে তেমনি তুমিও আমাদের আত্মবিষয়ক জ্ঞান দান কর। হে পুরুহূত, আমরা জীবেরা যেন সকলের কাম্য পরব্রহ্মে লীন হয়ে পরজ্যোতির সেবা করতে পারি।

ইন্দ্র ! ক্রতুন্ন আভর পিতা পুত্রেভ্যো যথা।
শিক্ষা ণো অস্মিন্ পুরুহূত ! য়ামনি জীবা জ্যোতি রশীমহি।

—সাম ১।৩।২।২।৭

অথর্ববেদ সংহিতায় আমরা কালকেই পরমাত্মা রূপে বন্দিত হতে দেখি। ১৯ কাণ্ডের ৬ অনুবাকের অষ্টম সূক্তটি এখন স্বর্ণ ও ভূমিদানে আজ্য-হোমে বিনিয়োগ হয়। এই সূক্তের প্রথমে কালকে অশ্ব রূপে কল্পনা করা হয়েছে, পরে এই কালকেই জগতের কারণ পরমাত্মা রূপে বন্দনা করা হয়েছে। ঋষি বলছেন, কাল রূপ পরমাত্মা এই দ্যুলোক ও দৃশ্যমান পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। কালই ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমান কালাবচ্ছিন্ন জগৎ আশ্রয় করে আছে। কাল রূপ পরমাত্মা এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন, কালের প্রেরণা-তেই সূর্যের তাপে এই জগৎ প্রকাশিত হয়। কালের আশ্রয়েই সমস্ত বিশ্ব অবস্থান করছে, কালের নির্দেশেই চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় দর্শনাদি কাজ করে।

কালোঽমূং দিবমজনয়ৎ কাল ইমাঃ পৃথিবীরুত।
কালে হ ভূতং ভব্যং চেষিতং হ বি তিষ্ঠতে ॥ ৫ ॥
কালো ভূতিমসৃজত কালে তপতি সূর্যঃ।
কালে হ বিশ্বা ভূতানি কালে চক্ষুর্বি পশ্যতি ॥ ৬ ॥

—অথর্ব ১৯ কাণ্ড ৬ অনুবাদ ৮ সূক্ত।

এই ভাবেই বেদের ঋষিরা বহু দেবতার মধ্যে এক ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুভব করে নানাভাবে তা প্রকাশ করেছেন। তাঁরা তাঁর দর্শন পান নি। বলেছেন, তিনি নীহারিকায় আবৃত। তাঁর অস্তিত্ব আমরা অনুভব করতে পারি। কল্পনা করতে পারি তাঁকে, তার বেশি কিছু পারি না।
তিনি আমাদের জল্পনার বিষয় হয়ে আছেন।-- নীহারেণ প্রাবৃতা জল্প্যা···

আত্মা ও পরলোক

কিন্তু জীবাত্মা সম্বন্ধে কোন তত্ত্ব পাওয়া যায় না। জীবাত্মা শব্দটি সায়নের টীকায় পাওয়া গেছে। দুটি পাখি এক গাছে বন্ধুভাবে বাস করে। তাদের মধ্যে একটি সুস্বাদু পিপুল ফল খায়, অন্যটি খায় না, শুধু দেখে।

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরণ্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যো অভি চাকশীতি॥

—ঋগ্বেদ ১।১৬৪।২০

এই ঋকেরই ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সায়ন বলেছেন যে এই দুটি পাখিই হল জীবাত্মা ও পরমাত্মা। জীবাত্মা কর্মফল ভোগ করে, পরমাত্মা কেবল তা অবলোকন করে। এর পূর্বে চন্দ্র সূর্যের উল্লেখ আছে বলে চন্দ্র সূর্য বা দিবারাত্রিকে পাখিরূপে কল্পনা করাও অসম্ভব নয়। এই সুপর্ণ শব্দটি ঋগ্বেদের আর এক স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে। সেখানে স্পষ্টতই এর অর্থ পরমাত্মা। পাখি একই আছেন, বুদ্ধিমান পণ্ডিতরা তার নানারকম বর্ণনা করেন।—

সুপর্ণং বিপ্রাঃ কবয়ো বচোভিরেকং সন্তং বহুধা কল্পয়ন্তি।

—ঋগ্বেদ ১০।১১৪।৫

ঋগ্বেদে পাপ সম্বন্ধে কোন মন্তব্য নেই। দ্বিতীয় মণ্ডলের ২৭, ২৮ ও ২৯ সূক্তে কিছু পবিত্র চিন্তার কথা আছে। বরুণের স্তুতিতে তা প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু পুণ্যফলের কথা আছে। দশম মণ্ডলের ৫৬ সূক্তে বৃহদুক্থ ঋষি তাঁর মৃতপুত্র বাজিল সম্বন্ধে বলেছেন যে পুণ্যকর্মের ফলে স্বর্গ লাভ হয়। পুণ্যাত্মা পূর্বপুরুষেরা দেবত্ব লাভ করে অখিল ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করেছেন। তৃতীয় থেকে পঞ্চম ঋকে ঋষি বলছেন, হে পুত্র, তুমি সুশ্রী ও বলবান ছিলে। তুমি যে রকম সুন্দর স্তব করেছিলে, তেমনি সুন্দর স্বর্গে যাও। তুমি যে ধর্মানুষ্ঠান করেছ, তার সুফল লাভ কর। আমাদের পূর্ব পুরুষেরা দেবতার মতো মহিমান্বিত হয়ে তাঁদের সঙ্গে ক্রিয়াকলাপ করছেন। তাঁরা জ্যোতির্ময় পদার্থের সঙ্গে এক হয়ে দেবতাদের শরীরে প্রবেশ করেছেন; নিজ ক্ষমতার বলে তাঁরা ব্রহ্মাণ্ডে বিচরণ করেছেন; যেখানে কেউ যায় না, সেখানেও তাঁরা গিয়েছেন। নিজের শরীরে সমস্ত ভুবন আয়ত্ত করে সমস্ত প্রজার মধ্যে নিজ প্রভাব বিস্তার করেছেন।—

বাজ্যসি বাজিনেনা সুবেনীঃ সুবিতঃ স্তোমং সুবিতো দিবং গাঃ।
সুবিতো ধর্ম প্রথমানু সত্যা সুবিতো দেবান্ত্সুবিতোঽনু পত্ম॥

মহিম্ন এষাং পিতরশ্চনেশিরে দেবা দেবেষ্বদধুরপি ক্রতুম্।
সমবিব্যচুরুত যান্যত্বিষুরৈষাং তনূষু নিবিশুঃ পুনঃ॥
সহোভির্বিশ্বং পরি চক্রমু রজঃ পূর্বা ধামান্যমিতা মিমানাঃ।
তনূষু বিশ্বা ভুবনা নি যেমিরে প্রাসারয়ন্ত পুরুধ প্রজা অনু॥

—ঋগ্বেদ ১০।৫৬।৩-৫

ঋগ্বেদে স্বর্গের সুন্দর বর্ণনাও আছে। নবম মণ্ডলের ১১৩ সূক্তে কশ্যপ ঋষি বলেছেন, যে ভুবন সর্বদাই আলোকিত ও স্বর্গলোক যেখানে সংস্থাপিত, হে সোম, সেই অক্ষয় অমৃত ধামে আমাকে নিয়ে চল। ইন্দ্রের জন্য তুমি ক্ষরিত হও। যেখানে স্বর্গের দ্বার আছে, আছে প্রকাণ্ড নদী এবং বৈবস্বত রাজাও যেখানে আছেন, সেখানে নিয়ে গিয়ে আমাকে অমর কর। ইন্দ্রের জন্য তুমি ক্ষরিত হও। যেস্থান সর্বদা আলোকময় ও যেখানে ইচ্ছামতো বিচরণ করা যায়, নভোমণ্ডলের ঊর্ধ্বে সেই তৃতীয় দিবালোক তৃতীয় নাগলোকে আমাকে অমর কর। ইন্দ্রের জন্য তুমি ক্ষরিত হও। যেখানে প্রধ নামের দেবতার ধাম আছে, সকল কামনা যেখানে নিঃশেষে পূর্ণ হয়, যেখানে প্রচুর আহার্য ও তৃপ্তি লাভ আছে, সেখানে আমাকে অমর কর। ইন্দ্রের জন্য তুমি ক্ষরিত হও। যেখানে নানাবিধ আনন্দ ও আমোদ-প্রমোদ আহ্লাদ আছে, যেখানে অভিলাষীর সকল বাসনা পূর্ণ হয়, সেখানে আমাকে অমর কর। হে সোম, ইন্দ্রের জন্য তুমি ক্ষরিত হও।

যত্র জ্যোতিরজস্রং যস্মিল্লোঁকে স্বর্হিতম্।
তস্মিন্মং ধেহি পবমানামৃতে লোকে অক্ষিত ইন্দ্রায়েন্দো পরি স্রব॥
যত্র রাজা বৈবস্বতো যত্রাবরো ধনং দিবঃ।
যত্রামূর্যহ্বতীরাপস্তত্র মামমৃতং কৃধীন্দ্রায়েন্দো পরি স্রব॥
যত্রানুকামং চরণং ত্রিনাকে ত্রিদিবে দিবঃ।
লোকা যত্র জ্যোতিষ্মন্তস্তত্র মামমৃতং কৃধীন্দ্রায়েন্দো পরি স্রব॥
যত্র কামা নিকামাশ্চ যত্র ব্রধ্নস্য বিষ্টপম্।
স্বধা চ যত্র তৃপ্তিশ্চ তত্র মামমৃতং কৃধীন্দ্রায়েন্দো পরি স্রব॥

যত্রানন্দাশ্চ মোদাশ্চ মুদঃ প্রমুদ আসতে।
কামস্য যত্রাপ্তাঃ কামাস্তত্র মামমৃতং কৃধীন্দ্রায়েন্দো পরি স্রব ॥

—ঋগ্বেদ ৯।১১৩।৭-১১

ঋগ্বেদে কর্মফল ও পরলোকের অর্থ হল এই। যম এই পরলোকে সুখের বিধাতা, মানুষের সব পুণ্য কর্মের পুরস্কার দেন তিনি। দশম মণ্ডলের চতুর্দশ সূক্তে যম ঋষি বলেছেন, হে অন্তঃকরণ, তুমি বিবস্বানের পুত্র যমকে হোমের উপকরণ দিয়ে সেবা কর। যারা সৎকর্ম করে তিনি তাদের সুখের দেশে নিয়ে যান, তিনি অনেকের পথ পরিষ্কার করে দেন এবং সকলে তাঁর নিকটেই যায়। আমরা কোন্ পথে যাব, তা তিনিই প্রথমে প্রদর্শন করেন। সে পথ আর নষ্ট হবে না, যে পথে আমাদের পিতৃপুরুষেরা গিয়েছেন, নিজ নিজ কর্ম অনুসারে সকল জীব সেই পথেই যাবে।—

পরেয়িবাংসং প্রবতো মহীরনু বহুভ্যঃ পন্থামনুপস্পশানম্।
বৈবস্বতং সঙ্গমনং জনানাং যমং রাজানং হবিষা দুবস্য ॥
যমো নো গাতুং প্রথমো বিবেদ নৈষা গব্যূতিরপভর্তবা উ।
যত্রা নঃ পূর্বে পিতরঃ পরেয়ুরেনা জজ্ঞানাঃ পথ্যা অনু স্বাঃ ॥

—ঋগ্বেদ ১০।১৪।১-২

বেদে পুনর্জন্মের কথা পাওয়া যায় না।

ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদে ঈশ্বরচিন্তা

পরবর্তী কালে দেখা গেল যে সমাজে যাগ যজ্ঞের অনুষ্ঠান বেড়েছে এবং এই প্রবণতা আরও বৃদ্ধির দিকে যাচ্ছে। তাই বেদমন্ত্রের অর্থ মীমাংসা ও যজ্ঞানুষ্ঠানের নিয়মাদি নির্ধারণের প্রয়োজন হয়ে পড়ল। এক সময়ে এই সব ক্রিয়া-কলাপের বিস্তৃত বিবরণ ও আলোচনা এক সঙ্গে গ্রথিত হল। তারই নাম ব্রাহ্মণ। সমস্ত বেদেরই ব্রাহ্মণ আছে।

আরণ্যক কোন ভিন্ন গ্রন্থ নয়। ব্রাহ্মণের যে অংশ অরণ্যে পাঠ করা হতো, তাকেই আরণ্যক বলে। বৈদিক ক্রিয়াকর্মে বেদমন্ত্র কী ভাবে ব্যবহৃত হবে, আরণ্যকেও সেই আলোচনা আছে। অনেক সময়ে এতে গভীর তত্ত্বকথাও

পাওয়া যায়। তা ঋষিদের গভীর চিন্তার ফসল। আরণ্যকের এই সব অধ্যায়কে উপনিষৎ বলে। এতে আত্মা ও পরলোক বিষয়ে বহু আলোচনা আছে, পরমাত্মা বা ব্রহ্ম সম্বন্ধে ঋষিদের পরিণত চিন্তা।

ব্রাহ্মণ ও আরণ্যকের ঋষিরা কর্মকাণ্ডের প্রচলন করেন এবং উপনিষদের ঋষিরা বলেন যে যাগ যজ্ঞ পূজার্চনায় ঈশ্বরচিন্তা ও জীবনে শান্তি লাভ হতে পারে, কিন্তু ঈশ্বরকে পাওয়া যাবে না। কারণ ঈশ্বর পাবার মতো কোন বস্তু নন। এক মাত্র জ্ঞানের দ্বারাই ঈশ্বরের অন্বেষণ সার্থক হতে পারে। তাই তাঁরা কর্মকাণ্ডের পরিবর্তে জ্ঞানকাণ্ডে ঈশ্বরের অন্বেষণ শুরু করলেন। এরই প্রত্যক্ষ ফসল এক একটি উপনিষৎ।

ঋগ্বেদে আছে যে সুপর্ণ একই, বুদ্ধিমান কবিরা তাঁকে কল্পনায় নানা ভাবে বর্ণনা করেন।—

সুপর্ণং বিপ্রাঃ কবয়ো বচোভিরেকং
সন্তং বহুধা কল্পয়ন্তি।— —ঋ. ১০।১১৪।৫

অর্থাৎ ঈশ্বর এক, তাঁকেই আমরা নানা রূপে দেখি। অনেক সময়ে মনে হতে পারে যে এক ঈশ্বর ঋষিদের কাছে অনেক হয়ে গেছেন। নিরুক্তকার যাস্ক বলেছেন যে ঈশ্বরের কল্পনা এমন বিশাল যে একজনকেই অনেক রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। ঋগ্বেদেই এ কথার ভিত্তি আছে।—

একম্ সৎ বহুধা বদন্তি।

একটি সত্যেরই নানা নাম দিয়েছেন তাঁরা, একজনকেই নানা রূপে কল্পনা করেছেন।—

কবয়ঃ একম্ সন্তম্ বহুধা কল্পয়ন্তি।

উপনিষদে এই ঈশ্বর ভাবনা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ঋষিরা বললেন যে সকল জ্ঞানের আশ্রয় হল আত্মকাল। আত্মাকে না জানলে কোন বস্তুই জানা হয় না। আমি জানি, এই জানার উপরেই আমাদের সমস্ত জ্ঞান নির্ভর করে। নিজের চোখে দেখতে পাই বলেই আমরা রূপ বা বর্ণ দেখি, নিজের কানে শুনি বলেই আমরা শব্দ চিনি। নিজের ইন্দ্রিয় দিয়েই আমাদের প্রাথমিক জ্ঞান লাভ হয়, নিজেকে বাদ দিয়ে কোন জ্ঞানার্জন

সম্ভব নয়। আত্মজ্ঞানের উপরেই প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ—এই তিন প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত। আত্মার আশ্রিত হয়েই সমস্ত বস্তুর প্রকাশ। কাজেই জ্ঞানের বিষয়ে আমরা নানা রূপে ও বর্ণে আত্মাকেই প্রত্যক্ষ করি। এরই নাম খণ্ডন আত্মা। নিজের আত্মাই নানা ভাবে প্রকাশিত হয়। মুণ্ডক উপনিষদের ভাষায়, যিনি সর্বভূতের সঙ্গে বা সর্বভূত রূপে প্রকাশিত হন, তিনি প্রাণ।—

প্রাণোহ্যেষ যঃ সর্বভূতৈ বিভাতি। —মুণ্ডক ৩।১।৪

এই আত্মাই পরব্রহ্ম। তাঁকে চোখ দিয়ে দেখা যায় না। হৃদয়গত সংশয়-শূন্য জ্ঞানে তিনি যখন দৃষ্ট হন, তখনই তিনি প্রকাশিত। এই ভাবে তাঁকে জানলেই অমৃতত্ব লাভ হয়।—

ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য
ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্।
হৃদা মনীষা মনসাভিক্লৃপ্তো য
এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি॥ —কঠ ২।৩।৯

পৃথিবীর আদি বীজ মহত্তত্ত্ব থেকে সূক্ষ্ম, পরমাত্মা আরও সূক্ষ্ম, সেই পুরুষের চেয়ে সূক্ষ্ম আর কিছু নেই।—

মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ।
পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ যা কাষ্ঠা যা পরাগতিঃ॥ —কঠ ৩।১১

সেই পুরুষের জন্ম নেই, মৃত্যু নেই, কোন কারণে তার উৎপত্তি হয় নি, তিনি নিজেও নিজের কারণ নন। তিনি জ্ঞান স্বরূপ, তিনি অজনিত্য শাশ্বত ও পুরাতন। দেহ বিনষ্ট হলেও তিনি নিহত হন না।—

ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ
নায়ং কুতশ্চিৎ ন বভূব কশ্চিৎ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥ —কঠ ২।১৮

এই পুরুষ থেকেই মন প্রাণ সমস্ত ইন্দ্রিয় তাদের বিষয় এবং আকাশ বাতাস জল জ্যোতি বিশ্বের ধারণকর্ত্রী পৃথিবীর জন্ম হয়েছে।—

এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্বেন্দ্রিয়ানি চ।

খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিনী॥ —মুণ্ডক ২।১।৩

উপনিষদে আত্মা ও ব্রহ্ম একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কঠোপনিষদে ব্রহ্ম সর্বভূতের অন্তরাত্মা। মাণ্ডুক্যোপনিষদে যিনি আত্মা তিনিই ব্রহ্ম—অয়মাত্মা ব্রহ্ম। আত্মজ্ঞানই সকল জ্ঞানের মূলে, আত্মজ্ঞানেই সব কিছু প্রকাশিত হয়। আত্মাকে না জেনে কোন বস্তুকেই জানা যায় না। সূর্য চন্দ্র বিদ্যুৎ ও অগ্নি কেউই তাঁকে প্রকাশ করতে পারে না। সমস্ত বস্তুই সেই প্রকাশ স্বরূপের অনুপ্রকাশ মাত্র। তাঁর দ্বারাই এই সমস্ত প্রকাশিত হচ্ছে—

ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্র তারকং নেমা

বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।

তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব,

তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি॥— —কঠ ৫।১৫

ঋষিরা বললেন, আত্মাই ঈশ্বর, কিন্তু কে তাঁকে দেখতে পায়? আত্মা সর্বব্যাপী হয়েও অবিদ্যার মায়ায় আচ্ছন্ন। জ্ঞানহীনের হৃদয়ে তাঁর প্রকাশ নেই। সূক্ষ্মদর্শীর সূক্ষ্ম বুদ্ধিতেই তাঁর দর্শন মিলতে পারে।—

এষ সর্বেষু ভূতেষু গূঢ়াত্মা ন প্রকাশতে।

দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ॥— —কঠ ৩।১২

তিনি আনন্দরূপ অমৃত। আনন্দ থেকেই সব কিছু উৎপন্ন হয়েছে, আনন্দেই তা বিধৃত আছে এবং অন্তিমে আনন্দেই সব কিছু বিলীন হচ্ছে।

সত্যং জ্ঞানমন্তং ব্রহ্ম।— —তৈত্তিরীয় ২।১।২

আনন্দ রূপমমৃতং যদ্ বিভাতি। —মুণ্ডক ২।২।৭

শান্তং শিবমদ্বৈতম্। —মাণ্ডুক্য ৭

সত্য রূপেতে আছেন সকল ঠাঁই,

জ্ঞানরূপে তাঁর কিছু অগোচর নাই,

দেশে কালে তিনি অন্তহীন অগম্য—

তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই পরম ব্রহ্ম।

তাঁরই আনন্দ দিকে দিকে দেশে দেশে
প্রকাশ পেতেছে কত রূপে কত বেশে—
তিনি প্রশান্ত তিনি কল্যাণ হেতু,
তিনি এক, তিনি সবার মিলন সেতু।

—রবীন্দ্রনাথ

এই পরমাত্মা সব চেয়ে অন্তরতম। পুত্রের চেয়ে প্রিয়, বিত্তের চেয়ে প্রিয়, সব কিছুর চেয়েও প্রিয়।—

তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ
সর্বস্মাৎ অন্তরতরং যদয়মাত্মা। —বৃহদারণ্যক ১।৪।৮

তোমারে বলেছে যারা পুত্র হতে প্রিয়,
বিত্ত হতে প্রিয়তর, যা কিছু আত্মীয়
সব হতে প্রিয়তম নিখিল ভবনে,
আত্মার অন্তরতর, তাদের চরণে
পাতিয়া রাখিতে চাহি হৃদয় আমার।

আমরা যে শান্তি বচন পাঠ করি তার অর্থ—পরব্রহ্ম পূর্ণ, নাম রূপে স্থিত ব্রহ্মও পূর্ণ। এই সব সূক্ষ্ম ও স্থূল পদার্থ পরিপূর্ণ ব্রহ্ম থেকে উদ্গত বা অভিব্যক্ত হয়েছে। আর সেই পূর্ণ স্বভাব ব্রহ্ম থেকে পূর্ণত্ব লাভ করলেও পরব্রহ্মই অবশিষ্ট থাকেন।—

ও পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥ —ঈশ, শান্তি স্তোত্র।

উপনিষদের ঋষিরা তাই বিশ্ববাসীকে বলেছেন—

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ। —শ্বেতাশ্বতর ২।৫

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাঽতি মৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥ —শ্বেতাশ্বতর ৩।৮

শোনো বিশ্বজন,
শোনো অমৃতের পুত্র যত দেবগণ,
দিব্যধামবাসী, আমি জেনেছি তাঁহারে
মহান্ত পুরুষ যিনি আঁধারের পারে
জ্যোতির্ময়। তাঁরে জেনে তাঁর পানে চাহি
মৃত্যুরে লঙ্ঘিতে পারো, অন্য পথ নাহি।

— ববীন্দ্রনাথ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ভারতীয় দর্শন

ষড় বেদাঙ্গ—ষড় দর্শন—কপিল ও সাংখ্য দর্শন—কণাদ ও বৈশেষিক দর্শন—গৌতম ও ন্যায় দর্শন—পতঞ্জলি ও যোগ দর্শন—জৈমিনি ও মীমাংসা দর্শন—বেদব্যাস ও বেদান্ত দর্শন—চার্বাক ও চার্বাক দর্শন।

ষড় বেদাঙ্গ

উপনিষদের সমসাময়িক কালে এবং তার অব্যবহিত পরবর্তী সময়ে অনেকগুলি সূত্র-গ্রন্থ রচিত হয়। সূচনাদ্ধি সূত্রং অর্থাৎ বহু অর্থের সূচনাকারী বাক্যের নাম সূত্র। এর মানে এই যে অল্প অক্ষর যুক্ত যে সার সিদ্ধান্তের কোন সংশয় নেই, সংশয় উপস্থিত হলেও যা নিবারণের উপায় আছে, একটি অক্ষরও যার নিরর্থক নয় ও তর্কের পথ যাতে সবতোভাবে প্রদর্শিত, তারই নাম সূত্র। ঋষিরা যখন কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডে ঈশ্বরলাভে যত্নবান, তখন তাঁদেব মতান্তর ও বাদানুবাদও প্রবল হয়ে উঠেছিল। কোন ঋষি গৃহ্যসূত্র প্রণয়ন করে গৃহস্থকে তার জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি কর্মকাণ্ডের নিয়মাবলী শেখাতে লাগলেন, আবার কোন ঋষি বনবাসী ব্রাহ্মণদের যাগ যজ্ঞ বলিদান প্রভৃতি কর্মকাণ্ডের জন্য রচনা করলেন শ্রৌত সূত্র। ধর্মসূত্রে সমাজে বসবাসের জন্য নিয়মাদি ও কর্তব্য 'কর্মের বিধান বিধিবদ্ধ হল। অথাৎ গার্হস্থ্য ধর্মের জন্য গৃহ্যসূত্র, যাগযজ্ঞের জন্য শ্রৌতসূত্র ও সমাজধর্ম পালনের জন্য ধর্মসূত্র। এই তিন রকমের সূত্র প্রণয়নের উদ্দেশ্য ছিল অত্যন্ত সংক্ষেপে তত্ত্বের সার সংগ্রহ করা, যাতে ব্রাহ্মণেরা তা কণ্ঠস্থ করে ক্রিয়াকর্মে তা প্রয়োগ করতে পারেন। এই সব সূত্রের বহু শাখা প্রশাখা ছিল, এখন তার বেশির ভাগই পাওয়া যায় না।

এই তিন সূত্রের সাধারণ নাম কল্পসূত্র এবং ষড় বেদাঙ্গের শেষ অঙ্গ। বেদের অন্য পাঁচটি অঙ্গ হল শিক্ষা, ছন্দ, ব্যাকরণ, নিরুক্ত ও জ্যোতিষ। কিন্তু এই সব গ্রন্থে ঋষিরা ঈশ্বরের সন্ধান করেন নি। কল্পসূত্রে কেবল কর্মকাণ্ডেরই আলোচনা বিধিবদ্ধ হয়েছে।

ষড় দর্শন

একই যুগে আমরা ভারতীয় দর্শনের উন্মেষ ও বিকাশ দেখতে পাই। বেদের ব্রাহ্মণ ভাগে যখন কর্মকাণ্ডের প্রতিষ্ঠা হচ্ছিল, সেই সময়েই আরণ্যক ও উপনিষদে প্রতিষ্ঠা হয়েছিল জ্ঞানকাণ্ডের। এর পরবর্তী যুগেও আমরা একই ব্যাপার দেখি। কল্পসূত্রে কর্মকাণ্ডের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে দর্শন শাস্ত্রে জ্ঞানকাণ্ডেরও সমধিক প্রতিষ্ঠা দেখতে পাওয়া যায়। ষড় বেদাঙ্গের মতো দর্শনের সংখ্যাও ছয়। এই ষড়দর্শন আজও বিশ্বে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে। এই ষড় দর্শন হল কপিলের সাংখ্য দর্শন, কণাদের বৈশেষিক দর্শন, গৌতমের ন্যায় দর্শন, পতঞ্জলির পতঞ্জল বা যোগ শাস্ত্র, জৈমিনীর পূর্ব মীমাংসা এবং বাদরায়ণ বা বেদব্যাসের উত্তর মীমাংসা বা বেদান্ত দর্শন। এ ছাড়াও চার্বাকের দর্শন শাস্ত্র আছে, তা ষড়দর্শনের অন্তর্ভুক্ত হয় নি। জৈন ও বৌদ্ধ দর্শনও ভারতীয় দর্শন।

দুঃখবাদের উপরে দর্শনের ভিত্তি এবং তার লক্ষ্য হল সুখের অন্বেষণ। ঋষিরা এই পৃথিবীকে দুঃখের স্থান বলে মনে করেছেন। সংসারে যে সুখ, তা ক্ষণস্থায়ী। এই সুখই দুঃখের কারণ ও দুঃখকে বৃদ্ধি করে। অথচ এই পৃথিবীর মানুষ সুখের সন্ধান করছে সারাক্ষণ, তার লক্ষ্য হল চিরস্থায়ী সুখ ও শান্তি লাভ। সকল দর্শনই এই পথের সন্ধান দেবার চেষ্টা করেছে।

ষড়দর্শনকে স্থূলভাবে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। সাংখ্য ও পূর্ব মীমাংসা এক শ্রেণীর, ন্যায় ও বৈশেষিক দ্বিতীয় শ্রেণীর এবং পাতঞ্জল ও বেদান্ত অন্য এক শ্রেণীর। এই শ্রেণী বিভাগ কেন হয়েছে, খুব সংক্ষেপে তার কারণ হল এই যে সাংখ্য ও মীমাংসা দর্শনে প্রকারান্তরে ঈশ্বরের

অস্তিত্ব অস্বীকার করা হয়েছে, ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার না করলেও বলা হয়েছে যে মানুষের সুখ দুঃখের সঙ্গে ঈশ্বরের অস্তিত্বের কোন সম্পর্ক নেই এবং পতঞ্জলির যোগ শাস্ত্র ও বেদব্যাসের বেদান্ত দর্শনে ঈশ্বরেব অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়েছে। যোগ শাস্ত্রে ঈশ্বরের সান্নিধ্যের উপায় নির্দেশ কবা হয়েছে, কিন্তু তা হয়তো মুখ্য উপায় নয়। শুধু বেদান্তে স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে যে ঈশ্বর বা ব্রহ্মই সত্য, আর সব মিথ্যা। উপনিষদেব মত বেদান্ত দর্শনেই মেনে নিয়ে বলা হয়েছে যে পরমাত্মার সঙ্গে আত্মার মিলন হলেই সকল দুঃখের অবসান হয়।

বেদে ঈশ্বর সকল সৃষ্টির মূলে প্রতিষ্ঠিত। উপনিষদে তিনিই পরমাত্মা, জীবাত্মা তাঁব অংশ। তিনিই সত্য, জগৎ মিথ্যা। জীবাত্মা পরামাত্মায় লীন হলেই জীবের মুক্তি। এরই নাম স্বরূপ তত্ত্ব। দর্শনে যুক্তি তর্ক দিয়ে এই তত্ত্ব নির্ণয়েব চেষ্টা। কিসে মানুষেব দুঃখ দূব হবে, কেমন করে মুক্তি হবে তার, যড় দর্শনে ঋষিরা তারই সূক্ষ্ম আলোচনা করে এক একটি মতের প্রতিষ্ঠা করেছেন।

ঋগ্বেদে আমবা মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিদেব নাম পাই। তাঁদেব জীবন ও তপস্যার কথাও আমাদের কিছু কিছু জানা আছে। কিন্তু ঈশ্বর সম্বন্ধে তাঁদের কোন মতামত ছিল না বলেই তাঁদেব সম্বন্ধে কোন আলোচনার প্রয়োজন নেই। উপনিষদে আমরা রচয়িতার নাম পাই নে, পাই কয়েকজন ঋষি ও তাঁদের সাধনার পবিচয়। এই ঋষিদের সম্বন্ধে আলোচনাও অপ্রাসঙ্গিক হবে বলে মনে হয়। কিন্তু দর্শন শাস্ত্রের আলোচনায় যে দার্শনিক ঋষিদের জীবন ও সাধনা সম্বন্ধে আমরা কিছু জানি, তার উল্লেখ না করলে অন্যায় হবে। তাই পরবর্তী পরিচ্ছেদগুলিতে আমরা ঋষিদের দার্শনিক মতবাদের সঙ্গে তাঁদের জীবন ও সাধনা সম্বন্ধে যতটুকু জানা যায়, তার আলোচনাও করব।

কপিল ও সাংখ্য দর্শন

গীতায় কৃষ্ণ বলেন, গন্ধর্বদের মধ্যে যেমন চিত্ররথ শ্রেষ্ঠ, তেমনি সিদ্ধ

ঋষিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কপিল।—

গন্ধর্বাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধাণাং কপিলো মুনিঃ।

—গীতা ১০।২৬

কপিল নামের উল্লেখ, আমরা প্রথম দেখি শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে, প্রসূত কপিল ঋষিকে যিনি সবার আগে জ্ঞান দিয়ে পোষণ করেন, ইত্যাদি।—

ঋষিং প্রসূতং কপিলং যস্তমগ্রে জ্ঞানৈর্বিভর্তি। —শ্বেতাশ্বতর ৫।২

শ্রীমদ্ভাগত এই কপিলের উপরে দেবত্ব আরোপ করেছেন, বলেছেন, বিষ্ণুর পঞ্চম অবতার হলেন কপিল। তিনি প্রজাপতি ঋষি কর্দমের পুত্র। মনুর কন্যা দেবহুতি তাঁর মা। তাঁর জন্ম সময়ের বর্ণনা আছে এই গ্রন্থে। আকাশে বর্ষণমুখর মেঘ থেকে বাদ্য শোনা যাচ্ছিল, অপ্সরা ও গন্ধর্বরা নৃত্য গীত করছিল, পাখিরা পুষ্পবৃষ্টি করেছিল। সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা নিজে কর্দমের আশ্রমে এসে বালকের কপিল নাম দিয়ে বলেছিলেন যে বিশ্বে সাংখ্য শাস্ত্র প্রচারের জন্য ইনি জন্মগ্রহণ করেছেন।

এই সব পুরাণ অনেক পরবর্তী যুগের রচনা। বিদেশী পণ্ডিত উইলসনের মতে শ্রীমদ্ভাগবত দ্বাদশ শতাব্দীর রচনা। পুরাণে কপিলমুনির কাহিনী সর্বজনবিদিত। কপিলের আশ্রম ছিল পাতালে। একান্তে জনশূন্য স্থানে শান্তিতে তপস্যার জন্য তিনি পাতালে থাকতেন। কিন্তু সেখানেও তাঁর তপস্যার বিঘ্ন ঘটে। সগর রাজা অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। রাক্ষসের বেশে ইন্দ্র সমুদ্রতীর থেকে সেই যজ্ঞের অশ্ব চুরি করে পাতালে কপিলের আশ্রমে তা বেঁধে রাখেন। সগর রাজার ষাট হাজার পুত্র এই অশ্বের খোঁজে সমুদ্র খুঁড়ে পাতালে এসে দেখল যে সেই ঘোড়া কপিলের আশ্রমে বাঁধা আছে। সগরের পুত্ররা কপিল মুনিকেই চোর ভেবে তাঁকে আক্রমণ করতে উদ্যত হল, কিন্তু ঋষির রোষাগ্নিতে ভস্ম হয়ে গেল। এর পরে সগর তাঁর পৌত্র অংশুমানকে ঘোড়ার খোঁজে পাঠালেন। অংশুমান পাতালে এসে কপিলকে সন্তুষ্ট করে যজ্ঞের অশ্ব ফিরে পেল। কপিল আশীর্বাদ করলেন যে তার পৌত্র ভগীরথ স্বর্গ থেকে গঙ্গাকে এনে তার পিতৃপুরুষকে উদ্ধার করতে পারবে।

পণ্ডিতরা বললেন, পৌরাণিক কপিল সাংখ্য দর্শন প্রণেতা কপিল নন। কিন্তু তা না বললেও চলে। পুরাণের অতিরঞ্জন বাদ দিলে কপিলকে চিনতে আমাদের অসুবিধা হয় না। উপনিষদে যে কপিলের উল্লেখ আছে, তিনিই সাংখ্য দর্শন প্রণেতা। শান্তিতে তপস্যার জন্য তিনি পাতালে আশ্রম স্থাপন করেছিলেন। এই পাতাল সমুদ্রের নিচে নয়, সমুদ্রের তীরে। পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণে বর্তমান গঙ্গাসাগরে ছিল তাঁর আশ্রম। সেখানে তপস্যা করে তিনি যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন, তারই নাম সাংখ্য। তিনি তাঁর নবলব্ধ জ্ঞানের কথা পিতা কর্দম ও মাতা দেবাহুতিকেও বলেছিলেন। সগর রাজার অশ্বমেধ যজ্ঞের কাহিনী পুরাণেই থাক। তার সঙ্গে দার্শনিক কপিলের সম্পর্ক আছে কি নেই দরকার হলে পণ্ডিতরা তাব বিচার করবেন। আমরা মনে করি যে কপিল একজনই ছিলেন। কর্দমের পুত্র কপিলই পাতালে তপস্যা করে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন, তারই নাম সাংখ্য দর্শন।

সাংখ্য শব্দের অর্থ সম্যক জ্ঞান, বা যে জ্ঞানের দ্বারা বস্তুতত্ত্ব সম্যক্ রূপে জানা যায় তাকেই সাংখ্য বলে। এই শাস্ত্রে পদার্থের সংখ্যা সব মিলিয়ে পঁচিশ। এই সব থেকেই আত্মতত্ত্ব প্রকাশিত হয়েছে। সাংখ্য দর্শনের ভাষ্যকার বিজ্ঞান ভিক্ষু বলেছেন যে যাতে সংখ্যা প্রকৃতি ও চব্বিশ তত্ত্ব অভিহিত হয়েছে তাকে সাংখ্য বলে। সম্যক্ বিবেক দিয়ে আত্মকথনের নাম সংখ্যা। তাই যাতে বিবেক দিয়ে আত্মতত্ত্ব জানা যায় তাকেই সাংখ্য বলে। সবল কথায় যে মতে পঁচিশটি তত্ত্বের জ্ঞান লাভ হলে মুক্তি হয় কপিল তারই সংখ্যা গণনা করেছেন বলে তাঁর দর্শনের নাম সাংখ্য।

জীবের দুঃখমোচনের জন্য কপিল এই দর্শন শাস্ত্রের উপদেশ দিয়েছিলেন। তাঁর মূল উপদেশ খুবই সংক্ষিপ্ত তার নাম তত্ত্ব সমাস। তিনি আসুরি মুনিকে এই উপদেশ দিয়েছিলেন, আসুরি দিয়েছিলেন পঞ্চশিখকে। পঞ্চশিখ নানা ভাবে এই জ্ঞান প্রচার করেন। তাঁরই শিষ্য পরম্পরায় এই দর্শন শাস্ত্রের প্রচার হয়।

সমস্ত দার্শনিকের মতো কপিল মনে করেন যে সংসার দুঃখময়, এই দুঃখ

দূর করতে যে পরম পুরুষার্থের প্রয়োজন তা হলো জ্ঞান। জ্ঞান লাভেই দুঃখ দূর হয়, মুক্তি হয় মানুষের। তাই কপিলের প্রথম সূত্র, ত্রিবিধ দুঃখ-নিবৃত্তিই পুরুষার্থ।—

অথ ত্রিবিধ দুঃখাত্যন্ত নিবৃত্তিরত্যন্তপুরুষার্থঃ।

এই ত্রিবিধ দুঃখ হলো আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক। রোগ ভোগ শারীরিক ক্লেশ ও শোক ভয় প্রভৃতি মানসিক দুঃখকে আধ্যাত্মিক দুঃখ বলে। খরা বন্যা দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগকে বলে আধিদৈবিক দুঃখ এবং আধিভৌতিক দুঃখের উৎপত্তি পশু পাখি মানুষ উদ্ভিদ প্রভৃতি প্রাণীজগৎ থেকে। জ্ঞানে এই ত্রিবিধ দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয়।—

জ্ঞানান্মুক্তি।

দ্বিতীয় সূত্রে কপিল বলেছেন যে শুধু দুঃখ নিবৃত্তি পুরুযার্থ নয়, পুরুযার্থ হল দুঃখোৎপত্তি নিবৃত্তি।—

ন দৃষ্টাৎ তৎসিদ্ধির্নিবৃত্তেঽপ্যনুবৃত্তিদর্শনাৎ।

দুঃখের শেষ নেই, দুঃখ জীবনে ফিরে ফিরে আসে। তাই স্থূল দুঃখকে লৌকিক উপায়ে নিবৃত্তি করলেও সূক্ষ্ম দুঃখের উৎপত্তি হয়। দুঃখকে উন্মূল করতে হলে জ্ঞানই একমাত্র উপায়।

কপিলের মত পুরুষ শব্দটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। আমি সুখ দুঃখ ভোগ করি, কিন্তু এই আমিকে দেখতে পাই না। কপিল এই আমিকেই পুরুষ বলেছেন। মতান্তরে আমিই আত্মা। এই পুরুষ বা আত্মা ছাড়া আর সব কিছুকেই কপিল প্রকৃতি বলেছেন। প্রকৃতির পরিবর্তনকে বিকৃতি বা বিকার বলা যায়। প্রকৃতির সংখ্যা আট এবং বিকারের সংখ্যা ষোল। অব্যক্ত মূল প্রকৃতি যাকে অন্তঃকরণ বা মহত্তত্ত্ব বলা হয়, তার সঙ্গে বুদ্ধি অহংকার ও রূপ রস শব্দ গন্ধ ও স্পর্শ এই পঞ্চতন্মাত্র নিয়ে আট প্রকৃতি। ষোলটি বিকার হল চোখ কান নাক জিহ্বা ও ত্বক এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়, বাক্ পাণি পাদ পায়ু ও উপস্থ এই পাঁচ কর্মেন্দ্রিয় ও মন এই এগারটি ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ ও ব্যোম্ এই পাঁচ মহাভূতের সংমিশ্রণ। এই চব্বিশটি পদার্থের সঙ্গে পুরুষকে যোগ করে পদার্থের সংখ্যা

পাঁচিশ। এই সব পদার্থের আদিতে প্রকৃতি ও অন্ত্যে পুরুষ। এরাই নিত্য, আর এদের মধ্যবর্তী সবকিছুই অনিত্য।—

প্রকৃতি পুরুষয়োরণ্যৎ সর্বমনিত্যম্। ৫।১২

কপিল মনে করেন যে প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগই সৃষ্টির মূলে, প্রকৃতি থেকেই সব কিছুর সৃষ্টি হচ্ছে। এর জন্য কোনো সৃষ্টিকর্তা বা ঈশ্বরের প্রয়োজন নেই। জগতে এমন কিছু নেই যা এই প্রকৃতি থেকে উৎপন্ন হয় নি। মূল বা প্রকৃতির মূল নেই, তাই মূল বা প্রকৃতি মূলশূন্য। কাজেই এই মূলশূন্য প্রকৃতিই জগতের উপাদান হতে পারে।—

মূলে মূলাভাবাদমূলং মূলম্। ১।৬৯

কপিল বেদের প্রাধান্য মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন নি। তিনি সব জীবের আদিবীজ এক পুরুষকে স্বীকার করেছেন। বেদেই আছে যে পুরুষ থেকে জগৎ উৎপন্ন হল, আত্মা থেকে নয়। প্রকৃতিতেই পুরুষের অধ্যায় সিদ্ধ হয়েছে।—

প্রকৃতিবাস্তবে চ পুরুষস্যাধ্যাসসিদ্ধিঃ।

কপিল বলেছেন যে ঈশ্বর অসিদ্ধ।—

ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ। ১।৯২

ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করলে ঈশ্বরকে জগতের সৃষ্টিকর্তা বলতে হবে। তাহলেই বিষম সৃষ্টির জন্য ঈশ্বরকে মানুষের মতো পক্ষপাতী মনে হবে। সকলের কাছেই তাঁর সমান হওয়া উচিত, কাউকে সুখী ও কাউকে দুঃখী করা তাঁর উচিত নয়। তিনি মুক্ত হলে ক্রিয়ারহিত এবং বদ্ধ হলে তিনি অসীম শক্তির অধিকারী নন। রাগ বা উৎকট ইচ্ছায় তিনি সৃষ্টি করেছেন ভাবলে তাঁকে মানুষের মতো বিষয়ী বলতে হয়। আর সত্তা আছে বলে তাঁকে ঈশ্বর বললে সব পদার্থকেই ঈশ্বর বলতে হয়। তাই কপিল বললেন, প্রমাণের অভাবেই ঈশ্বর অসিদ্ধ।—

প্রমাণাভাবান্ন তৎসিদ্ধিঃ। ৫।১০

প্রত্যক্ষ অনুমান ও শব্দ এই তিন প্রমাণের কোনো প্রমাণ দিয়েই ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না। কপিলকে তাই নিরীশ্বরবাদী বলা হয়।

কিন্তু অনেকে এ কথা মানতে রাজী নন। তাঁরা বলেন যে কপিল যে ঈশ্বর মানতেন তার প্রমাণ হল তাঁরই কথা, ঈশ্বর অসিদ্ধ, প্রমাণ নেই বলেই *তিনি অসিদ্ধ। তার মানে এই নয় যে ঈশ্বর নেই। ঈশ্বর আছেন, এ কথা* প্রমাণ করা যায় না। তিনি তো বেদ মানতেন!

কপিলকে যাঁরা নিরীশ্বরবাদী মনে করেন, তাঁরা বলেন যে সমাজের ভয়েই তিনি বেদ মানতেন। তাই তিনি বেদ নিয়ে কোনো বিতর্ক করেননি। তাঁর মতে বেদ পৌরুষেয় বা অপৌরুষেয় নয়, বেদ উদ্ভূত হয়েছে প্রকৃতি থেকে। তাঁর মতে পুরুষ বা আত্মাও এক নয়, শরীর ভেদে অনেক পুরুষ ও অনেক আত্মা। যদি সব শরীরের এক আত্মা হত, তবে একের সুখ দুঃখ জন্ম মৃত্যুতে অন্যেরও সুখ দুঃখ জন্ম মৃত্যু হত। উপনিষদের পরমাত্মায় তিনি বিশ্বাসী নন।

কপিল মনে করেন যে অজ্ঞানের ফল বন্ধন এবং মুক্তি জ্ঞানের ফল; অন্তঃকরণ যখন প্রকৃতিতে লীন হবে, তখনই পুরুষের মুক্তি। ভোগাদি অবশিষ্ট না থাকলেই কৈবল্য বা নির্বাণ মুক্তি। আত্যন্তিক দুঃখেব নিবৃত্তি হবে তখনই।

অনেকে অনুমান কবেন যে গৌতম বুদ্ধ তাঁর নির্বাণ মুক্তির তত্ত্ব কপিলেব এই মতবাদ থেকেই পেয়েছেন এবং তান্ত্রিকবা গ্রহণ করেছেন তাঁব প্রকৃতি ও পুরুষ তত্ত্ব।

ভারতের প্রথম দার্শনিক কপিল নির্জনে সমুদ্রতীবে দীর্ঘকাল তপস্যা করেও ঈশ্বরের অস্তিত্বের কোনো বিশ্বস্ত প্রমাণ পান নি।

কণাদ ও বৈশেষিক দর্শন

অনেকের ধারণা যে বৈশেষিক দর্শন সাংখ্য দর্শনের পূর্বে প্রণীত হয় এবং বৈশেষিক দর্শনই ভারতের দর্শন চিন্তার প্রথম ফল। কিন্তু যুক্তি প্রমাণে এ কথা সত্য বলে মনে হয় না। এই দর্শনের প্রবক্তা কণাদের জন্ম কশ্যপের বংশে। তাই তিনি কাশ্যপ নামেও পরিচিত। তাঁর আসল নাম ছিল উলূক। জীবিকার জন্য তাঁর কণাদ নাম হয়েছিল। কৃষকেরা শস্য কেটে

নিয়ে যাবার পরে ক্ষেতে যে শস্য পড়ে থাকত, উলূক তাই সংগ্রহ করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। অনেকেই তাঁকে 'কণাভক্ষ' বলে কটাক্ষ করতেন। কিন্তু ব্রাহ্মণের পক্ষে এই জীবিকা নিন্দনীয় ছিল না। বরং তপস্বীদেব প্রশংসার বিষয় ছিল। কণা মাত্র আহার করে কঠোর তপস্যায় এই দর্শন লাভ করেছিলেন বলে তিনি কণাদ নামে পরিচিত হন। কপিল ও কশ্যপ ছিলেন সমসাময়িক ঋষি। তু'জনেই সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার পৌত্র। কাজেই কশ্যপের বংশে যে কণাদের জন্ম, তিনি নিশ্চয়ই কপিলের কনিষ্ঠ ছিলেন। এই যুক্তিতেই আমরা বৈশেষিক দর্শনকে সাংখ্য দর্শনের পরবর্তী ভাবনার ফল বলতে পারি।

কণাদ বিশেষ নামের একটি অতিরিক্ত পদার্থের প্রাধান্য স্বীকার করেছের্ন বলে তাঁর দর্শনের নাম হয়েছে বৈশেষিক। পরমাণু এই দর্শনের বিশেষ পদার্থ। বৈশেষিক সূত্রে আছে—

অন্যত্রান্ত্যেভ্যো বিশেষেভ্যঃ। ২।২।৬

যা অন্ত্য তাই নিত্য, নিত্য পদার্থেই এই অন্ত্যের অবস্থান। প্রতিটি পবমাণু এই অন্ত্য বিশিষ্ট। এই অন্ত্যই বিশেষ পদার্থ। প্রতি পরমাণুতে বিশেষ আছে। তাই এই বিশ্বে এক অনন্ত সৃষ্টি বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতা রূপ বিশেষের বিদ্যমানতা অনুভূত হয় এবং এই বিশেষই সৃষ্টি বিভিন্নতা সাধনের মূল কারণ। বিশেষ পদার্থ একটি, তা পবমাণুর বিশেষত্ব। পরমাণুর সমষ্টিতেই পৃথিবীর সৃষ্টি এবং সমান পরমাণু থেকেই সব কিছু উৎপন্ন হচ্ছে। কোন্ পরমাণু থেকে কী উৎপন্ন হবে তা বোঝা যায় না। কিন্তু দেখা যায় যে এক এক পরমাণু থেকে এক এক বকমের দ্রব্য উৎপন্ন হয়।

কণাদ বলেছেন, 'ইহ-সংসার পরমাণু-সংযোগে উৎপন্ন হয়েছে ; এবং কোনো অব্যক্ত কারণে সে সংযোগ সাধিত হয়। পৃথিবীর সকল পদার্থই সূক্ষ্মানু-সূক্ষ্ম পরমাণুর সমষ্টিমাত্র। বিভাগ করতে করতে সকল পদার্থই এক সূক্ষ্ম-তম অবস্থায় উপনীত হয়। সে অবস্থায় আর তার বিভাগ করা যায় না। সেই অবিভাজ্য সূক্ষ্মতম পদার্থই নিত্য পরমাণু ; তারই সংযোগে স্থূল

সংসারের উৎপত্তি হয়।

কণাদের মতে 'ভোগাভোগ এবং দেহান্তর গ্রহণ সমস্তই অদৃষ্ট সাপেক্ষ। কর্মানুষ্ঠানের জন্য ও কর্মের শুভাশুভ ফল ভোগের জন্য শরীরের প্রয়োজন হয়; তাই অদৃষ্ট। তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা সেই অদৃষ্টের নাশ হয় এবং তাতেই জীবের মোক্ষ লাভ হয়ে থাকে।'

কণাদ তাঁর গ্রন্থের আরম্ভেই বলেছেন, এই বারে ধর্মের ব্যাখ্যা করব।—

অথাতো ধর্মং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

ধর্ম হল তাই যার দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় এবং যা আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তির বা মোক্ষলাভের উপায়।—

যতোঽভ্যুদয়নিঃ শ্রেয়স সিদ্ধিঃ স ধর্ম।

কপিল সাংখ্য দর্শনে ঠিক এই কথাই বলেছেন। কপিলের মতো তিনিও ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন নি বলে অনেকেই তাঁকে নাস্তিক বলে। ঈশ্বর শব্দটি তিনি তাঁর গ্রন্থের কোনো স্থানে ব্যবহার করেন নি। অন্য কোনো শব্দেও তিনি কোনো পুরুষকে সৃষ্টিকর্তা বা জগতের কারণ বলেন নি।

কিন্তু সবাই তাঁকে নিরীশ্বরবাদী মনে করেন না। তাঁরা বলেন যে কণাদ গৌণ ভাবে ঈশ্বরকে স্বীকার করতেন। তিনি বলেছেন, বৃক্ষে যে রস সঞ্চার হয়, অদৃষ্ট তার কারণ।—

বৃক্ষাভিসর্পণমিত্যদৃষ্টকারিতম্। ৫।২।৭

এ ছাড়াও তিনি যে তৎ শব্দটির ব্যবহার করেছেন, তাতে ঈশ্বরকেই বোঝানো হয়েছে। কণাদ বলেছেন, তদ্বচনাদাম্নায়স্য প্রামাণ্যম্। তাঁর ভাষ্যকার শঙ্কর মিশ্র তৎ শব্দের এই ব্যবহাব দেখেই বিশ্বাস করেছেন যে কণাদ নিরীশ্বরবাদী নন, গৌণ ভাবে তিনি ঈশ্বরকে মানতেন।

পণ্ডিতরা মনে করেন যে পরমাণুতত্ত্ব বিশ্বে প্রথম প্রচার করেন কণাদ। তাঁরা বলেন যে গ্রীক দার্শনিক ডেমক্রিটস ভারতে এসে সন্ন্যাসীদের কাছে কণাদের পরমাণুবাদ-তত্ত্ব শুনে তা শিক্ষা করে যান। গ্রীসে তিনি এই তত্ত্ব প্রচার করেন খ্রীষ্টের জন্মের চারশো চল্লিশ বৎসর পূর্বে। গৌতম বুদ্ধ তাঁর ধর্মমত এর আগে প্রচার করেছিলেন। কিন্তু কণাদের বৈশেষিক

দর্শনে বৌদ্ধ ধর্মের কোনো উল্লেখ বা আলোচনা নেই। এর থেকেই প্রমাণ হয় যে কণাদ এরও পূর্বে পরমাণু তত্ত্ব প্রচার করেছিলেন।
ডেমক্রিটসের পরে এপিকিউরস এই মত প্রচার করেন। তার পর লুক্রেসিয়া তাঁর কাব্যে যা লিখেছেন। তা কণাদের কথা বলেই মনে হয়।—

Thus the Great World's eternally renewed ;
Thus endless atoms are with power endued,
Successive generations to supply ;
Some creatures flourishing, while others die.
Like racers, each revolving age, we find,
Retires, and leaves the lamp of life behind,
It you suppose that seeds at rest convey,
Motion to bodies, wide from truth you stay
Through the Vast Void as these primordials rove,
By foreign force, or gravity they move.

দীর্ঘকাল পরে শঙ্করাচার্য এই মতের দোষ দেখাতে বলেন যে পরমাণু অবিভাজ্য অদৃষ্ট অবয়বহীন হতে পারে না। পরমাণুর সংযোগেই যখন দৃষ্ট পদার্থের উৎপত্তি তখন নিতান্ত সূক্ষ্ম হলেও তার একটা অবয়ব আছে এবং যার অবয়ব আছে, তা কখনই অবিভাজ্য ও অদৃষ্ট হওয়া সম্ভব নয়। সর্বাত্ম বা একদেশ ভাবে দুই অণুর সংযোগ সম্ভব। সর্বাত্মভাবে সংযোগ ঘটলে তা দৃষ্ট পদার্থ। একদেশ ভাবে ঘটলেও অণুর সাবয়বত্ব প্রতিপন্ন হয়। তাই পরমাণুর অনিত্যত্ব প্রমাণ হয় না।

গৌতম ও ন্যায় দর্শন

মহর্ষি গৌতম ন্যায় দর্শন প্রচার করেন। গৌতম নামে অনেক ঋষি ছিলেন। ছান্দোগ্য উপনিষদে আমরা যে গৌতম নাম পাই, তিনি ছিলেন মহর্ষি জাবালির গুরু। গৌতম ছিলেন ব্রহ্মার মানসপুত্র, তাঁকে সপ্তর্ষির একজনও বলা হয়। রামায়ণে আমরা গৌতম ও অহল্যার উপাখ্যান

পড়েছি। অনেকে মনে করেন যে ন্যায় দর্শন প্রণেতা গৌতমের জন্ম হয়েছিল মিথিলায় ; তাঁর আশ্রম ছিল দ্বারভাঙ্গা থেকে মাইল ছয়েক দূরে সীতামারির পথে। সেখানকার একটি শিলাখণ্ডকে অহল্যার শাপগ্রস্ত দেহ বলা হয়। অনেকে বলেন, গৌতমের আশ্রম ছিল বক্সারে গঙ্গার তীরে। আশ্রম যেখানেই থাক, ন্যায় দর্শনের মূলকেন্দ্র হল মিথিলা। নবদ্বীপের রঘুনাথ শিরোমণি এই শাস্ত্র কণ্ঠস্থ করে নবদ্বীপে এসেছিলেন বলে জনশ্রুতি। সে এ কালেব কথা। গৌতমের ন্যায়দর্শন এখন প্রাচীন ন্যায় নামে পরিচিত। পরবর্তী কালের পণ্ডিতরা নব্য ন্যায় প্রচার করেছেন।
প্রাচীন ন্যায়কে অক্ষপাদ দর্শনও বলা হয়। গৌতমকেই অক্ষপাদ বলা হত। এই নিয়ে একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। বেদব্যাস নাকি গৌতমেব ন্যায় দর্শনেব নিন্দা কবেছিলেন। সে কথা জেনে গৌতম তাঁর মুখ দর্শন করবেন না বলে প্রতিজ্ঞা কবেন। কিন্তু বেদব্যাস তা চান নি। তিনি গৌতমের নিকটে এসে তার রাগ ভাঙাবাব চেষ্টা কবেন। কিন্তু গৌতম তাঁর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে এই ভয়ে বেদব্যাসেব মুখের দিকে না চেয়েই কথা বলেন। কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে গৌতমেব পায়ে যে দৃষ্টিশক্তি প্রকাশিত হয় এবং তাতে তিনি বেদব্যাসকে দেখতে পান। 'অক্ষং দর্শন শক্তিঃ পাদে প্রকাশিত' হয় বলে গৌতমের অক্ষপাদ নাম হয়। কিন্তু পণ্ডিতরা বলেন যে তা নয়। 'অক্ষে চক্ষুসি জ্ঞানে বা গমনং যস্য' মানে যিনি অক্ষ বা জ্ঞানের জন্য বিখ্যাত, তিনিই অক্ষপাদ।
প্রমাণ দিয়ে পদার্থ নিরূপণ বা অপরকে বোঝাবাব জন্য প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন এই পাঁচ অবয়বেব অবতাবণাকে ন্যায় বলে। ন্যায়কে মনন শাস্ত্রও বলা যেতে পাবে। এব তিনটি অংশ —তর্কাংশ,ন্যায়াংশ ও দর্শনাংশ। দর্শনাংশেই দেহ ও আত্মার সম্বন্ধ আলোচিত হয়েছে।
অন্যান্য দর্শনের মতো ন্যায়েরও মুখ্য উদ্দেশ্য দুঃখ নিবৃত্তি। দুঃখেব কারণ কী এবং কী ভাবে দুঃখ নিবৃত্তি হতে পারে, ন্যায় দর্শনে তারই বিষয় আলোচিত হয়েছে। গৌতম বলেছেন, দুঃখ জন্ম-প্রবৃত্তি দোষ-মিথ্যাজ্ঞানা-নামুত্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরাপায়াদপবর্গঃ। নিঃশ্রেয়স বা ত্রিবিধ দুঃখের

নিবৃত্তিতেই মানুষের মুক্তি। মুক্তি লাভ করতে হলে ত্রিবিধ দুঃখের নিবারণ করতে হয়। জন্মের নিবারণেই দুঃখের নিবারণ, আবার প্রবৃত্তির বিনাশ না হলে জন্মের নিবারণ হয় না। প্রবৃত্তির বিনাশের জন্য রাগ দ্বেষ ও মোহ এই ত্রিবিধ দোষ নিবারণ করতে হয়। মিথ্যা জ্ঞানের নিবৃত্তি হলেই দোষের বিনাশ হবে এবং তত্ত্বজ্ঞান লাভ হবে। তত্ত্বজ্ঞানেই মুক্তি।

তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য প্রমাণ প্রভৃতি ষোলটি পদার্থের জ্ঞান হওয়া দরকার। ন্যায় দর্শনে এই সব পদার্থের লক্ষণ বিচার ও তাদের পরীক্ষার প্রণালী বলা হয়েছে। প্রমাণ শব্দটির অর্থই যথার্থ জ্ঞান লাভের উপায়।

এই দর্শনে বেদ ঈশ্বর আত্মা অদৃষ্ট ও জন্মান্তরের বিষয়ে সূক্ষ্ম আলোচনা আছে। গৌতম ঈশ্বরকে অস্বীকার করেন নি, অস্বীকার করেছেন সৃষ্টি বিষয়ে ঈশ্বরের কর্তৃত্ব। তিনি বলেছেন যে সৃষ্টির ব্যাপারে অন্য কোনো কারণ আছে। মানুষের সব কাজ সফল হয় না দেখে মনে হয় যে ঈশ্বরই জগতের কারণ; কিন্তু ফল নিষ্পত্তি যদি ঈশ্বরের অধীন হত, তাহলে পুরুষ-কর্মের প্রয়োজন হত না। কাজেই ঈশ্বর ভিন্ন সৃষ্টির অন্য কোনো কারণ আছে যাকে অদৃষ্ট বা কর্মফল বলা যেতে পারে।

গৌতম আত্মাকে অনাদি বলে মেনে নিয়েছেন। শিশুরা পূর্বজন্মের স্মৃতি নিয়ে জন্মায়। এই স্মৃতিই সর্বমূলাধার। আমরা যা ভাবি যা করি তা পূর্ব-জন্মের স্মৃতি থেকেই উৎপন্ন।—

পূর্বকৃতফলানুবন্ধাত্তদুৎপত্তিঃ।

শিশু যেমন তার শৈশবের স্মৃতি ধীরে ধীরে ভুলে যায়, মানুষও তেমনি পূর্বজন্মের স্মৃতি সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়। পুরুষের এই অদৃষ্ট বা কর্মফলকে গৌতম ঈশ্বরাধীন বলেছেন।—

ঈশ্বরঃ কারণং পুরুষকর্মফলাদর্শনাৎ।

নব্য ন্যায় মতে এ জীবনের সুখ দুঃখ পূর্বজন্মের কর্মফল বা অদৃষ্ট। কিন্তু আত্মা শরীর থেকে ভিন্ন। এই দুইকে এক ভাবলেই অহং জ্ঞান জন্মে। মুক্তির জন্য এই দুইকে ভিন্ন ভাবতে হবে।

গৌতম বেদে মিথ্যা ব্যাঘাত ও পুনরুক্তির শেষ দেখিয়ে নিজেই তা

যুক্তি তর্কে খণ্ডন করেছেন। কণাদের পরমাণুবাদ তিনি প্রকারান্তরে স্বীকার করেছেন। তাঁর মতে মুক্তি মূর্ছার মতো এক অবস্থা।

ন্যায় দর্শনের বৈশিষ্ট্য হল যুক্তিবাদ। এই যুক্তিবাদ পাঁচ অবয়বে বিভক্ত। অবয়ব মানে বিচারের অঙ্গ। এগুলির নাম প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন। প্রতিজ্ঞায় একটি প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। হেতুতে তার কারণ নির্ণয়, তারপর উদাহরণ দিয়ে বোঝানো হয় সেই হেতুর কারণ। উপনয় মানে হেতু নির্ধারিত হবার পরে কার্যস্থলে তার প্রয়োগ। তাব পরেই কোনো প্রস্তাবের নিগমন বা সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব। তর্কের মীমাংসায় এই ন্যায় দর্শন খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল।

শোনা যায় যে আলেকজাণ্ডার শর্মণাচার্য নামে এক নৈয়ায়িক ব্রাহ্মণকে গ্রীসে নিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁরই আদেশে ন্যায় দর্শনের প্রচার হয় গ্রীসে। তার পরে শর্মণাচার্য নাকি আত্মহত্যা করেছিলেন। বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিত অ্যারিস্টটল গ্রীসেই ন্যায় দর্শনের তত্ত্ব জেনেছিলেন।

পতঞ্জলি ও যোগ দর্শন

পতঞ্জলি ঋষির কাল ও পরিচয় বেশ অস্পষ্ট। একটি কিংবদন্তী প্রচলিত আছে যে তিনি সর্পাকারে পাণিনি মুনির অঞ্জলিতে পতিত হয়েছিলেন বলে তাঁর নাম হয়েছিল পতঞ্জলি। তাঁর জন্ম বিষয়ে শুধু এইটুকুই জানা যায়। এর থেকে অনেকে মনে করেন যে অনন্তনাগ স্বয়ং পৃথিবীতে যোগ-শাস্ত্র প্রচারের জন্য জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পণ্ডিতদের অনেকে পতঞ্জলিকে পাণিনির পূর্বেকার মানুষ মনে করেন। কিন্তু পাণিনিতে তার নাম ও দর্শনের উল্লেখ না দেখে সকলে এ কথা মানেন না। পতঞ্জলি নামে পাণিনির একজন ভাষ্যকার আছেন। তা ছাড়াও আরও কয়েকজনের এই নাম পাওয়া যায়। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের মতে পতঞ্জলি বেদব্যাস ও তাঁর শিষ্য জৈমিনির পরবর্তী কালের ঋষি। অর্থাৎ জৈমিনির মীমাংসা দর্শন ও বেদব্যাসের বেদান্তের পরে পতঞ্জলি তাঁর পাতঞ্জল দর্শন বা যোগশাস্ত্র প্রচার করেন।

পতঞ্জলি তাঁর দর্শনে কপিলের সাংখ্য-মতেরই অনুসরণ করেছেন। কপিলের মতো তিনিও পদার্থের সংখ্যা পঁচিশ বলে মেনে নিয়েছেন; কিন্তু তাঁর নিরীশ্বরবাদ মানেন নি। পতঞ্জলি যুক্তি দিয়ে ঈশ্বর সত্তা প্রতিপাদন করেছেন। এই জন্য পাতঞ্জল দর্শনকে সাংখ্য প্রবচন বা সেশ্বর সাংখ্যও বলা হয়ে থাকে।

পতঞ্জলিও সংসারকে দুঃখময় বলেছেন। তিনি বলেছেন যে দুঃখ নিবৃত্তির উপায় হল যোগ। যোগের দ্বারাই প্রকৃতি-পুরুষের ভেদ জ্ঞান লাভ হয়। যোগ ছাড়া তত্ত্বজ্ঞান লাভের উপায় নেই, কৈবল্য বা মোক্ষ লাভও সম্ভব নয়। এই জন্য পাতঞ্জল দর্শনকে যোগশাস্ত্রও বলা হয়।

এই দর্শন যোগপাদ, সাধনপাদ, বিভূতিপাদ ও কৈবল্যপাদ—এই চার পাদে বিভক্ত। যোগপাদে যোগ সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য, ঈশ্বরের স্বরূপ ও প্রমাণ ও তাঁর উপাসনার বিষয় লিখিত হয়েছে। মনেব বৃত্তিকে রুদ্ধ করার নাম যোগ।—

যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ।

ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরুদ্ধ—চিত্তের এই পাঁচ অবস্থা। আর প্রমাণ, বিপর্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি—এই পাঁচটি চিত্তের বৃত্তি। যোগ-শাস্ত্রে এই চিত্ত বৃত্তি নিরোধের উপায় নির্দেশ করা হয়েছে। চিত্তের বিক্ষুব্ধ অবস্থায় যোগের আরম্ভ, নিরুদ্ধ চিত্তেই পূর্ণ যোগ। অভ্যাস ও বৈরাগ্যে চিত্তবৃত্তি নিরোধ হয়।—

অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাস তন্নিরোধঃ।

এরই নাম সমাধি। সমাধি অনেক প্রকার। সমাধিতেই পুরুষ কৈবল্য লাভ করে। পতঞ্জলির মতে সুখ দুঃখ আত্মার ধর্ম নয়, চিত্তের ধর্ম। আত্মায় তার প্রতিবিম্ব পড়ে। তাই চিত্তকে নিরুদ্ধ করতে পারলেই আত্মার কৈবল্য বা মোক্ষ লাভ সম্ভব।

পতঞ্জলি বলেছেন, কপিলের পঁচিশ পদার্থের অতিরিক্ত এক পুরুষ আছেন, যাঁকে ক্লেশ কর্ম বিপাক ও আশয় স্পর্শ করতে পারে না। ত্রিকালের অতীত ও আত্মা থেকে স্বতন্ত্র তিনিই ঈশ্বর।—

ক্লেশকর্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ। ১।২৪

তাঁর নিরতিশয় জ্ঞান থাকায় তিনি সর্বজ্ঞ। তিনি পূর্বের সৃষ্টিকর্তাদেরও গুরু। কালের দ্বারা তিনি অবচ্ছিন্ন নন।—

তত্র নিরতিশয়ং সর্বজ্ঞত্ব বীজম্। ১।২৫

স পূর্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ। ১।২৬

প্রণব তাঁর বোধক এবং সেই প্রণবের জপ ও তার অর্থ ধ্যান করাই উপাসনা।—

তস্য বাচকঃ প্রণবঃ ।১।২৭

তজ্জপস্তদর্থ ভাবনম্ ।১।২৮

এই উপায়ে চিত্ত শুদ্ধি হলে আত্মজ্ঞান জন্মে এবং সমাধিলাভে কোনো বিঘ্ন থাকে না।—

ততঃ প্রত্যক্‌চেতনাধিগমোঽপ্যন্তরায়াভাবাশ্চ ।১।২৯

পাতঞ্জল দর্শনের দ্বিতীয় সাধনপাদে ক্রিয়াযোগ, বিভূতিপাদে ধ্যান ও সমাধির স্বরূপ ও বিভূতির বিষয় এবং কৈবল্যপাদে সিদ্ধি ও বিজ্ঞানবাদ নিরাকরণ করে সাকারবাদ ও কৈবল্যের কথা বলা হয়েছে।

পাতঞ্জল দর্শনেই আমরা প্রথম ঈশ্বর ও তাঁর উপাসনার কথা জানতে পারি। ঈশ্বরের উপাসনা করতে হলে কায়িক বাচিক ও মানসিক সব ব্যাপারেই নিজেকে ঈশ্বরের অধান বলে ভাবতে হবে। ফলের আশায় বা পার্থিব সুখের লোভে নয়, ঈশ্বরের পায়ে সমস্ত কর্মফল অর্পণ করেই সব কাজ করতে হবে। অকপটে ও পুলকিত অন্তরে তাঁর ধ্যান করতে হবে। ধ্যানেই সিদ্ধি। কিন্তু ঈশ্বর কী, সে সম্বন্ধে একটি সুস্পষ্ট ধারণার দরকার। আগেই বলা হয়েছে যে ক্লেশ কর্ম বিপাক ও আশয় যাঁকে স্পর্শ করতে পারে না, নিখিল সংসারী আত্মা ও মুক্ত আত্মা থেকে যিনি স্বতন্ত্র, তিনিই ঈশ্বর। ঈশ্বর নিত্য, নিরতিশয়, অনাদি ও অনন্ত। তিনি সর্বজ্ঞ। তাঁর মতো সর্বজ্ঞতার অনুমাপক পরিপূর্ণ জ্ঞানের শক্তি অন্য আত্মার নেই। পরমাণু যেমন অল্পতার শেষ এবং বৃহতের শেষ আকাশ, তেমনি জ্ঞানের ক্ষুদ্রতার উদাহরণ জীব ও আতিশয্যের শেষ ঈশ্বর। তিনি সমস্ত

সৃষ্টিকর্তার গুরু বা উপদেষ্টা, তিনি সর্ব কালে একই ভাবে বিদ্যমান। প্রণব মন্ত্রের জপ ও তার অর্থ ধ্যান করেই ঈশ্বরের উপাসনা হয়। এই ধ্যানে চিত্ত যখন নির্মল হয়, কেবল তখনই হৃদয়স্থিত আত্মার সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান জন্মে। তখন আর বিঘ্ন থাকে না, সমাধি লাভ হয় নির্বিঘ্নে।
এই যোগশাস্ত্রের উদ্ভাবন পতঞ্জলির এক অবিস্মরণীয় কীর্তি। যোগাভ্যাস করে যোগীরা যে অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হয়েছেন, সে সম্বন্ধে আমরা অনেক কথা শুনেছি। অনেক মহাপুরুষ তাঁদের জীবনে এই ক্ষমতা প্রদর্শন করে আমাদের ধর্মবিশ্বাসকে দৃঢ় করেছেন!

জৈমিনি ও মীমাংসা দর্শন

জৈমিনি নামে যিনি আমাদের সবচেয়ে বেশি পরিচিত, তিনি হলেন কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাসের এক শিষ্য। বেদব্যাসের নিকট তিনি সামবেদ ও মহাভারত অধ্যয়ন করেছিলেন। তাঁর নামে সামবেদের এক শাখা প্রবর্তিত হয়েছে এবং তিনি জৈমিনি ভারত নামে একখানি গ্রন্থের রচয়িতা। যে ছয় জন ঋষি বজ্রবারক নামে পরিচিত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে জৈমিনিও একজন। এই বজ্রবারক ঋষিদের নাম স্মরণ বা উচ্চারণ করলে বজ্রাহত হ'তে হয় না বলে লোকের ধারণা ছিল। এর থেকে অনুমান করা হয় যে, এঁরা বিদ্যুৎ-বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। জৈমিনি নামে আরও ঋষি থাকলেও মনে হয় যে ইনিই মীমাংসা দর্শনের প্রবর্তক। এই দর্শন জৈমিনি দর্শন বা পূর্ব মীমাংসা নামেও প্রচলিত।
মীমাংসা দর্শন প্রচারের প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল বলে পণ্ডিতরা মনে করেন। দেশে যখন উপনিষদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং বিবিধ দর্শনে জ্ঞানকাণ্ডের প্রভাব বিস্তৃত হয়ে পড়ছিল, তখন জনসাধারণের মধ্যে কর্মকাণ্ড সম্বন্ধে উদাসীনতা লক্ষ্য করা হয়। বেদ বিহিত কর্মকাণ্ড লোপ পেতে চলেছে দেখেই জৈমিনি তাঁর মীমাংসা দর্শন প্রবর্তন ও প্রচার করেন। বেদের কর্মকাণ্ডকে সগৌরবে প্রতিষ্ঠা করাই এই দর্শনের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই দর্শনে ধর্মতত্ত্বের মীমাংসা করা হয়েছে বলেই এর নাম হয়েছে

মীমাংসা দর্শন। একমাত্র ধর্ম মীমাংসাই এই দর্শনের উদ্দেশ্য ও প্রতিপাদ্য বিষয়। জৈমিনি বলেছেন, ধর্মের তত্ত্ব নিরূপণ করতে মীমাংসার প্রয়োজন আছে।—

ধর্মাখ্যং বিষয়ং বক্তুং মীমাংসায়াঃ প্রয়োজনম্।

এই কারণেই শ্রুতি ও স্মৃতির বিরোধ ভঞ্জনের জন্য তিনি মীমাংসা দর্শন প্রচার করেন। তাই প্রথম সূত্রেই তিনি বললেন, ধর্ম-জিজ্ঞাসার জন্যই এই দর্শন।—

অথাতো ধর্ম-জিজ্ঞাসা।

এই দর্শন দ্বাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে ধর্মজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা, ধর্মের লক্ষণ ও প্রমাণ এবং বেদবিহিত ক্রিয়াকর্মকে কেন ধর্ম বলা হয়, তারই আলোচনা আছে। পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে বৈদিক যাগযজ্ঞের বিষয়ে বিচার করেছেন। এই প্রসঙ্গে অন্যান্য বিষয়েরও পর্যালোচনা করেছেন। যাগ-যজ্ঞ হোম ও দান সম্বন্ধে নির্দেশাদি বেদের নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় আছে এবং তা ক্রিয়াকর্মে ব্যবহারের উপযোগী নয়। যাগ-যজ্ঞ বিষয়ক নির্দেশগুলি পূর্বাপর সাজিয়ে দিলে তা যাজ্ঞিকদের উপযোগী হবে এবং কোনো ভুল-ভ্রান্তির সম্ভাবনা থাকবে না, এই উদ্দেশ্যেই জৈমিনি তাঁর মীমাংসা দর্শন প্রচার করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে এর পর থেকেই বৈদিক কর্মকাণ্ডের পদ্ধতি ও শিক্ষা সাধারণের পক্ষে সহজসাধ্য হয়েছে।

জৈমিনি বেদের নিত্যত্ব স্বীকার করেছেন। বেদ অপৌরুষেয়, অতএব অভ্রান্ত। বেদ স্বতঃসিদ্ধ, চিরকাল বিদ্যমান থাকবে। তিনি বলেছেন যে বেদের কর্মকাণ্ডই সব। এর বেশি যা আছে তা মানুষকে কর্মকাণ্ডের প্রতি আকৃষ্ট করবার জন্য। এর জন্য বিধি, নিষেধ, মন্ত্র, নামধেয় ও অর্থবাদ বেদের এই পাঁচটি অঙ্গ আছে। বিধি নিষেধ হলো যা করা উচিত এবং যা করা উচিত নয়। যেমন যজ্ঞ করা উচিত ও দিবানিদ্রা উচিত নয়। যজ্ঞের উৎপত্তি প্রয়োগ বিনিয়োগ অধিকার ভেদে নানা রকমের বিধি আছে। বিধি চতুষ্টয়ে তারই বিধান। নিয়ম ও পরিসংখ্যা দিয়ে এই

বিধির বিচার হয়। যা দিয়ে দেবতাদের আবাহন করা হয় তার নাম মন্ত্র। মন্ত্রের ক্রম ভঙ্গ শব্দের বিপর্যয় ও উচ্চারণের দোষ অভীষ্ট লাভের অন্তরায়। যে উদ্দেশ্যে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা হয়, তারই নাম নামধেয়। আর বিধি নিষেধের নিন্দা প্রশংসার জন্য অর্থবাদ।

জৈমিনি খুব স্পষ্ট করে বলেছেন যে, একমাত্র যজ্ঞই সার, আর সব অবান্তর। কর্মই বেদের সার, এই কর্ম ছাড়া বেদে আর যা পাওয়া যায় তা নিরর্থক।—

আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাৎ আনর্থক্যমতদর্থানং।

কিন্তু খুব আশ্চর্যের কথা যে জৈমিনি দেবতার অস্তিত্ব স্বীকার করেন নি। তিনি বলেছেন, দেবতা কখনও শরীরী হতে পারেন না। শরীর থাকলে একই সময়ে তাঁরা বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করতে পারতেন না এবং তাঁদের স্তাবকরা তাঁদের চোখেব সামনে প্রত্যক্ষ করতে পারত। তাঁর মতে মন্ত্রই দেবতা এবং যজ্ঞাদি কর্মেই মোক্ষ ফল পাওয়া যায়। তবে যজ্ঞের ক্রিয়া পদ্ধতি ও মন্ত্রের উচ্চারণ প্রভৃতি শুদ্ধ না হলে যে ফল লাভে বিঘ্ন হতে পারে, এই কথাই তিনি তাঁর মীমাংসা দর্শনে বলেছেন।

এই দর্শনে ঈশ্বরের নাম নেই বলে শঙ্করাচায মীমাংসা দর্শনকে নাস্তিক্য দর্শন বলেছেন। কিন্তু অন্য ভাষ্যকার তা বলেন নি। তাঁরা মনে করেন যে, জৈমিনির দর্শনে ঈশ্বর শব্দটি না থাকলেও তাঁকে নিরীশ্বরবাদী বলা যায় না। তার কারণ ব্রহ্মাপীতি চেৎ সূত্রে তিনি ব্রহ্মের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। জৈমিনি বেদ মানতেন, কিন্তু বেদ ঈশ্বরের বাক্য বলে মানতেন না। শব্দের নিত্যত্ব ও একত্বই বেদের মূল, বেদের কোনো কর্তা থাকতে পারে না। বেদ নিত্য অপৌরুষেয় শব্দ, বেদ বিহিত কর্মই মোক্ষ লাভের পথ।

বেদব্যাস ও বেদান্ত দর্শন

বেদান্ত দর্শন প্রণয়ন করেছিলেন মহর্ষি বাদরায়ণ। বাদরায়ণ কে ছিলেন, এই নিয়ে কিছু বিতর্ক আছে। কেউ বলেন যে, এই নামে কোনো ঋষি

ছিলেন, আবার কেউ বলেন যে, বেদব্যাসই বাদরায়ণ। বদরিকাশ্রমে বাস করতেন বলে তিনিই বাদরায়ণ নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁর বংশধরদেরও বাদরায়ণ বলা হত।

বেদব্যাস যে একজন অদ্ভুতকর্মা ঋষি ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। তাঁর জন্মবৃত্তান্ত আমাদের জানা আছে। বশিষ্ঠের পৌত্র পরাশর তাঁর পিতা, মাতা ধীবরকন্যা মৎস্যগন্ধা। দ্বীপে জন্ম বলে তিনি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন নামেও পরিচিত। মহাভারত রচনা তাঁর অক্ষয় কীর্তি, অষ্টাদশ পুরাণ তাঁরই রচনা এবং তিনিই বেদ বিভাগ করেন। দর্শনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে কথিত বেদান্তদর্শনও তাঁরই কীর্তি বলে মেনে নেওয়া হয়েছে। এই সব দেখে অনেকে মনে করেন যে একজনের পক্ষে এই কীর্তি সম্ভব নয়। এতে বেদব্যাস বা বাদরায়ণ নামের অনেক ঋষির হাত আছে। কিন্তু এ অনু-মানের কথা। বেদব্যাস তাঁর সুদীর্ঘ জীবনে একা এ কাজ কেন করতে পারবেন না, তার কোনো সদ্‌যুক্তি নেই। মানুষ অনেক অসম্ভবকেও সম্ভব করতে পারে। যে বেদব্যাস বেদ বিভাগ করেছেন, মহাভারত রচনা করে-ছেন, নিঃসন্দেহে তিনিই প্রচার করেছেন বেদান্ত দর্শন। অষ্টাদশ পুরাণ তাঁর রচনা না হতে পারে, কিন্তু তাঁরই রচিত কোনো পুরাণ-সংহিতা অবলম্বন করেই যে পরবর্তী কালে অষ্টাদশ পুবাণ রচিত হয়েছিল. তাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। প্রাচান ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী ছিলেন বেদব্যাস। তিনি একাধারে কবি ঐতিহাসিক ও দার্শনিক ছিলেন।

অনেকে বলেন যে বেদের অন্ত বা শেষ ভাগই বেদান্ত। এই মতে ব্রাহ্মণ গ্রন্থের সঙ্গে যে উপনিষৎ, তাই বেদান্ত। কিন্তু সাধারণ অর্থে বেদের জ্ঞান কাণ্ডের আলোচনাকেই বেদান্ত বলা হয়। জৈমিনির মীমাংসা দর্শনে যেমন বেদের কর্ম কাণ্ডের প্রাধান্য প্রতিপন্ন করা হয়েছে, তেমনি জ্ঞান কাণ্ডের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বাদরায়ণের বেদান্ত দর্শনে। এই কারণে জৈমিনির দর্শনকে পূর্ব মীমাংসা এবং বাদরায়ণের দর্শনকে উত্তর মীমাংসা দর্শনও বলা হয়ে থাকে।

বেদান্ত দর্শন গ্রন্থের চারটি অধ্যায় এবং প্রতি অধ্যায় চার পাদে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ের নাম সমন্বয়াধ্যায়। এতে শ্রুতির বাক্যের সমন্বয় বা বিরোধ ভঞ্জন করা হয়েছে। দ্বিতীয় অবিরোধাধ্যায়ে নানা ভাবে নিজের মত প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ের নাম সাধনাধ্যায়। এতে ব্রহ্মের সাধনার বিষয়ে আলোচিত হয়েছে এবং চতুর্থ ফলাধ্যায়ে সাধনার ফলের কথা বিবৃত হয়েছে।

বেদান্ত দর্শনের প্রথম সূত্র জৈমিনির অনুরূপ। জৈমিনি বলেছেন, অথাতো ধর্ম জিজ্ঞাসা। ধর্ম জিজ্ঞাসার জন্যই এই দর্শন। আর বেদব্যাস বললেন যে, ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার জন্য এই দর্শন।—

অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা।

পণ্ডিতরা মনে করেন যে, ব্রহ্মজিজ্ঞাসার পূর্বে অথ শব্দের ব্যবহার করে বেদব্যাস অধিকার তত্ত্বের ইঙ্গিত করেছেন। অর্থাৎ ব্রহ্মজিজ্ঞাসার পূর্বে এই জ্ঞানলাভের উপযুক্ত হতে হবে। শুধু বেদ বেদাঙ্গ অধ্যয়ন নয়, চতুর্বিধ-সাধনায় ব্রহ্মজ্ঞান লাভের অধিকার জন্মে।

বেদান্ত দর্শনেরও মূল উদ্দেশ্য দুঃখময় জীবনের আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি বা নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ মুক্তি। এই দর্শনের ভাষ্যকাররা মনে করেন যে, বেদান্ত সূত্রে অদ্বৈত ও দ্বৈত এই দুই ভাবই প্রতিফলিত হয়েছে। অদ্বৈত মতে 'জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন ; অবিদ্যা বা মায়ার আবরণে আবৃত হয়ে সে আপনাকে ও ব্রহ্মকে ভেদ ভাবে ভেবে থাকে। তত্ত্বজ্ঞান উদয় হলে অর্থাৎ জীব যে ব্রহ্ম হতে অভিন্ন—এই ভাব অন্তরে জাগরূক হলে অবিদ্যা দূর হয় ; অবিদ্যা দূর হয়ে জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞান সাধিত হলেই জীবের মুক্তিলাভ হয়ে থাকে। সোঽহং, অহং ব্রহ্মাস্মি—তিনিই আমি, আমিই ব্রহ্ম—জীব তখন এ কথা বুঝতে পারে।'

দ্বৈত বা বিশিষ্টাদ্বৈত প্রভৃতি মতে 'জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন নয়। যাঁর থেকে জগতের উৎপত্তি, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই নিয়ামক,—সবই তাঁর কর্তৃত্বাধীন। সাধনাদির দ্বারা জীব তাঁর ন্যায় গুণসম্পন্ন হতে পারলেই মুক্তির অধিকারী হয়। মুক্ত পুরুষ ব্রহ্মের সহিত সমগুণসম্পন্ন হলেও ব্রহ্মের কর্তৃত্বাধীন।

মুক্ত পুরুষ সব ক্ষমতা লাভ করেন ; তাঁর সব সঙ্কল্প সিদ্ধ হয়।'

এই দুই মতের পার্থক্য খুবই স্পষ্ট। অদ্বৈত মতে ব্রহ্ম ছাড়া আর সবই মিথ্যা, ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুর অস্তিত্ব নেই। আমরা যা জগৎ বলে মনে করি, তা ব্রহ্মেরই রূপান্তর। দ্বৈত মতে জীব ও ব্রহ্ম পৃথক। জীব উপাসক ও ব্রহ্ম উপাস্য। উপাসনা দ্বারাই জাব ব্রহ্মের নিকটে পৌছতে পারে। পণ্ডিতরা মনে করেন যে এই দুই মতের সামঞ্জস্যও আছে। 'দ্বৈতাদ্বৈতের বিরোধ, সে কেবল প্রণালী ভেদ মাত্র। অদ্বৈতবাদীদের যা মায়া-বিজৃম্ভিত জীব ও শুদ্ধ চৈতন্য ব্রহ্ম, দ্বৈতবাদীদের তাই জীব ও ব্রহ্ম। মাত্র বিশেষ্য-বিশেষণের ব্যবহার ভেদ।'

কিন্তু পণ্ডিতরা এই ভাবে সমন্বয় সাধন করলেও বেদব্যাসের মূল তত্ত্ব এতে প্রতিফলিত হয় না। বেদান্ত দর্শনে তিনি অন্যান্য দার্শনিক মতের বিচাব করে তাদের মধ্যে সমন্বয় খুঁজে বার করেছেন এবং বিদ্যা বা জ্ঞানেই যে মোক্ষলাভ হতে পারে তাই প্রচার করেছেন। তাঁব মতে বিদ্যা থেকেই পরম পুরুষার্থ লাভ হয়।—

পুরুষার্থোঽতঃ শব্দাৎ ইতি বাদরায়ণঃ। ৩।৪।১

জৈমিনি বলেছেন যে, কর্মের জন্য জ্ঞানের প্রয়োজন। বাদরায়ণ এর উল্টো কথা বললেন, কর্মের প্রয়োজন জ্ঞানের জন্য। জৈমিনি যে যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়াকর্মের কথা বলেছেন তা জ্ঞানলাভের জন্যই, এ সব জ্ঞানের সোপান, জ্ঞানলাভই কর্মের শেষ। তাই তিনি জৈমিনির মত খণ্ডন করে বলেছেন, জ্ঞানের জন্য যে কর্মানুষ্ঠান তা বিদ্যার সহকারী রূপে অনুষ্ঠেয়, মুক্তির সাধন রূপে নয়।—

বিহিতত্বাচ্চাশ্রম কর্মাপি। সহকারিত্বেন চ। ৩।৪।৩২-৩৩

'তিনি যজ্ঞাদি কর্মপরম্পরাকে বহিরঙ্গসাধনের অন্তর্ভুক্ত করে শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসন অন্তরঙ্গ সাধনের প্রাধান্যই প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। ব্রহ্মকে আত্মরূপে সাক্ষাৎকারই, তাঁর মতে, উপাসনার প্রধান অঙ্গ।'—

আত্মেতি তূপগচ্ছন্তি গ্রাহয়ন্তি চ। ৪।১।৩

ব্রহ্মকে আত্মজ্ঞানে উপাসনা করবে, ব্রহ্মরূপেই নিজেকে উপলব্ধি করবে।—

মুক্তঃ প্রতিজ্ঞানাৎ। ৪।৪।২

আত্মা প্রকরণাৎ। ৪।৪।৩

অবিভাগেন দৃষ্টত্বাৎ। ৪।৪।৪

বেদান্ত দর্শনে আত্মজ্ঞানেরই প্রাধান্য কীর্তিত হয়েছে। ভক্তির প্রসঙ্গ এখানে নিতান্তই গৌণ। তাই দ্বৈতমতে ভক্তির আশ্রয় অপেক্ষা অদ্বৈত মতে আত্মজ্ঞান লাভই মুক্তির উপায় বলে বেদব্যাস মনে করেছেন। আমিই তিনি বা আমিই ব্রহ্ম—সোঽহং বা অহং ব্রহ্মাস্মি—এই অভেদ জ্ঞানেই সমস্ত দুঃখের বিনাশ বা মুক্তি হয়, এটাই বেদান্তের মুখ্য প্রতিপাদ্য। এই মতকেই সর্বসাধারণ বেদান্ত মত বলে মেনে নিয়েছেন। বেদব্যাস যা বলেছেন সরল কথায় তার অর্থ হলো, অধিকারী হও, তত্ত্বজ্ঞান অর্জন কর, মুক্তি তোমার মুঠোয় আসবে।

চার্বাক ও চার্বাক দর্শন

দেবগুরু বৃহস্পতির এক শিষ্যের নাম চার্বাক। চার্বাক এই দর্শন জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করেছিলেন বলে এই দর্শন চার্বাক দর্শন নামে পরিচিত। নাস্তিক্যবাদে পূর্ণ বলে এই দর্শনকে ষড় দর্শনের সমান মর্যাদা দেওয়া হয় নি। এ দর্শন ষড় দর্শনের অন্তর্গত নয়। বরং এক সময়ে যে-কোনো নাস্তিক্য মতই চার্বাক দর্শন নামে অভিহিত হত।

চার্বাক শব্দটি এসেছে চারুবাক থেকে। চারু মানে সুন্দর বা মনোহর। চার্বাক দর্শন মানে মনোহর দর্শন হতে পারত, কিন্তু পণ্ডিতরা এই দর্শনকে মনোহর না বলে আপাত মনোহর বলেছেন। অর্থাৎ এই দর্শন মনোহর মনে হলেও এটি প্রকৃতপক্ষে মনোহর নয়।

তবে এ কথা সকলেই স্বীকার করেন যে চার্বাক এই দর্শনের প্রবর্তক নন, এই দর্শন প্রণেতা ছিলেন দেবগুরু বৃহস্পতি। দেবগুরুকে এই দর্শন প্রবর্তনের নিন্দা থেকে রক্ষা করবার জন্য অনেকে বলেন যে, ঋগ্বেদে বৃহস্পতি নামে আরও একজন ঋষি ছিলেন, তিনি লোক বংশের বৃহস্পতি। দেবগুরু ছিলেন অঙ্গিরা ঋষির পুত্র। আবার অনেকে বলেন

যে ব্রহ্মা স্বয়ং এই নাস্তিক্য মত প্রচার করেন। ছান্দোগ্যোপনিষদে ও মৈত্রেয়্যুপনিষদে দেখা যায় যে অসুরদের এইভাবে আত্মতত্ত্ব বোঝানো হয়েছিল। পদ্মপুরাণে এই বিষয়ে একটি কাহিনী আছে। দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য যখন তপস্যারত ছিলেন, তখন বৃহস্পতি তাঁর ছদ্মবেশে অসুর-দের নিকটে গিয়ে তাদের ছলনার জন্য বেদের বিপরীত কর্মানুষ্ঠানের জন্য এই মত প্রচার করেছিলেন।

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে আমরা একটি ঘটনার উল্লেখ দেখি। বৃহস্পতি আঘাত করে গায়ত্রীদেবীর মাথা ভাঙ্গেন, তার থেকেই বষট্‌কারের উৎপত্তি। এই ঘটনার থেকে অনুমান করা যায় যে বৃহস্পতি নিজেই বৈদিক ধর্মনাশের চেষ্টা করেছিলেন। এর একটা কারণও অনুমান করা সম্ভব। বৈদিক ক্রিয়া কর্ম নিয়ে সমাজে এক সময়ে বাড়াবাড়ি হচ্ছিল। তারই প্রতিবাদে বৃহস্পতি হয়তো এই নাস্তিক ধর্ম প্রবর্তন করে থাকবেন। তারপর তাঁর শিষ্য চার্বাক এই মত জনসাধারণে প্রচার করেছেন। কিন্তু বৃহস্পতিব নামে এই দর্শনের নাম না হয়ে চার্বাকের নামেই তা প্রচলিত হয়েছে। দেবগুরু বৃহস্পতি বোধহয় নেপথ্যে থাকতে চেয়েছিলেন। অনেকে অবশ্য এই দর্শনকে বার্হস্পত্য দর্শনও বলে থাকেন। আবার পরলোক স্বীকাব করা হয় না বলে এই দর্শন লোকায়ত নামেও পরিচিত।

চার্বাক দর্শনের সার কথা হল, 'দেহ ভিন্ন অন্য আত্মার অস্তিত্ব নেই। আত্মাই দেহ, আত্মার ধ্বংসেই দেহের ধ্বংস। ইহ সংসারের সুখই পরম পুরুষার্থ। প্রত্যক্ষ ভিন্ন প্রমাণ নেই। পৃথিবী জল বায়ু অগ্নি—এই চারি ভূত থেকেই সমস্ত সৃষ্টি হয়েছে। চৈতন্যও ভূত থেকে উৎপন্ন। পরলোক ও পুনর্জন্ম নেই। মৃত্যুই অপবর্গ।'

এই একমাত্র দর্শন যাতে বলা হয়েছে যে এই জগৎ দুঃখময় নয়, সুখ ভোগ করবে। শাস্ত্রের চেয়ে যুক্তিই বড় এবং প্রত্যক্ষ প্রমাণই একমাত্র প্রমাণ। জীবনে দুঃখ আছে বলে যে সুখ ভোগ করতে চায় না, সে পশুর মতো মূর্খ। মাছে কাঁটা আর আঁশ থাকরে বলে কি মাছ খাবে না? ধানের কুটো বাছতে হয় বলে কি ভাত খাবে না? জানোয়ারে শস্য নষ্ট করে বলে কি

শস্যের বীজ বপন করবে না? ভিখারী বিরক্ত করবে ভেবে কি ভাত রাঁধবে না?

চার্বাক মতে ইহকালের সুখই সুখ, পরকাল বলে কিছু নেই। যেমন গুড় ভাত মিলিয়ে মদ তৈরি হয়, তেমনি ক্ষিতি অপ তেজ ও মরুৎ এই চার ভূতের সংযোগে চৈতন্যের উৎপত্তি হয়। এদের অভাব হলেই দেহের নাশ, আর দেহ নাশ হলে পুনরায় উৎপত্তির কোনো সম্ভাবনাই নেই। দেহ ধারণ করে ও চৈতন্য লাভ করে আমরা যে মনে করি আমি কৃশ বা স্থূল, আমি শ্যাম বা গৌর বর্ণ, আমার মধ্যে আত্মা বলে অন্য কিছু আছে, এ সব লৌকিক কল্পনা মাত্র। দেহের বিনাশে সবই শেষ হয়ে যায়। তাই চার্বাকের উপদেশ হল, যতদিন বাঁচবে সুখ ভোগ করে নাও, ঋণ করেও ঘি খাও, দেহ ভস্মীভূত হলে আর তো ফিরে আসবে না!—

যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেদৃণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।
ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ।

সব শাস্ত্রেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রতিপাদনের জন্য অনুমানকেই অবলম্বন করা হয়েছে। কিন্তু চার্বাক এই অনুমান প্রমাণ অগ্রাহ্য করে বলেছেন যে অনুমান প্রমাণ ভ্রমসঙ্কুল, কারণ তা ব্যাপ্তি জ্ঞান সাপেক্ষ। কিন্তু প্রত্যক্ষ ছাড়া ব্যাপ্তি জ্ঞান সম্ভবপর নয়। আর এই প্রত্যক্ষ বর্তমানেই সম্ভব, অতীত ও ভবিষ্যতে কিছু প্রত্যক্ষ করা সম্ভব নয়। শব্দ প্রমাণ কোনো প্রমাণ নয়, তাই বেদ অপ্রামাণ্য ও যুক্তি বিরুদ্ধ' স্বর্গ মোক্ষ আত্মা পরলোক বর্ণাশ্রম ধর্ম ও বৈদিক ক্রিয়াকর্মের কোনো সার্থকতা নেই। চার্বাক মতে এ সমস্তই ধূর্তের চাতুরী ও এক শ্রেণীর লোকের জীবিকার উপায়। তারা সরলমতি জনসাধারণকে প্রতারণার জন্য বেদের নামে স্বর্গ-নরক পরলোক প্রভৃতি অলৌকিক কথায় তাদের অন্ধ করে রেখেছে এবং তাদের বিশ্বাস ও প্রবৃত্তির জন্যে নিজেরাই নানা অনুষ্ঠান করছে, রাজাদের দিয়ে যাগযজ্ঞ করে নিজেদের পরিবার প্রতিপালন করছে। কিন্তু যাগযজ্ঞে কি কোনো ফল পাওয়া যায়! যজ্ঞে পশু বধ হলে সেই পশু স্বর্গে যায়—এ কথা যদি সত্য হত তো তারা নিজেদের বৃদ্ধ পিতামাতাকে কেন বলি

দেয় না! শ্রাদ্ধ করলেই যদি মৃতের তুষ্টি হয় তো প্রবাসী আত্মীয়ের জন্য নিজের গৃহে কাউকে ভোজন করালেই তো চলত, পাথেয় দেবার প্রয়োজন হত না! আর উঠানে শ্রাদ্ধ করলে গৃহের কারও তুষ্টি হয় না কেন! যদি আত্মা বলে কিছু থাকত এবং মৃত্যুর পরে তার দেহান্তরে প্রবেশের ক্ষমতা থাকত, তবে বন্ধু-বান্ধবের স্নেহে বা অনুরোধে নিজের দেহেই পুনরায় ফিরে আসে না কেন! ভণ্ড, ধূর্ত ও নিশাচর—এই তিন হল বেদের কর্তা। তাই বেদেই পরস্পর বিরোধী অনেক কথা আছে।

চার্বাক মতে শাস্ত্রের চেয়ে যুক্তি বড়।—

কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্তব্যোঽব্যর্থনির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীন বিচারেতু ধর্মহানিঃ প্রজায়তে।

এই দার্শনিক মতের বিরুদ্ধে আমাদের শাস্ত্রকার পণ্ডিতরা বলেছেন যে অসুরদের বিনাশের জন্য তাদের বুদ্ধি বিভ্রম ঘটাতে এই দর্শন শাস্ত্র প্রচার করা হয়েছিল। তাদের গুরু শুক্রাচার্য যখন তপস্যার জন্য অনুপস্থিত ছিলেন, দেবগুরু বৃহস্পতি তখন শুক্রাচার্যের ছদ্মবেশে এই নাস্তিক্যমত অসুরদের মধ্যে প্রচার করেছিলেন। এই মত গ্রহণ করে অসুরদের পতন হয়েছিল এবং এই মত অনুসরণ করলে মানুষেরও পতন অবশ্যম্ভাবী।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

হিন্দুশাস্ত্রে ধর্মতত্ত্ব

স্মৃতিশাস্ত্র—পুরাণ—গীতা—তন্ত্র।

স্মৃতিশাস্ত্র

ষড় দর্শন ও চার্বাক দর্শনের সঠিক কাল নির্ণয় এখন আর সম্ভব নয়। তবে মনে হয় যে স্মৃতিশাস্ত্রের সংহিতাগুলি রচিত হবার পূর্বেই ঋষিরা দর্শনশাস্ত্র নিয়ে গভীর চিন্তা করেছিলেন। ঈশ্বব আছে কি নেই, এই চিন্তা সেকালে প্রধান ছিল না। দর্শন শাস্ত্রের মুখ্য লক্ষ্য ছিল দুঃখের নিবৃত্তি বা সুখের সন্ধান। দার্শনিকরা এই অবস্থাকে নিঃশ্রেয়স কৈবল্য ও মুক্তি বলেছেন। সাংখ্য মতে আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তির জন্য কৃতকৃত্যতাই মুক্তি—অত্যন্ত দুঃখ নিবত্ত্যা কৃত-কৃত্যতা। বৈশেষিক মতে পদার্থের সাধর্ম্য-বৈধর্ম্য জ্ঞানে যে দুঃখনিবৃত্তি, তারই নাম নিঃশ্রেয়স বা মুক্তি। ন্যায় মতে আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তিই মুক্তি—আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তির্মুক্তিঃ। পাতঞ্জল মতে স্বরূপে অবস্থানই মুক্তি—তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানম্। মীমাংসার মতে কর্মকাণ্ড দিয়ে স্বর্গ ও অপবর্গ প্রাপ্তিই মুক্তি এবং বেদান্ত মতে ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্নতাই মুক্তি। চার্বাক মতেও সংসারে দুঃখ আছে, কিন্তু দুঃখ আছে বলে মানুষ সুখভোগে কেন বিরত থাকবে—সুখমেব পুরুষার্থঃ। মনে হয় এরই অব্যবহিত পরে ঋষিরা দেখলেন যে এই দর্শনশাস্ত্র জন-সাধারণের উপযোগী নয়। মানুষকে ধর্মপথে পরিচালিত করবার জন্য কিছু অনুশাসন বিধিবদ্ধ করা প্রয়োজন। বেদ বা শ্রুতিতে যে সমস্ত উপদেশ আছে তাই সঙ্কলন করে ঋষিরা সংহিতার আকারে প্রকাশ করেন। এরই নাম স্মৃতি। স্মৃতি নূতন কিছু নয়, শ্রুতি থেকে স্মৃতি। তাই অত্রি তাঁর সংহিতায় বলেছেন যে শ্রুতি ও স্মৃতিকে ব্রাহ্মণের দুই নয়ন

বলা যায়।—

শ্রুতিঃ স্মৃতিশ্চ বিপ্রাণাং নয়নে দ্বে প্রকীর্তিতে।

শ্রুতি বা বেদের সংখ্যা যেমন চার, তেমনি স্মৃতি বা ধর্মসংহিতার সংখ্যা কুড়ি। বেদ অপৌরুষেয়, অর্থাৎ বেদ কেউ রচনা করেন নি। ঋষিরা বেদের মন্ত্রগুলি সংকলন করেছিলেন। কিন্তু স্মৃতি গ্রন্থগুলি এক একজন ঋষির নামে প্রচলিত। অর্থাৎ তাঁরা সেই সব ধর্মসংহিতা শ্রুতির উপদেশ একত্র করে প্রচার করেন। তাঁদের নামেই সংহিতার নাম হয়েছে মনু সংহিতা, অত্রি সংহিতা, বিষ্ণু সংহিতা, হারীত সংহিতা, যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা, উশ্বন সংহিতা, অঙ্গিরা সংহিতা, যম সংহিতা, আপস্তম্ব সংহিতা, সংবর্ত সংহিতা, কাত্যায়ন সংহিতা, বৃহস্পতি সংহিতা, পরাশর সংহিতা, ব্যাস সংহিতা, শঙ্খ সংহিতা, লিখিত সংহিতা, দক্ষ সংহিতা, গৌতম সংহিতা, শাতাতপ সংহিতা ও বশিষ্ঠ সংহিতা। এ ছাড়াও আর যে তিনটি সংহিতার নাম পাওয়া রায়, তাদের নাম কশ্যপ সংহিতা, গর্গ সংহিতা ও প্রচেতা সংহিতা। কিন্তু এই তিনটি সংহিতার উল্লেখ আছে প্রচলিত যম বৃহস্পতি ও ব্যাস সংহিতার পরিবর্তে।

স্মৃতিশাস্ত্র রচনার কাল নিয়ে কিছু বিতর্ক আছে। এই সব গ্রন্থের কয়েক স্থানে ম্লেচ্ছ শব্দের ব্যবহার দেখে অনেকে এগুলি আধুনিক রচনা মনে করেন। কিন্তু এই ম্লেচ্ছ শব্দ দিয়ে কোনো বিশেষ ধর্মাবলম্বী বোঝাত না। যে দেশে হিন্দুর বর্ণাশ্রম ধর্ম প্রচলিত ছিল না, তাকেই ম্লেচ্ছদেশ ও তার অধিবাসীদের ম্লেচ্ছ বলে উল্লেখ করা হত। অনেক পণ্ডিত মনে করেন যে বৌদ্ধযুগেই স্মৃতিশাস্ত্রের প্রচলন হয়। কিন্তু এই শাস্ত্রের রচনাকাল আরও প্রাচীন বলে মনে হয়। অন্ততঃ মনুসংহিতা যে খুবই প্রাচীনকালে রচিত হয়েছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। উইলিয়াম জোন্স বলেছেন যে খ্রীষ্টের জন্মের বারো শো আশি বছর পূর্বে মনুসংহিতা রচিত হয়েছিল। এখন প্রশ্ন হল, এই মনুসংহিতার রচয়িতা কে ছিলেন। আমরা জানি যে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার পুত্রের নাম মনু, তিনিই ছিলেন মানুষের আদি পুরুষ। পুরাণের মতে চতুর্দশ মন্বন্তরে চোদ্দজন মনু ছিলেন, আছেন ও

হবেন। সূর্যের এক পুত্রের নামও মন্থু। আবার পৃথিবীর প্রথম রাজার নামও মন্থু। এঁরা যদি এক ব্যক্তি না হন তো কোন্ মন্থু এই সংহিতা রচনা করেছিলেন তা অনুমান করা কঠিন। তাঁর কাল নির্ণয়ও সম্ভব নয়। কাজেই মনুসংহিতার রচনা কাল এই গ্রন্থের রচনার গুণাগুণ দেখে অনুমান করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

মনুসংহিতার বারোটি অধ্যায়ে সৃষ্টিতত্ত্ব, স্ত্রীধর্ম, রাজধর্ম, রাজা-প্রজার সম্পর্ক, দায়ভাগ ও বারো প্রকার পুত্র, চতুর্বর্ণের তপস্যা ও মোক্ষলাভের উপায় বর্ণিত হয়েছে। মনুর মতে ইহলোকের কর্মের ফল পরলোকে ভোগ করতে হয়। এইজন্যই ইহলোকে শুভ কাজ করা কর্তব্য, পাপ কাজ সর্বতোভাবে বর্জন করতে হবে। সব সুখের মূলেই তপস্যা।—জ্ঞানের উৎকর্ষ সাধন ব্রাহ্মণের তপস্যা, দেশে শান্তিরক্ষা ক্ষত্রিয়ের তপস্যা, বাণিজ্য ও পশুপালন বৈশ্যের তপস্যা এবং শূদ্রের তপস্যা দ্বিজসেবা। এই তপস্যাতেই স্বর্গ লাভ হয়। মনুসংহিতার উপসংহারে আত্মজ্ঞানের কথা আছে। বলা হয়েছে যে জ্ঞানার্জনেই মুক্তি। যিনি সর্বভূতে আত্মদর্শন করেন, সর্বসমতা পেয়ে তিনি পরমপদ ব্রহ্ম লাভ করেন।—

এবং যঃ সর্বভূতেষু পশ্যত্যাত্মানমাত্মনা।
স সর্ব সমতামেত্য ব্রহ্মাভ্যেতি পরং পদম্॥

অত্রি সংহিতায় ইষ্ট-পূত কাজে মোক্ষলাভ, বর্ণধর্ম ও সহমরণের প্রসঙ্গ আছে। বিষ্ণুসংহিতায় আছে চতুর্বর্ণের কর্ম-বিভাগ. বিচার. বিবরণ ও লক্ষ্মীর বাসস্থান। সৃষ্টির প্রসঙ্গ ও নরসিংহের পূজার কথা আছে হারীত সংহিতায়।

যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতার প্রাধান্য মনুসংহিতার পরেই। রাজর্ষি জনকের সভায় যে ঋষি ব্রহ্মতত্ত্ব নিয়ে তর্ক করেছিলেন, মনে হয় তিনিই এই সংহিতার প্রবর্তক। সামশ্রব প্রভৃতি তাঁর শিষ্যরা গুরুর নিকটে বর্ণাশ্রম ধর্ম, ব্যবহার শাস্ত্র ও প্রায়শ্চিত্ত বিধি প্রভৃতি শুনে সেই সবই সংহিতার আকারে লিপিবদ্ধ করেছিলেন। এই সংহিতার অন্তর্গত দায়ভাগ প্রকরণ থেকেই বিজ্ঞানেশ্বর ভট্টারক 'মিতাক্ষরা' ও জীমূতবাহন 'দায়ভাগ' গ্রন্থ সংকলন

করেন। বাঙলায় দায়ভাগ ও ভারতের অন্যত্র মিতাক্ষরা মতেই হিন্দু আইনে উত্তরাধিকার নির্ণীত হত।

উশনঃ সংহিতায় অশৌচবিধি ও শ্রাদ্ধ পদ্ধতি, খাদ্যাখাদ্য বিচার ও প্রায়শ্চিত্ত, সমুদ্রযাত্রা নিষেধ ও ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব ও ওঙ্কারের প্রসঙ্গ আছে। অঙ্গিরা সংহিতায় প্রায়শ্চিত্ত ও স্ত্রীধর্ম, যম সংহিতায় নানা বিধিনিষেধ, আপস্তম্ব সংহিতায় প্রায়শ্চিত্ত বিধি, সংবর্ত সংহিতায় খাদ্যাখাদ্য বিচার, কাত্যায়ন সংহিতায় গণেশ ও গৌরীপূজা, বৃহস্পতি সংহিতায় দানধর্ম ও কূপ পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠার পুণ্য, পরাশর সংহিতায় কলিশাস্ত্র সমাজ ও বিধবার কর্তব্য, ব্যাস সংহিতায় গৃহস্থের নিত্যকথা, শঙ্খসংহিতায় তীর্থ-মাহাত্ম্য ও বিবাহাদি প্রসঙ্গ, লিখিত সংহিতায় গয়া কাশী-তীর্থ ও বৃষোৎ-সর্গ, দক্ষ সংহিতায় সকল বর্ণের কর্তব্য নির্ধারণ, গৌতম সংহিতায় রাজধর্ম, শাতাতপ সংহিতায় দেবদেবীর প্রসঙ্গ ও কর্মবিপাক এবং বশিষ্ঠ সংহিতায় আচার প্রসঙ্গ, বিবাহ ও আয়ুবৃদ্ধির বিষয়ে আলোচিত হয়েছে।

এই সব স্মৃতি গ্রন্থে সেকালের একটি সুসভ্য সমাজের চিত্র পরিষ্কার ভাবে ফুটে উঠেছে। ইহলোকের পাপপুণ্যের জন্য পরলোকে তার ফল ভোগের কথা আছে, কিন্তু ঈশ্বর সম্বন্ধে কোনো দার্শনিক আলোচনা নেই। স্মৃতি রচয়িতা ঋষিরা দেবতার অস্তিত্ব প্রমাণের কোনো চেষ্টা করেন নি। তাঁরা সুস্থ সমাজ জীবন গড়ে তোলবার জন্যই বোধহয় পরলোকের কল্পনা করেছিলেন।

পুরাণ

স্মৃতিশাস্ত্রের পরেই পুরাণ। পুরাণ মানে প্রাচীন। তাই এই শব্দে পুরাণ সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা সম্ভব নয়। বৈদিক যুগে পুরাণ ও ইতিহাস এই দুটি শব্দের ব্যবহার ছিল। ঋষিরা যা নিজের চোখে দেখে লিপিবদ্ধ করে-ছিলেন, তার নাম ইতিহাস। যা ইতিহাসের চেয়েও পুরাতন কথা এবং কেউ যা প্রত্যক্ষ করেন নি, তারই নাম পুরাণ। এই অর্থে সৃষ্টি রহস্যের কথা পুরাণ ও সূর্য ও চন্দ্রবংশের রাজাদের কথা ইতিহাস। কাজেই মনে

হয় যে পুরাকালে পুরাণ একখানাই ছিল এবং ইতিহাস ছিল একাধিক। তারপর কোনো সময় থেকে ইতিহাসের সঙ্গেই পুরাণ যুক্ত হয়ে এই জাতীয় গ্রন্থের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এক সময়ে দেখা যায় যে ইতিহাস শব্দটি লোপ পেয়ে পুরাণের সংখ্যাই হয়েছে অগণিত। এখন আমরা আঠারোটি মহাপুরাণ ও আঠারোটি উপপুরাণ প্রচলিত দেখি। এই সবের মধ্যে অনেক বিষয়ের অভিন্নতা দেখে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় যে তা একটি আকর গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত হয়েছে।

এই পুরাণ সম্ভার যে কী বিশাল, সে সম্বন্ধে আজ আমাদের অনেকের ধারণাই অসম্পূর্ণ। এর বিষয়বস্তুর ব্যাপ্তি আলোচনা করলে বিস্ময়ে অভিভূত হতে হয়। শুধু সৃষ্টিতত্ত্ব ও হিন্দুর প্রাচীন ইতিহাস নয়। এই সব গ্রন্থে দেবদেবীর মাহাত্ম্য, ধর্মতত্ত্ব ও ধর্মজীবন যাপনের বিধিনিষেধও লিপিবদ্ধ হয়েছে। ভারতের প্রাকৃতিক সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার বর্ণনা করে মানুষকে ধর্মপথে পরিচালিত করবার এক উদ্দেশ্য এই সব গ্রন্থে প্রচ্ছন্ন আছে।

সাধারণভাবে মনে করা হয় যে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস অষ্টাদশ মহাপুরাণের রচয়িতা। কিন্তু পণ্ডিতরা এক মত হয়েছেন যে তা সম্ভব নয়। কোনো একটি বিশেষ সময়ে এই সব পুরাণ রচিত হয় নি। বেদব্যাস মহাভারতের মতো একখানি পুরাণ হয়তো রচনা করেছিলেন। পরবর্তীকালে তাঁর শিষ্যরা এই পুরাণ ভেঙে অষ্টাদশ মহাপুরাণ রচনা করে থাকবেন। বর্তমানে প্রচলিত গ্রন্থগুলি দেখে উইলসন সাহেব এই সবের কাল নির্ণয়ের চেষ্টা করেছিলেন এবং তা অনেক পরিমাণে যুক্তি সমন্বিত। তাঁর মতে বায়ু পুরাণই সবচেয়ে প্রাচীন। বিষ্ণু পুরাণে বৌদ্ধ ও জৈন প্রসঙ্গ আছে বলে তিনি এই পুরাণ গৌতম বুদ্ধ ও বর্ধমান মহাবীরের পরবর্তীকালে রচিত বলে মনে করেন। দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ভারতে বৌদ্ধমত প্রচলিত ছিল বলে এই পুরাণ নিঃসন্দেহে তার পূর্বে রচিত হয়েছিল। অন্যান্য পুরাণগুলি দ্বাদশ থেকে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যে রচিত বলে তাঁর ধারণা। এ কথা মেনে নিলেও অস্বীকার করবার উপায় নেই যে মূল পুরাণ অতি প্রাচীন-

কালে রচিত হয়েছিল এবং আর্য-সমাজে তা বেদের মতোই সমাদৃত হত। পুরাণকে পঞ্চম বেদও বলা হত।

অথর্ব বেদে আছে যে যজ্ঞের উচ্ছিষ্ট থেকে যজুর্বেদের সঙ্গে ঋক্ সাম ছন্দ ও পুরাণ উৎপন্ন হয়েছিল।—

ঋচঃ সামানি ছন্দাংসি পুরাণং যজুষা সহ।—অথর্ব ১১।৭।২৪

এই রকমের কথা বৃহদারণ্যক উপনিষদেও আছে। এর থেকেই প্রমাণ হয় যে মূল পুরাণ বেদ ব্রাহ্মণ উপনিষদের সময়ে প্রচলিত ছিল। এই মূল গ্রন্থ পরবর্তীকালে অষ্টাদশ মহাপুরাণ ও অষ্টাদশ উপপুরাণে সংকলিত হলেও এর প্রাচীনত্ব আমরা অস্বীকার করতে পারি না।

ছান্দোগ্য উপনিষদে ইতিহাস ও পুরাণকে বেদের পঞ্চম বেদ বলা হয়েছে। ইতিহাস পুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদম।—ছান্দোগ্য ৭।১।১ শতপথ ব্রাহ্মণেও এই কথা পাওয়া যায়।—পুরাণ বেদ, এ সেই বেদ, এই কথা বলে অধ্বর্যু পুরাণ কীর্তন করেন।—১৩।৪।৩।১৩

নিঃসন্দেহে বলা যায় যে একদা পুরাণ পাঠের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল লোক-শিক্ষা, আচার প্রতিষ্ঠা, সমাজে শৃঙ্খলা রক্ষা ও ধর্মাচরণ শিক্ষা এবং এরই জন্য সৃষ্টিরহস্য থেকে আরম্ভ করে দেবতার মাহাত্ম্য, ভূতত্ত্ব পুরাতত্ত্ব ইতি-হাস দর্শন জ্যোতিষ ও জ্ঞান বিজ্ঞানের নানা আলোচনা এই সব গ্রন্থে পাওয়া যায়। পুরাণে ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিয়ে কোনো প্রশ্ন নেই, ঈশ্বরকে নানারূপে স্বতঃসিদ্ধ বলে মেনে নেওয়া হয়েছে। পরলোক ও জন্মান্তর নিয়েও কোনো সন্দেহ করা হয় নি। ধর্ম অধর্ম ও পাপ পুণ্যের সংজ্ঞা পুরাণে খুবই স্পষ্ট। তাই পুরাণকে আমরা বেদের মতো পবিত্র ধর্মগ্রন্থ বলে মেনে নিতে পারি।

অষ্টাদশ মহাপুরাণের প্রথম হলো ব্রহ্ম পুরাণ। দ্বিতীয় পদ্ম পুরাণ অতি বিরাট এবং সৃষ্টি ভূমি স্বর্গ পাতাল ও উত্তর এই পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত। তৃতীয় বিষ্ণু পুরাণ বিসম্বাদশূন্য। তারপর শিব পুরাণ। মতান্তরে বায়ু পুরাণ প্রাচীনতম বলে স্বীকৃত। এর পরে লিঙ্গ পুরাণ, গরুড় পুরাণ ও নারদ পুরাণ। অনেকের মতে অষ্টম পুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত সকল পুরাণের

মধ্যে শ্রেষ্ঠ। মতান্তরে দেবীভাগবতই মহাপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত উপপুরাণ মধ্যে পরিগণিত। অগ্নি পুরাণের পর স্কন্দ পুরাণই সর্ববৃহৎ, এই গ্রন্থ কাশী উৎকল প্রভাস মহেশ্বর বৈষ্ণব ও ব্রহ্ম এই ছয় খণ্ডে বিভক্ত। তারপর ভবিষ্য পুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ। মার্কণ্ডেয় পুরাণের দেবী মাহাত্ম্য চণ্ডী নামে বিখ্যাত। এর পরে বামন পুরাণ, বরাহ পুরাণ, মৎস্য পুরাণ কূর্ম পুরাণ ও ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ। অধ্যাত্ম রামায়ণ ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের অন্তর্গত।
এই ভাবে বহু উপপুরাণের নামও পাওয়া যায়। তার মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য হলো বায়ু পুরাণ ও দেবী ভাগবত। অনেকেই এই দুটিকে মহাপুরাণ মধ্যে গণ্য করেন। উপপুরাণের সংখ্যা এত যে কোন্‌টি অষ্টাদশ উপপুরাণের অন্তর্গত আর কোন্‌টি নয়, তা বলা কঠিন।

গীতা

শ্রীমদ্ভাগবদ্‌গীতা মহাভারতের অন্তর্গত ভীষ্মপর্বের আঠারোটি অধ্যায়। এর রচয়িতা কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস। এতে শুধু কৃষ্ণের কথাই নয়, সঞ্জয় অর্জুন ও ধৃতরাষ্ট্রের কথাও আছে। ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয় সংবাদের পরে অর্জুন-বিষাদ-যোগ। এতে অর্জুন স্বজনবধে বিমুখতা প্রকাশ করলে কৃষ্ণ অর্জুনের নিকট ধর্মের ব্যাখ্যা করেন। কৃষ্ণের মুখনিঃসৃত হলেও এই উপদেশ বেদ-ব্যাসেরই রচনা। বেদব্যাসই গীতা রচনা করে কৃষ্ণার্জুনের সংলাপে তা প্রচার করেন।
কৃষ্ণকে আমরা ঐতিহাসিক পুরুষ বলে মনে করি। বেদব্যাস তাঁকে মানুষ বলেই চিত্রিত করেছেন। জ্ঞানে অভিজ্ঞতায় দূরদৃষ্টিতে কূটনীতিতে এবং বিচক্ষণতায় সেকালে তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিলেন না। তিনি অদ্বিতীয় এবং আশ্চর্য চরিত্রের মানুষ ছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবত ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে তাঁর বাল্য ও যৌবনের কথা আছে। তাতে তাঁর দৈহিক শক্তি ও রণকুশলতার পরিচয় পাওয়া যায়। নানা স্থানে তাঁর অলৌকিক ক্ষমতার কথাও আছে। তাঁর উপরে দেবত্ব আরোপ করা হয়েছে, তিনি বিষ্ণুর অবতার রূপে স্বীকৃত হয়েছেন।

মহাভারতে তিনি মানুষ বলে পরিচিত হলেও অর্জুনকে তিনি বিশ্বরূপ দর্শন করিয়েছেন। অর্জুন বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে সেই অব্যয় অক্ষয় অনন্ত রূপ দেখছেন। কৃষ্ণ বলছেন, যে আমার জন্য কর্ম করে, আমারই আশ্রিত ও আমাতেই যার পুরুষার্থ জ্ঞান এবং সমস্ত আসক্তি রহিত, সেই আমাকে পায়। এর নাম ভক্তিযোগ। কিন্তু মহাভারতে কৃষ্ণের চরিত্রে আমরা কোথাও এই ভাব দেখি না। কৃষ্ণ নিজের উপরে নিজেই দেবত্ব আরোপ করেছেন, এ কথা বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। পরবর্তী কোনো সময়ে অর্জুনের এই বিশ্বরূপ দর্শন বেদব্যাসের লেখায় প্রক্ষিপ্ত হয়েছে বলে ভাবতে পারলে আশ্বস্ত হওয়া যায়। কৃষ্ণ অর্জুনকে বিশ্বরূপ দেখিয়েছেন, কিন্তু তা নিজের মধ্যে দেখান নি, দেখিয়েছেন সবার মধ্যে। সবার মধ্যেই তিনি আছেন, সবাই তাঁরই প্রতিচ্ছবি। এ বেদান্তের কথা। যে কৃষ্ণ গীতার প্রারম্ভে সাংখ্যযোগের বর্ণনা করেছেন, তিনি পরবর্তী অধ্যায়ে বেদান্তের কথাও যে বলবেন তাতে সন্দেহ নেই।

অর্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করতে কৃষ্ণ বলেছেন, আত্মার বিনাশ নেই, মানুষ যেমন জীর্ণবাস পরিত্যাগ ক'রে নূতন বস্ত্র গ্রহণ করে, তেমনি মানুষের আত্মাও পুরাতন শরীর ত্যাগ ক'রে নূতন শরীর গ্রহণ করে। বিষয় চিন্তায় আসক্তি, তার থেকেই বিবেক নাশ হয়ে মানুষের সর্বনাশ হয়। তাই মুক্তি লাভের জন্য সমস্ত বাসনা ও অহং ভাব বিসর্জন দিয়ে জীবনে নিস্পৃহ হতে হবে। কর্মযোগ ও সমাধিযোগেই আত্মজ্ঞান লাভ হয়। নিষ্কাম কর্মের কথা বলেছেন কৃষ্ণ, তারপরে বলেছেন অধ্যাত্ম যোগের কথা। ফলে নিস্পৃহ হয়ে যে কর্তব্যকর্মের অনুষ্ঠান করে, সে কর্মযোগী ; সংসারী হয়েও সন্ন্যাসী। জ্ঞানযোগে কৃষ্ণ বলছেন, সকাম কর্মের পুণ্যফল ক্ষয় হয়, কিন্তু নিষ্কাম কর্মে মুক্তি।

রাজবিদ্যাযোগে কৃষ্ণ বলছেন যে যজ্ঞাদি কর্মকাণ্ডে যেমন স্বর্গলাভ হয় তেমনি অনন্যকাম উপাসনায় আত্মজ্ঞানলাভ হলেও মোক্ষলাভ হয়। বিভূতিযোগে তিনি বলছেন যে জগতে তিনি নিজের একাংশে ব্যাপিয়া আছেন, তিনি ছাড়া আর কিছু নেই। তারপরেই দেখিয়েছেন তাঁর বিশ্ব-

রূপ। কপিলের প্রকৃতি-পুরুষ তত্ত্বের কথাও কৃষ্ণ বলেছেন, কিন্তু প্রকৃতি-পুরুষ না বলে বলেছেন ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ। বিবেক-জ্ঞান-চোখ দিয়ে যে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞর প্রভেদ জানতে পারে, সেই পরমার্থতত্ত্ব ব্রহ্মলাভ করে। ত্রিগুণতত্ত্বের আলোচনার পরে কৃষ্ণ পুরুষোত্তম যোগের কথা বলেছেন। দেবাসুর সম্পত্তি বিভাগ যোগে তিনি বলেছেন, কে মোক্ষলাভের অধিকারী। ত্রিবিধ শ্রদ্ধায় আত্মা কোন্ পথে পরিচালিত হয় সে কথাও তিনি বলেছেন। সব শেষে তিনি মোক্ষ সন্ন্যাস উপদেশ দিয়েছেন। সমস্ত কর্মের ফল ত্যাগের নামই সন্ন্যাস। কিন্তু চতুবর্ণের নির্দিষ্ট ধর্মই শ্রেয় ধর্ম। ফলের আশা না করে কর্তব্য কর্ম করেই মানুষ মোক্ষলাভ করতে পারে।

গীতায় একটি ভাব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বেদব্যাস মনে করেছেন যে ষড়্‌দর্শনের গভীর তত্ত্ব সাধারণ মানুষের উপযোগী হয় নি। কপিলের সাংখ্য-মতে প্রকৃতি-পুরুষের প্রভেদ জ্ঞানে যে আত্মজ্ঞান লাভ হয় সে তপস্বীর পক্ষে সম্ভব। তাঁর নিজের প্রচারিত বেদান্ত দর্শনের ব্রহ্মজ্ঞানও অল্পবুদ্ধি মানুষকে উদ্‌ভ্রান্ত করেছে। মানুষ যাতে পরমাত্মাকে বিস্মৃত না হয় তারই জন্যে তিনি মহাভারতের বিশাল কাহিনীর মধ্যে গীতার স্থান দিলেন। বললেন, কর্মকাণ্ডে যেমন মুক্তি লাভ সম্ভব, তেমনি আত্মজ্ঞান লাভেও তা সম্ভব। আত্মা পরমাত্মারই রূপ, প্রতি আত্মায় বিশ্বাত্মা আছেন, নিজের আত্মার মধ্যেই সেই পরমাত্মার বিশ্বরূপ দর্শন সম্ভব। এই তত্ত্বকথা তিনি কৃষ্ণের মুখ দিয়ে বললেন, কৃষ্ণের আত্মায় অর্জুন বিশ্বরূপ দেখলেন। সারা জীবনের তপস্যায় দার্শনিক ঋষিরা যা দেখেছেন, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে কৃষ্ণ অর্জুনকে সেই জ্ঞান দান করলেন। এরই জন্য আত্মজ্ঞানী কৃষ্ণের উপরে দেবত্ব আরোপিত হয়েছে, সাধারণ মানুষ নির্দ্বিধায় গ্রহণ করেছে গীতার ধর্মতত্ত্ব।

তন্ত্র

তন্ত্র শাস্ত্র ও তন্ত্র মত অনেকেই খুব আধুনিক বলে মনে করেন। তাঁদের ধারণা যে ভারতে মুসলমান অধিকারের সময়ে এই সব গ্রন্থ রচিত ও

প্রচলিত হয়েছিল, অর্থাৎ তন্ত্র শাস্ত্র আধুনিক পুরাণসমূহের সমসাময়িক। কিন্তু এই ধারণা যে ভ্রান্ত তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তন্ত্র শাস্ত্রের কিছু গ্রন্থ আধুনিক কালে রচিত হলেও এই মত নিঃসন্দেহে প্রাচীন। আবার এ কথাও সত্য যে তন্ত্র শব্দটির উল্লেখ অনেক প্রাচীন গ্রন্থে নেই। অথর্ব বেদে আমরা অনেক তান্ত্রিক মন্ত্র দেখতে পাই। তবে এর থেকে বলা যায় না যে তন্ত্র মত সেই কালে প্রচলিত ছিল। বরং বলা যায় যে তন্ত্রে অথর্ব বেদের মন্ত্র গ্রহণ করা হয়েছে। নৃসিংহ তাপলি উপনিষদেও অনেক তান্ত্রিক মন্ত্র রূপান্তরিত অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়।

তন্ত্র বেদেরই একটি শাখা এবং বেদেই এর মূল নিহিত। তান্ত্রিক মন্ত্রসমূহ অথর্ব বেদ থেকেই পরিগৃহীত হয়েছে। পুরাণে যেমন নানা দেবদেবীর উপাসনা, তন্ত্রে তেমনি শক্তির উপাসনা। আদ্যাশক্তি কালী তারা মহা-বিদ্যা বা পরমপ্রকৃতি নামে শক্তি উপাসনার পদ্ধতি তন্ত্রে বিধিবদ্ধ হয়েছে। সৃষ্টি প্রলয় আশ্রমধর্ম তীর্থ মাহাত্ম্য পূজা ও মন্ত্র নির্ণয়ের কথাও তন্ত্রে আছে। কুল্লুকভট্ট মনুসংহিতার টীকায় বলেছেন যে বেদের মন্ত্রগুলি বৈদিক ও তান্ত্রিক এই দুই ভাগে বিভক্ত। বৌদ্ধ তন্ত্রে নাকি আছে যে প্রাচীন ভারতে কয়েকখানি উপতন্ত্র প্রচলিত ছিল। সেগুলি বৃহস্পতি শুক্র নারদ বশিষ্ঠ জৈমিনি বা যাজ্ঞবল্ক্যের মতো প্রাজ্ঞ ঋষিদের রচনা। এ কথা সত্য হলে মেনে নিতেই হবে যে তন্ত্র মত অন্যান্য মতের মতোই সুপ্রাচীন।

তন্ত্র সম্বন্ধে আরও একটি ধারণা জনসাধারণে প্রচলিত আছে। তন্ত্র মতে নাকি মদ্য-মাংস ও ব্যভিচারকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে। এই শাস্ত্র চিরকালই গুহ্য শাস্ত্র বলে স্বীকৃত হত বলেই এর প্রকৃত স্বরূপ অনেকেরই অবিদিত। কাজেই এই রকমের একটি ভ্রান্তধারণা প্রচলিত হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

সাধারণ ভাবে তন্ত্র শাস্ত্রকে দু ভাগে ভাগ করা যায়। যে সব তন্ত্রের বক্তা শিব, তার নাম আগম শাস্ত্র এবং ভগবতী পার্বতী যা বলেছেন তার নাম নিগম শাস্ত্র। পার্বতীর এক প্রশ্নের উত্তরে, শিব বলেছিলেন যে কলিযুগে মানুষ আচারবিহীন হলে বৈদিক ক্রিয়ায় কোনো ফল পাবে না, মোক্ষ-লাভের জন্য তখন তন্ত্র শাস্ত্রকেই গ্রহণ করতে হবে। তন্ত্রের সংখ্যা অসংখ্য,

বৌদ্ধ তন্ত্রের সংখ্যাও কম নয়। তন্ত্রমতে গুরুর কাছে মন্ত্র নিতে হবে। গুরু যে বীজমন্ত্র দেবেন, সেই মন্ত্রেই উপাসনা করতে হবে।

তান্ত্রিক অনুষ্ঠানের জন্য ন'টি আচার আছে। তার মধ্যে প্রথম হল বেদাচার। এতে নিয়ম অনুসারে নিত্যকর্ম করার বিধি। এর পরে একে একে বৈষ্ণবাচার শৈবাচার দক্ষিণাচার সিদ্ধান্তাচার বামাচার আঘোরাচার যোগাচার ও কৌলাচার। প্রথম তিনটি আচার ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের জন্য। দক্ষিণাচারে আদ্যাশক্তির পূজা, সিদ্ধান্তাচারে সাধক জ্ঞানমার্গে যাবেন। বামাচারে বামা রূপে পরাশক্তির পূজা করতে হয়। এই অবস্থায় প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির লোপ এবং অষ্টপাশ বন্ধনমোচন। অঘোরাচারে-সাম্প্র দায়িক ভেদ দূর হয়ে সংসারের ঘোর কেটে যায়। তারপর যোগচারে শুধু যোগ সাধনা। শিবের মতো শ্মশানবাসী হয়ে যোগে মগ্ন হতে হয়। সবার শেষে কৌলাচার। তখন সাধকের সোঽহং ভাব, তখন আর কোনো নিয়ম মানবার প্রয়োজন নেই, মোক্ষলাভেও কোনো বাধা নেই।

আচারের মতো তান্ত্রিকদের পশু, বার ও দিব্য এই তিনটি ভাব। মানসিক ধর্মের নামই ভাব। ষোল বছব বয়স পর্যন্ত পশুভাব, বীরভাব পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত, তারপব দিব্যভাব। মোক্ষলাভের পথে এগোবার জন্যই দিব্যভাবের প্রয়োজন।

তন্ত্রমতের আলোচনায় পঞ্চ-মকার তত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। তন্ত্রের প্রধান অঙ্গ পঞ্চ মকার—মদ্য মাংস মৎস মুদ্রা ও মৈথুন। মুদ্রা শব্দটির অর্থ এখানে টাকা মোহর বা পূজা ও নৃত্যের অঙ্গুলি বিন্যাস নয়। পঞ্চ মকারে মুদ্রাব অর্থ মদের চাট। সাধারণ অর্থে এই শব্দগুলি গৃহীত হলে এই পঞ্চমকার যে ব্যভিচারেরই নামান্তর তাতে সন্দেহ থাকে না। কিন্তু প্রকৃত অর্থ জানতে পারলে বিশ্বাস কবতে হবে যে এই পঞ্চ মকারে কঠোর যোগসাধনার কথা বলা হয়েছে। এই শব্দগুলির ব্যাখ্যা আছে কুলার্ণব তন্ত্রে। প্রথম তত্ত্ব মদ্য হল ব্রহ্মানন্দ। ব্রহ্মরন্ধ্রে অবস্থিত সহস্র কমলদল থেকে নিঃসৃত সুধার নাম মদ্য। দ্বিতীয় তত্ত্ব মাংস হল রসনা অর্থে মার অংশ বাক্য। মাংস ভক্ষণ মানে মৌনাবলম্বন, এতেই ক্ষুধাতৃষ্ণা দূর হয়। তৃতীয়

তত্ত্ব মৎস হল নিশ্বাস-প্রশ্বাস রোধ করে কুম্ভকযোগ। চতুর্থ তত্ত্ব মুদ্রায় আশা তৃষ্ণা গ্লানি ভয় ঘৃণা মান লজ্জা ও ক্রোধ এই অষ্ট মুদ্রাকে ব্রহ্ম-জ্ঞানের আগুনে পোড়ানোর কথা বলা হয়েছে। আর পঞ্চম তত্ত্ব মৈথুনে বোঝানো হয়েছে জ্ঞানের সঙ্গে ভক্তির মিলন, ব্রহ্মরন্ধ্রে অবস্থিত সহস্রারের বিন্দুর সঙ্গে কুণ্ডলিনী শক্তির মিলন। তন্ত্রে এই কঠিন যোগের কথাই বলা হয়েছে। পরীক্ষার তুষানল এর লক্ষ্য, নানা প্রলোভনে পরিবৃত হয়েও নির্লিপ্ত থাকবার শিক্ষা। যোগ শিক্ষা দেওয়াই তন্ত্রের উদ্দেশ্য।

তন্ত্রে দ্বৈত ও অদ্বৈত ভাবের প্রকাশ হয়েছে শিব ও শক্তির উপাসনায়। কখনও বা তাদের এক বলা হয়েছে—তিনি এক ও অদ্বিতীয়, তিনি সত্য ও সদ্রূপ, তিনি পরাৎপর ও স্বপ্রকাশ, তিনি সদাপূর্ণ ও সচ্চিদানন্দ।—

স এক এব সদ্রূপঃ সত্যোঽদ্বৈতঃ পরাৎপরঃ।
স্বপ্রকাশঃ সদাপূর্ণঃ সচ্চিদানন্দ লক্ষণঃ॥

যে কথা আমাদের বেদে ও উপনিষদে আছে, আছে ষড়দর্শনে, সেই কথাই আছে তন্ত্রশাস্ত্রে। সেই মহত্তত্ত্ব পরমাণু তত্ত্ব পঞ্চভূত ও স্বর্গ-নরকের কথা। তন্ত্রমতে জল থেকে যেমন বুদ্বুদ উঠে জলেই মিলিয়ে যায়, তেমনি প্রকৃতি থেকেই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়ে প্রকৃতিতেই লয়প্রাপ্ত হয়।—

প্রকৃত্যা জায়তে সর্বং প্রকৃত্যা সৃজ্যতে জগৎ।
তোয়াত্তু বুদবুদং দেবা যথা তোয়ে বিলীয়তে॥—নির্বাণ তন্ত্র।

ইহলোকে যে যেমন পাপপুণ্য করে, তার সেই মতোই স্বর্গ ও নবক ভোগ। জোঁক যেমন এক তৃণ থেকে অন্য তৃণে যায়, জীবও তেমনি এক দেহ থেকে অন্য দেহে আশ্রয় নেয়। দেহান্তরে আশ্রয় পেলেই জীব তার পুরাতন দেহ ত্যাগ করে।—

ইহ যৎ ক্রিয়তে কর্ম তৎ পরত্রোপভূজ্যতে।
জীবস্তৃণ জলৌকেব দেহদ্দেহান্তরং ব্রজেৎ॥
সংপ্রাপ্য চোত্তমং দেহং দেহং ত্যজতি পূর্বকম।

নিঃশ্রেয়স মুক্তিলাভই তন্ত্রসাধনার মুখ্য উদ্দেশ্য।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বিশ্বের অন্যান্য ধর্মমত

পার্শ্ব, মহাবীর ও জৈনধর্ম—বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম—জরথুশ্‌ত্র ও মজ্‌দা য়স্ন—
লাও-ৎস্থ ও তাওবাদ—কন্‌ফুসিয়স ও তাঁর ধর্ম—ইহুদী ও জুডা ধর্ম
—যীশুখ্রীষ্ট ও খ্রীষ্টধর্ম—হজরৎ মোহাম্মদ ও ইসলাম ধর্ম—
গুরু নানক ও শিখধর্ম।

পার্শ্ব, মহাবীর ও জৈনধর্ম

ঐতিহাসিক কালে জৈন ধর্মকে বিশ্বের প্রাচীনতম ধর্মমতগুলির অন্যতম বলা যেতে পারে। জৈন মতে চব্বিশ জন তীর্থঙ্কর এই ধর্মমত প্রচার করেন। এই দুঃখময় সংসার পার হবার জন্য যারা তীর্থ বা ঘাট নির্মাণ করেছিলেন, তাঁদেরই তীর্থঙ্কর বলা হয়। প্রথম তীর্থঙ্করের নাম আদিনাথ বা ঋষভ। ভাষাতত্ত্ব অনুসারে ঋষভ ও বৃষভ একই শব্দ। সিন্ধু উপত্যকায় ভারতের প্রাচীনতম সভ্যতার যুগে বৃষ ছিল শিবের বাহন এবং একটি পবিত্র জীব। শিব ও ঋষভ নাথ অভিন্ন কিনা তা জানা যায় না। প্রাগার্য ধর্মে শিব ও লিঙ্গপূজার সঙ্গে জৈন তীর্থঙ্কর আদিনাথঋষভ দেবের কোনো সম্পর্ক ছিল কি না তা জানবার কোনো উপায় এখন আর নেই।

আধুনিক পণ্ডিতদের মতে প্রথম বাইশজন তীর্থঙ্কর ঐতিহাসিক ব্যক্তি নন এবং জৈনধর্মের প্রাচীনত্ব প্রমাণের জন্য কাল্পনিক হওয়া অসম্ভব নয়। তাঁদের মতে পার্শ্বনাথই প্রথম জৈনধর্ম প্রচারক। জৈন শাস্ত্রানুসারে তিনি মহাবীরের প্রায় আড়াই শো বছর পূর্বে বিদ্যমান ছিলেন, অর্থাৎ তিনি খ্রীষ্টপূর্ব নয় শতকের মানুষ। এই শতকেরই গোড়ার দিকে কাশীর ক্ষত্রিয় রাজবংশে তাঁর জন্ম হয়। পিতার নাম অশ্ব সেন ও বামা তাঁর মায়ের নাম। তিনি বিবাহ করেন অযোধ্যার রাজকন্যা প্রভাবতীকে। ত্রিশ বছর

বয়সে তিনি গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং কেবলজ্ঞান বা সিদ্ধিলাভ করেন তিন মাস তপস্যার পরে। তারপর তিনি ধর্ম প্রচার করেন প্রায় সত্তর বছর।

পার্শ্ব প্রবর্তিত ধর্ম তখনও জৈনধর্ম নামে অভিহিত হয় নি। পার্শ্ব চারটি ব্রত পালনের নিয়ম প্রবর্তন করেন। তার প্রথম তিনটি হল অহিংসা, সত্যভাষণ ও অদত্ত গ্রহণ বর্জন। অর্থাৎ জীবহত্যা করা যাবে না, মিথ্যা বলা চলবে না এবং চুরি করা ছাড়তে হবে। তাঁর চতুর্থ ব্রত নিয়ে মতান্তর আছে। কেউ বলেন ব্রহ্মচর্য পালন, আবার কেউ বলেন অপরিগ্রহ, অর্থাৎ বিষয় সম্পত্তির প্রতি আসক্তি ত্যাগ। পঞ্চম ব্রতটি মহাবীর যোগ করে-ছিলেন। কেউ বলেন যে তাঁর সময়ে জৈন সম্প্রদায়ে চারিত্রিক শৈথিল্য দেখা দিয়েছিল বলে তিনি ব্রহ্মচর্য পালনের ব্রত যোগ করেছিলেন। আবার কেউ বলেন যে মহাবীর অপরিগ্রহকে ব্রত বলে স্বীকার করে পরিধেয় বস্ত্র পর্যন্ত ত্যাগ করেন। এই শেষের মতটি গ্রহণযোগ্য মনে হয় এই কারণে যে পার্শ্বের সময় নগ্নতা আদৃত হত না এবং মহাবীর নিজে বস্ত্রত্যাগের আদর্শ স্থাপন করেন।

মহাবীরের জন্ম খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের মাঝামাঝি। তাঁর পিতা সিদ্ধার্থ ছিলেন বৈশালীর অধিবাসী। ত্রিশলা তাঁর মাতার নাম। জাতিতে তাঁরা ক্ষত্রিয় ছিলেন। বর্ধমান মহাবীর প্রায় ত্রিশ বৎসর বয়সে গৃহত্যাগ করে পার্শ্ব-নাথের নির্গ্রন্থ সম্প্রদায়ে সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। দিগম্বর মতাবলম্বীরা বলেন যে তিনি বিবাহ করেন নি। কিন্তু সে যুগের ক্ষত্রিয়রা এত বয়স পর্যন্ত অবিবাহিত থাকতেন না। তাই শ্বেতাম্বর মতাবলম্বীরা বলেন যে মহাবীর যশোদা নামের এক কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁদের একটি কন্যা জন্মে, তার নাম অনুজা বা প্রিয়দর্শনা।

দিগম্বর জৈনরা মনে করেন যে সন্ন্যাস গ্রহণের পরেই মহাবীর বস্ত্রত্যাগ করেন। কিন্তু পার্শ্বনাথের সম্প্রদায়ে নগ্নতা প্রচলিত ছিল না বলে শ্বেতাম্বর জৈনরা বলেন যে এই সম্প্রদায় থেকে বেরিয়ে আসবার পরে, অর্থাৎ সন্ন্যাস গ্রহণের তের মাস পরে মহাবীর বস্ত্রত্যাগ করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে

আধুনিক ঐতিহাসিকরা অনুমান করেন যে তিনি ব্রত হিসাবে নগ্নতা গ্রহণ করেছিলেন গোশান ও আজীবিক সম্প্রদায়ের সংস্পর্শে এসে। পার্শ্বনাথের সম্প্রদায়ে এক বৎসর কাটাবার পরে একাকী ভ্রমণের সময়ে গোশানের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। গোশান ছিলেন আজীবিক সম্প্রদায়ের চতুর্থ ও শেষ তীর্থঙ্কর। গোশান ও তাঁর শিষ্যরা নগ্ন থাকতেন। তাঁদের সংস্পর্শে এসে মহাবীর বস্ত্রত্যাগ করেছিলেন ভাবলে অযৌক্তিক হবে না।

আজীবিক সম্প্রদায় আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করতেন এবং মনে করতেন যে কর্মফল অনুযায়ী মানুষের ভাগ্য নির্দিষ্ট পথে পরিচালিত হয়। তাঁরা কঠিন কৃচ্ছ্র সাধনে অভ্যস্ত ছিলেন। সম্রাট অশোক ও তাঁর পৌত্র এঁদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু জৈন ও বৌদ্ধ শাস্ত্রে এঁদের অনেক নিন্দা আছে। মহাবীর ছয় বৎসর গোশানের সঙ্গে বাস করেছিলেন বলে অনেকে মনে করেন যে তিনি গোশানের শিষ্য হয়েছিলেন। দু'জনের বিরোধের একটা কারণও অনুমান করা হয়ে থাকে। মানুষের ভাগ্য যে গোড়া থেকেই নির্দিষ্ট হয়ে থাকে, গোশানের এই বিশ্বাস বোধহয় মহাবীর মানতে পারেন নি। তিনি মনে করতেন যে পূর্বজন্মের কর্ম অনুযায়ী জীবের জন্ম হলেও সে নিজের কর্ম দ্বারা তার ভবিষ্যৎ গড়তে সক্ষম। গোশান মানুষের পুরুষকার মানতেন না বলেই মহাবীর দীর্ঘ ছয় বৎসর পর তাঁকে পরিত্যাগ করেন।

সন্ন্যাস গ্রহণের বারো বৎসর পরে মহাবীর কেবলজ্ঞান লাভ করেন পরেশনাথ পাহাড়ের নিকট এক নদীতীরে শালগাছের নিচে। তপস্যায় জয়লাভ করেছেন বলে তাঁকে জিন বলা হয়। এই জিন শব্দ থেকেই জৈন শব্দের উৎপত্তি হয়েছে।

মহাবীর নিজেকে পার্শ্বনাথের নির্গ্রন্থ সম্প্রদায়ভুক্ত মনে করতেন বলে এই সম্প্রদায়ের অনেকেই তাঁর শিষ্য হয়েছিলেন। যাঁরা তাঁর শিষ্য হয়ে বস্ত্রত্যাগ করলেন তাঁরা হলো দিগম্বর, আর যাঁরা অনগ্ন রয়ে গেলেন তাঁদের নাম হলো শ্বেতাম্বর।

মহাবীরের মূল প্রচার কেন্দ্র ছিল রাজগৃহ নালন্দা। তিনি সমগ্র বিহার ও

পশ্চিমে কৌশাম্বী পর্যন্ত পর্যটন করে নিজ ধর্মমত প্রচার করেছিলেন। বাহাত্তর বছর বয়সে বিহারের পাবায় তাঁর মৃত্যু হয়।

জৈন ধর্মে জীব, অজীব, আস্রব, বন্ধ, সংবর, নির্জরা ও মোক্ষ এই সাতটি তত্ত্ব আছে। পুণ্য ও পাপ এই দুটি তত্ত্ব সংবর ও আস্রবের অন্তর্ভুক্ত। জীব বা আত্মার অস্তিত্ব এই ধর্মের প্রথম তত্ত্ব। যার চেতনা বা জ্ঞানশক্তি নেই তা অজীব। ধর্ম অধর্ম আকাশ ও পুদ্গল অজীব। অনেকের মতে কালও অজীব। কায়বাঙ্ মনঃকর্মকে আস্রব বলে, এ হল সেই 'যোগ'। যাতে জীবে কর্ম প্রবেশ করে আর জীবের সঙ্গে পুদ্গল বা দেহের মিশ্রণ বন্ধ। কষায় মিথ্যাত্ব অবিরতি প্রমাদ ও যোগ এই সব বন্ধ হেতু। আস্রব নিরোধকে সংবর বলে এবং নির্জরা কর্মবন্ধনের আংশিক ক্ষয়ের নাম। মোক্ষ পূর্ণ কর্মক্ষয়।

জৈনরা বিশ্বাস করেন যে বন্ধ হেতুর অভাব ও নির্জরা এই দুই উপায়ে পূর্ণ কর্মক্ষয় সম্ভব। তার পূর্বেই কেবল জ্ঞানের উৎপত্তি হবে। সর্বজ্ঞতা বা সর্বদর্শিতা কেবল জ্ঞানের অর্থ। মানুষের জ্ঞান ও সত্যদৃষ্টি মোহ বা নানা কাজে আচ্ছন্ন থাকে, তার ক্ষয় হলেই কেবল জ্ঞান লাভ হয়। তখন দেহ-স্থিত আত্মা বিশ্বব্যাপী হয়।

মোক্ষর তিনটি মার্গ আছে—সম্যক্ দর্শন, সম্যক্ জ্ঞান ও সম্যক্ চারিত্র। সত্য প্রতীতিকে সম্যক্ দর্শন বলে। কোন্ তত্ত্ব গ্রহণ করতে হবে এবং কোন্ তত্ত্ব পরিত্যাগ করতে হবে, সম্যক্ দর্শনে তারই উপলব্ধি হয়। জীব অজীব প্রভৃতি সপ্ততত্ত্বের জ্ঞানকে বলে সম্যক্ জ্ঞান। রাগ দ্বেষ হিংসা প্রভৃতি রিপু ত্যাগের নাম সম্যক্ চারিত্র। এই তিন মোক্ষমার্গ অবলম্বন করে অগ্রসর হলে মোক্ষলাভ সম্ভব হয়।

জৈন মতে এই বিশ্বকে একটি নরদেহের রূপে কল্পনা করা হয়েছে। মুক্ত জীবের অধিষ্ঠান এই দেহের শীর্ষদেশে।

বর্ধমান মহাবীর যে পাঁচটি ব্রত উদ্যাপনের আদর্শ প্রচার করেছেন সেগুলি হল অহিংসা মূলত সুনৃত ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ। এই সমস্ত ব্রত কায়মন-বাক্যে পালন করতে হবে। সূনৃত শব্দটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। যে কথা শুনলে অপরের আনন্দ হয়, যে কথায় লোকের মঙ্গল ও তার পরিণাম সুন্দর

হয়, তাকেই সূনৃত বলে।—

প্রিয়ং পথ্যং বচস্তথ্যং সূনৃত ব্রতমুচ্যতে।

যজুর্বেদে একটি উপদেশ আছে।—

মা হিংসীঃ পুরুষং জগৎ।

জৈনধর্মের মূল মন্ত্র হল এই অহিংসা। যাগযজ্ঞে পশুহিংসা দেখেই বোধহয় মহাপুরুষেরা অহিংসাকে ধর্মের প্রধান অঙ্গ রূপে কল্পনা করেন। জৈন মতে অহিংসাই পরম ধর্ম।

মহাবীরের জীবদ্দশাতেই তাঁর সংঘে মতান্তর শুরু হয়েছিল। প্রাচীন নির্গ্রন্থদের বস্ত্রধারণ এবং মহাবীরের নগ্নতা নিয়েই একটি দলভেদের আশঙ্কা ছিল। অনুমান করা হয় যে খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতেই এই সংঘ দিগম্বর বা নগ্ন এবং শ্বেতাম্বর বা সিতাম্বর অর্থাৎ শ্বেতবস্ত্রধারী এই দুই প্রধান দলে বিভক্ত হয়ে যায়।

এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্ম ও দার্শনিক মত ও আচার অনুষ্ঠানের ব্যাপারে অনেক মতভেদ আছে। তাদের মধ্যে প্রধান হল—দিগম্বর মতে মহাবীরের মূর্তি নগ্ন হবে, স্ত্রী জাতি মোক্ষের অধিকারী নয়, মহাবীর বিবাহ করেন নি এবং দিগম্বর সন্ন্যাসীকে নগ্ন থাকতে হবে।

এর পরে আরও সম্প্রদায় ও উপসম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছে। হিন্দুদের মতো জৈন সম্প্রদায়েও মন্দির নির্মাণ, তীর্থঙ্করদের মূর্তিপূজা, হিন্দু দেবদেবীর পূজা, পুরোহিত প্রথা ও জাতিভেদও দেখা দিয়েছে। কিন্তু বৌদ্ধধর্মের মতো জৈনধর্মের প্রচার ভারতের বাহিরে কখনও হয় নি।

বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম

গৌতম বুদ্ধ ছিলেন বর্ধমান মহাবীরের সমসাময়িক। প্রায় একই সময়ে এই দুই মহাপুরুষ ভারতের একই অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করে দুটি বিশিষ্ট ধর্মের প্রবর্তন করেন। তার চেয়েও আশ্চর্যের বিষয় যে তাঁরা তাঁদের শেষ জীবন অতিবাহিত করেছিলেন খুব কাছাকাছি—বর্তমান পাটনা জেলার রাজগীর ও পাবাপুরীতে। তাঁদের জীবনে অনেক সাদৃশ্য আছে।

অভিজ্ঞতাও আছে, এমন কি ধর্ম প্রচারের ব্যাপারেও অনেক সাদৃশ্য দেখা গেছে।

অনুমান করা হয় যে গৌতম বুদ্ধের জন্ম খ্রীষ্টের জন্মের পাঁচ-শো সাতষট্টি বৎসর পূর্বে কপিলাবস্তুর নিকট লুম্বিনী বনে, বর্তমান নেপালের তরাই অঞ্চলে। গৌতমের পিতা শুদ্ধোদন শাক্যজাতির একজন নায়ক ছিলেন, তাঁর রাজধানী ছিল কপিলাবস্তুতে। তাঁর মাতা মায়াদেবীর মৃত্যু হয় গৌতমের শৈশবেই। তিনি বড় চিন্তাশীল ও অন্যমনস্ক ছিলেন। পিতা তাই পুত্রকে সংসারী করবার জন্য গোপার সঙ্গে বিবাহ দিয়েছিলেন। একটি পুত্রের জন্মের পরে গৌতম উনত্রিশ বৎসর বয়সে গৃহত্যাগ করেন। সংসার ত্যাগের পূর্বে মানুষের জরা ব্যাধি ও মৃত্যু দেখে তাঁর দুঃখের অন্ত ছিল না। এই দুঃখ দূর করবার উপায় অন্বেষণে তিনি দীর্ঘ ছয় বৎসর গয়ার নিকট নৈরঞ্জনা নদীর তীরে একটি বোধিবৃক্ষের ছায়ায় তপস্যা করেন। দুঃখের রহস্য আপন হৃদয়ে উপলব্ধি করে তিনি বুদ্ধ হলেন। দুঃখ দুঃখহেতু দুঃখ নিরোধ ও দুঃখ নিরোধের উপায়—এই চারটি হল আর্য-সত্য। এই দুঃখময় জগতে দুঃখের কারণ নির্ণয় করে সেই কারণকে বন্ধ করার উপায় হিসাবে বললেন, প্রবৃত্তির বিনাশে হয় নির্বাণ। আব এই নির্বাণই হল দুঃখের হেতু নিরোধের একমাত্র উপায়। তিনি যে মুক্তি মার্গের সন্ধান দিলেন তা গৃহত্যাগী ভিক্ষুর মার্গ, ব্রাহ্মণ্যধর্মের বানপ্রস্থ ও যতির মতো। বানপ্রস্থকে সর্বজনীন করার অভিপ্রায় ছিল বুদ্ধেব ধর্ম-ভাবনায়।

অনেকে মনে করেন যে চার্বাক দর্শনের সঙ্গে বৌদ্ধ দর্শনের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ এবং এইজন্যই চার্বাক দর্শনের সঙ্গেই বৌদ্ধ দর্শন আলোচিত হয়ে থাকে। অথচ এই দুই দর্শনের পার্থক্যও খুব স্পষ্ট। বৌদ্ধরা চার্বাকের মতে শুধু প্রত্যক্ষ প্রমাণই নয়, অনুমান প্রমাণও স্বীকার করেন। বুদ্ধ বলেছেন যে দুঃখেরই জন্ম জরা মৃত্যু প্রভৃতি নানা রূপ। আর রূপ, বেদনা সংজ্ঞা সংস্কার ও বিজ্ঞান—এই পঞ্চ স্কন্ধ-সমুপেত দেহই সকল দুঃখের কারণ। এই দেহ ধারণ করতে না হলেই সুখ, তারই নাম নির্বাণ। জন্ম না হলেই জরা রোগ

শোক নৈরাশ্য ও মৃত্যু নেই, অতএব দুঃখনাশের জন্য জন্ম নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন। বুদ্ধ ভাবলেন, 'কর্মই জন্মের মূল। কর্মে যে ধর্ম ও অধর্ম, তাই জন্মেব হেতু। এই কর্মের উৎপত্তি তৃষ্ণা থেকে। আর ইন্দ্রিয় থেকেই তৃষ্ণার সূচনা। ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের সন্নিকর্ষ হলে যে বেদনা সমুপস্থিত হয়, তাই তৃষ্ণার মূলে। তৃষ্ণা বা বাসনা অবিদ্যামূলক। তাই বুদ্ধ বললেন 'অবিদ্যা দূর করতে পারলে বা তৃষ্ণার উচ্ছেদ সাধন হলে জন্ম গতি রোধ হয়। সেই জন্ম রোধই নির্বাণ, তাই আত্যন্তিক দুঃখ নাশ। জন্ম না হলে তুমি আমি ভেদ থাকে না, রূপ-রসাদির বোধহয় না, আশা-নৈরাশ্যের ঘাত-প্রতিঘাতের সম্ভাবনা থাকে না। বৌদ্ধমতে কারও কোনো চেতনা নেই, কারও কোনো নিয়ামক নেই, আপনা আপনিই সকল পদার্থের সৃষ্টি হয়। সুতরাং এই মতে সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের প্রয়োজন নেই। নির্বাণ মুক্তি লাভ করতে পারলেই সব প্রয়োজন সিদ্ধ হয়।

বৌদ্ধ মতে চিত্ত ও ভূত এই দুটি হল জগতের মূল তত্ত্ব।—

ভূতং ভৌতিকং চিত্তং চৈত্তঞ্চ

এর মানে ভূত থেকে জগতের সমস্ত ভৌতিক পদার্থ ও চিত্ত থেকে সমস্ত চৈত পদার্থের উৎপত্তি হয়েছে। ক্ষিতি অপ্ তেজ ও মরুৎ এই চারটি হল ভৌতিক পদার্থ এবং এই চাব ধাতুর বা পরমাণুর সংহতি থেকেই বিশ্বের সব কিছু সৃষ্ট হয়েছে। এই চার ধাতুর আবার চার রকমের স্বভাব আছে —খর স্নেহ উষ্ণ ও গতিশীল। আকষণ বিকর্ষণ প্রভৃতিও এই স্বভাবের অন্তর্গত। চৈত পদার্থের মধ্যে আছে রূপ বিজ্ঞান বেদনা সংজ্ঞা ও সংস্কার এই পাঁচটি অবয়ব। রূপে ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ, বেদনায় সুখ-দুঃখের অনুভব, বিজ্ঞানে অহংভাব, সংজ্ঞায় ভেদভাব ও সংস্কারে ভাব। এই সংস্কারই মানুষের সমস্ত অবিদ্যার মূলে। এর থেকেই রাগ দ্বেষ প্রভৃতির জন্ম, ধর্ম অধর্ম প্রভৃতির ধারণা ও ক্ষণস্থায়ী পদার্থকে চিরস্থায়ী বলে কল্পনা। বৌদ্ধ মতে সব কিছুই ক্ষণিক দুঃখময় বিসদৃশ ও অলীক।—

সর্বং ক্ষণিকং ক্ষণিকং দুঃখং দুঃখং।
স্বলক্ষণং স্বলক্ষণং শূন্যং শূন্যং॥

বৌদ্ধমতে সৃষ্টি স্বভাবের ক্রিয়া, তাই সৃষ্টি চিরদিন সমান ভাবে চলেছে। কর্মের জন্যেই জীব সংসারে আসে, তাই কর্মের ফলভোগে বাধ্য হয়। এই কর্মেব বন্ধন ছিন্ন করে প্রজ্ঞা লাভ করতে পারলেই নির্বাণ মুক্তি। অর্থাৎ ভৌতিক পদার্থ থেকে উৎপন্ন হয়ে তাতেই লীন হয়ে যেতে হবে। বৌদ্ধরা তাই ঈশ্বরকে স্বীকার করেন না।

বেদান্তেব দার্শনিক তত্ত্বের উপরে যে বদ্ধেব ধর্মমত প্রতিষ্ঠিত তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু বেদান্তের সবটুকু তিনি গ্রহণ কবেন নি। বেদান্ত ব্রহ্মকেই শুধ্ সত্য বলে মেনেছেন, আব জগৎ বলে যা কিছু আমবা দেখছি তা সবই মিথ্যা। এই দৃশ্যমান জগৎ প্রকৃতি ও জীব যে অনিত্য ও প্রতিভাস মাত্র, এ কথা বদ্ধ মেনে নিলেন। বললেন, এবা কতগুলি ধর্ম ও সংস্কারের প্রবাহমাত্র, সর্বং অনিত্যং সর্বং শূন্যং। কিন্তু বেদান্তের ব্রহ্মকে বুদ্ধ মানলেন না। বললেন, জীবাত্মা বা পরমাত্মা বলে কোনো কিছুব অস্তিত্ব নেই। আর এরই জন্য বৈদিক ক্রিয়াকলাপের মূল্যও অস্বীকার করলেন।

বৌদ্ধ ধর্মেব মতো জৈন ধর্মের ভিত্তিও ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রসমতে। জৈনবাও বেদের অপৌরুষেয়তা জাতিভেদ ও যাগযজ্ঞের বিরোধী। তাঁরাও মনে করেন যে প্রকৃতি বা এই দৃশ্যমান জীবজগতের পিছনে কোনো আত্যন্তিক সত্য নেই। মানুষ নিজের কর্মফলের জন্যই সংসারে দুঃখ ভোগ করে এবং সর্বজীবে অহিংসা ও বিশুদ্ধ নৈতিক জীবন যাপনই মুক্তির একমাত্র উপায়। এই মুক্তির জন্য সংসার ত্যাগ করে কঠোর তপস্যার প্রয়োজন। এই সাধনার পদ্ধতিতে জৈনদের চরমপন্থী বলা যেতে পারে। বৌদ্ধদের মতো জৈনরা বিলাস ও বৈরাগ্যের মধ্যপথ অবলম্বনে বিশ্বাসী নন। অহিংসা ও সাধনার ব্যাপারে কোনো মধ্যপথ নেই। যা পালন করবাব তা কঠোব ভাবেই পালন করতে হবে।

এই দুই ধর্মমতের সঙ্গে তুলনামূলক দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সমাজের সঙ্গে জৈনদের কিছু সম্পর্ক চিরদিনই ছিল। কিন্তু বৌদ্ধরা অনেকটা দূরে সবে গিয়েছিলেন। দুঃখবাদ তাঁর ধর্ম ছিল না, সেটা তাঁর ধর্মের ভূমিকা। দুঃখকে সম্পূর্ণরূপে জয় করে চির আনন্দময় নির্বাণ

লাভের চেষ্টাই তাঁর ধর্ম। তিনি নিজে কিছু লিখে যান নি। পরবর্তী কালে শিষ্যরা তাঁর মতের ব্যাখ্যা করেন। তাতে দুটি সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। নূতন সম্প্রদায় মহাযান নাম নিয়ে পুরাতনকে হীনযান নাম দেন। নির্বাণ শব্দ-টির অর্থ নিয়েও মতভেদ হয়। কেউ বলেন যে দুঃখ জয় করতে যদি মৃত্যু-কেই বরণ করতে হয় তো আনন্দ কোথায়! আবার কেউ বলেন যে নির্বাণ মানে তো মৃত্যু নয়, নির্বাণ হল আনন্দময় চেতনা। ভিক্ষু নাগসেন গ্রীসের রাজা মিলিন্দকে নির্বাণের যে উপমা দিয়েছিলেন সেইটেই বোধহয় সব-চেয়ে সরল উপমা। রাজ্যরক্ষা রাজ্যশাসন ও প্রজানুরঞ্জনের জন্য রাজাকে যে দুঃখভোগ করতে হয়, তা রাজ্যসুখের ভূমিকামাত্র। উপসংহারটুকু সর্বতোভাবে আনন্দময়। রাজ্য পালনকে যদি দুঃখবাদ বলি, তবে নির্বাণ হল রাজ্যসুখ। ধম্মপদে নির্বাণের সংজ্ঞা কী সুন্দর! কী গভীর সেই আনন্দময় চেতনা!—

সুসুখং বত জীবাম বেরিনেসু অবেরিনো।
বেরিনেসু মনুস্সেসু বিহরাম অবেরিনো॥
সুসুখং বত জীবাম আতুরেসু অনাতুরা।
আতুরেসু মনুস্সেসু বিহরাম অনাতুরা॥
সুসুখং বত জীবাম উস্সুকেসু অনুস্সুকা।
উস্সুকেসু মনুস্সেসু বিহরাম অস্সুস্সুকা॥
সুসুখং বত জীবাম যেসং নো নত্থি কিঞ্চনং।
পীতিভক্খা ভবিস্সাম দেবা আভস্সরা যথা॥

—ধম্মপদ ১৫।১-৪

"বৈরী-জনের বৈরিতা মোরা অবৈরিতায় ঢাকি,
বৈরিতাভরা মানুষের মাঝে অবৈরী হয়ে থাকি।
তৃষিতের মাঝে বাস করি, তবু থাকি মোরা অনাতুর;
আতুর জনের মধ্যে বিরাজি তৃষ্ণা করিয়া দূর।
উদ্‌বেগভরা মানুষের মাঝে মোরা উদ্‌বেগহারা,
উদবেগহীন মোরা তারি মাঝে উদবেগে থাকে যারা।

সুখে বাস করে প্রত্যাশাহীন সতত বুদ্ধগণ,
দেবতার মতো প্রদীপ্ত থাকি তাঁরা প্রীতিভোজী হন।

অনুবাদ রামপ্রসাদ সেন।

মৈত্রী ভাবনাকে বুদ্ধ 'ব্রহ্মবিহার' বলেছেন। বলেছেন, মাতা যেমন প্রাণ দিয়েও নিজের একমাত্র পুত্রকে রক্ষা করেন, তেমনি সকল প্রাণীর প্রতি অপরিমিত প্রেম থাকবে, সবার প্রতি অপরিমিত মৈত্রীভাব থাকবে। ঊর্ধ্ব অধো ও চতুর্দিকে সমস্ত জগতের প্রতি বাধাহীন হিংসাহীন শত্রুতাহীন মানসে অপরিমিত দয়াভার থাকবে। দাঁড়াতে চলতে বসতে শুতে যতক্ষণ জেগে থাকবে ততক্ষণ এই মৈত্রী ভাব অধিষ্ঠিত থাকবে। এরই নাম ব্রহ্ম-বিহার।—

মাতা যথা নিজং পুত্তং আয়ুসা একপুত্তমনুরক্খে।
এবংপি সর্ব্বভূতেষু মানসং ভাবয়ে অপরিমাণং॥
মেত্তঞ্চ সর্ব্বলোকস্মিং মানসম্ভাবয়ে অপরিমাণং।
ঊর্দ্ধং অধোচ তিরিয়ঞ্চ অসংবাধং অবেরমসপত্তং॥
তিট্ঠঞ্চরং নিসিন্নো বা সয়ানো বা যাবতস্স বিগতমিদ্ধো।
এতং সতিং অধিট্ঠেয্য ব্রহ্মমেতং বিহারমিধমাহু॥

—সুত্তনিপাত ১।৮।৭

দীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে বুদ্ধ তাঁর বাণী প্রচার করলেও তাঁর জীবদ্দশায় কোনোকিছু লিপিবদ্ধ হয় নি। তাঁর মৃত্যুর পরে বৌদ্ধ আচার্যরা তাঁর ধর্মমতকে হীনযান ও মহাযান নামে দুই সম্প্রদায়ে ভাগ করেন। আচাব ব্যবহারের অনৈক্যের জন্য দুশো বছরের মধ্যেই বৌদ্ধ সংঘে আঠারোটি শাখার সৃষ্টি হয়েছিল। প্রথমে এগুলিকে স্থবির বা থেরবাদী এবং আচার্য বা আচারিয়বাদী নামে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়। আচার্যদের মধ্যে মহাসাংঘিক নামে একটি সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। এই সম্প্রদায় থেকেই যখন মহাযান সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়, তখন প্রাচীন থেরবাদীর নাম দেওয়া হয় হীনযান।

হীনযান মতে শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান ও তপস্যা করে নির্বাণ লাভ করা যায়।

মহাযান মতে বুদ্ধত্ব লাভ না হলে সঠিক মুক্তি হয় না ; তাই তারা নির্বাণের বদলে বুদ্ধত্ব লাভ করতে চান এবং বুদ্ধের জন্মান্তরের জীবন অনুসরণ করেন। খ্রীষ্টীয় অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে মহাযান সম্প্রদায়ে মন্ত্র মুদ্রা মণ্ডল ও নানা রকমের তান্ত্রিক ক্রিয়া কর্ম প্রবেশ করে এক নূতন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। এর নাম হয় বজ্রযান। এও আবার কয়েকটি শাখায় বিভক্ত হয় ; তাদের মধ্যে প্রধান হন সহজযান ও কালচক্রযান।

মহাযানীরা মনে করেন যে হীনযান নিম্নাধিকারীর নিকটে বুদ্ধ কথিত অপূর্ণ সত্য ; নিজেদের পথকেই তাঁরা একমাত্র পথ মনে করেন। এঁরা ভক্তিবাদী ; বুদ্ধকেই ঈশ্বর জ্ঞানে পূজা করেন।

জরথুশ্‌ত্র ও মজ্‌দা য়স্ন

পাশ্চাত্য মতে খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক জরথুশ্‌ত্রের কাল মনে করা হয়। জনথোস নামে একজন গ্রীক ৪৭০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে লিখেছিলেন যে ইনি ট্রয় যুদ্ধের ছশো বছর পূর্বে জীবিত ছিলেন। আরিস্টটল তাঁকে প্লেটোর ছ হাজার বছর আগের লোক মনে করতেন। আবার প্লিনি বলেছেন যে জরথুশ্‌ত্রের কাল হল ট্রয় যুদ্ধের পাঁচ হাজার বছর পূর্বে। অন্য মতে তিনি ৫৫০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দের মানুষ। কিন্তু ধর্মশাস্ত্রের পর্যালোচনা করে আধুনিক পণ্ডিতরা স্থির করেছেন যে জরথুশ্‌ত্রের কাল হল খ্রীষ্টের এক হাজার বৎসর পূর্বে। তাঁর রচিত গাথার ভাষার সঙ্গে বৈদিক ঋষিদের উপনিষদের ভাষার সম্বন্ধ লক্ষ্য করে জরথুশ্‌ত্রকে খ্রীষ্টপূর্ব ১০০০ বৎসরেরও পূর্বের মানুষ বলে অনুমান করা হয়।

জরথুশ্‌ত্র নামের নানা অর্থ করা হয়ে থাকে। শাস্ত্র গ্রন্থে একাধিক জরথুশ্‌ত্রের উল্লেখ দেখে অনেকে মনে করেন যে বয়সে ও জ্ঞানে যে বৃদ্ধ ও সর্বপ্রধান, সেকালে তাঁকেই এই নামে অভিহিত করা হত। জরথ মানে সুবর্ণময় বা উজ্জ্বল এবং উষ্‌ত্র মানে উষার কিরণ, অর্থাৎ যিনি উজ্জ্বল জ্ঞানের অধিকারী বা তত্ত্বজ্ঞানী, তিনিই জরথুশ্‌ত্র। পাশ্চাত্য দেশে ইনি জোরো আস্তের নামে পরিচিত। এটি মূল ইরানী শব্দের গ্রীক রূপান্তর।

আস্তের অর্থ তারা, তাই তাঁর নাম জ্ঞান বা জ্যোতির দ্যোতক। কিন্তু তাঁর পিতা মাতার নাম জানলে অন্য সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয়। তাঁর পিতার নাম পৌরুষস্‌পা বা পুরু অশ্ব, মাতার নাম দুঘ্‌দ্‌ হ্বো বা দুগ্ধবতী গো, পত্নীর নাম হ্বোস্বো বা গবী। এইসব দেখে তাঁদের পরিবারকে কৃষিজাবী মনে করা হয় এবং জরথুশ্‌ত্র শব্দের অর্থ করা হয় জরদ্‌ উষ্ট্র, অর্থাৎ যার বুড়ো উট আছে।

তাঁর জন্মস্থান নিয়ে কোনো বিতর্ক নেই। তিনি জন্মেছিলেন পশ্চিম ইরানের মিডিয়া বা মদ প্রদেশে একটি রাজবংশজাত পরিবারে। শৈশবে গোত্র অনুসারে তাঁর নাম ছিল স্পিতম। পনর বৎসর বয়সে তিনি গৃহত্যাগ করে উশিদারায়ণ পর্বতে যান তপস্যার জন্য এবং দীর্ঘ পনর বৎসর তপস্যা করেন। ত্রিশ বৎসর বয়সে তিনি সিদ্ধিলাভ করেন, ঈশ্বর অহুর-মজ্‌দা তাঁর সামনে আত্মপ্রকাশ করেন বলে বিশ্বাস করা হয়। তারপর তিনি তাঁর তপস্যালব্ধ তত্ত্বজ্ঞান প্রচারের চেষ্টা করে দার্ঘ দিন নির্যাতন সহ্য করেন। বিয়াল্লিশ বৎসর বয়সে তিনি পূর্ব ইরানের বাক্‌ট্রিয়া বা বাহ্লীক প্রদেশে পালিয়ে গিয়ে রাজদরবারে আশ্রয় নেন এবং রাজা ও রানার অনুগ্রহে দার্ঘ পঁয়ত্রিশ বছর সে দেশে নিজের নূতন ধর্ম প্রচার করেন। যখন তাঁর সাতাত্তর বছর বয়স তখন এক ধর্মান্ধ তুরানা তাকে বাল্‌খ বা বাহ্লীকের অগ্নিমন্দিরে হত্যা করে। তার তিন পুত্র ও তিন কন্যার মধ্যে জ্যেষ্ঠপুত্র মগ এই ধর্মের পুরোহিত সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন।

এই পারসীক ধর্মের আদি নাম মজ্‌দা য়স্ন। জরথুশ্‌ত্র এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন। তিনি একেশ্বরবাদী ছিলেন এবং পারসীক মতে তিনিই জগতে সর্বপ্রথম ঈশ্বরবাদ প্রচার করেন। মানব জাবনের নৈতিক দায়িত্বের কথাও জনসমাজে তিনি প্রথম প্রচার করেন। ইন্দো-ইরানায় আর্যরা সূর্য চন্দ্র অগ্নি প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তির উপর দেবত্ব আরোপ করে তাদের পূজা করত। ক্রমে ক্রমে এই পূজায় ও যজ্ঞে পশুবলি ও নানা কুসংস্কার ঢুকে পড়ে। এই সব দেখে জরথুশ্‌ত্র বলেন যে অহুর মজ্‌দা বা অসুর মেধস্‌ একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, শক্তি ও জ্ঞানময় ঈশ্বর এবং সমস্ত প্রাকৃতিক

শক্তি ও বস্তু তাঁরই নিয়মের অধীন। এই ঈশ্বর মানুষকে চিন্তার শক্তি দিয়েছেন। শক্তি দু রকমের—স্পেন্ত মইন্যু হল শুদ্ধ শক্তি এবং অন্ত্র মইন্যু হল অসৎ শক্তি। এই শক্তির একটিকে গ্রহণ করতে হবে। যাঁরা সৎপথে চলবেন তাঁদের ছটি আধ্যাত্মিক আদর্শ অবলম্বন করতে হবে। এগুলি হল শ্রেষ্ঠ মনন, সত্য বা সততা, দৈবশক্তি, ভক্তি অর্থাৎ ঈশ্বরে অনুরাগ, পরিপূর্ণতা ও অমৃতত্ব। মানুষ এরই সাধনা করবে এবং পালন করবে তিনটি নীতি—শুভ মনন, শুভ কথন ও শুভ কর্ম। এই আদর্শে জীবন যাপন করলে মৃত্যুর পরে তার আত্মা স্বর্গে যাবে, আর অন্যথায় ভোগ করবে নরকের শাস্তি। যুগ বা কালচক্রের আবর্তনের শেষে আত্মার পুনর্জন্ম হয়। পরবর্তী যুগেও মানুষের সত্য পথ নির্দেশের জন্য অন্য এক ত্রাণকর্তার আবির্ভাব হয়। মজ্‌দা য়স্ন ধর্মের স্বর্গ ও নরকের এই কল্পনা মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য ধর্মেও অনুপ্রবেশ করে—প্রথমে ইহুদী ধর্মে ও পরে খ্রীষ্ট ও ইসলাম ধর্মেও। অহুর মাজ্‌দার প্রসাদে প্রাপ্ত ধর্মবিশ্বাস জরথুশ্‌ত্র পাঁচটি গাথা বা আধ্যাত্মিক জিজ্ঞাসা ও উপলব্ধির বাণীতে প্রকাশ করেন। এরই একটি গাথায় আছে যে মৃত্যুর পরে মানুষের আত্মাকে একটি সেতুর উপর দিয়ে ঈশ্বরের বিচারের জন্য যেতে হয়। ঈশ্বরের বিচারের কথা ও সেতুর কল্পনা অন্য ধর্মেও আছে।

জরথুশ্‌ত্রের ধর্ম যারা গ্রহণ করল তাদের বলা হল মজ্‌দা-য়স্নান্ এবং যারা পুরাতন প্রথায় প্রাকৃতিক শক্তি পূজা নিয়ে রইল তাদের বলা হল দএব য়স্নান্ বা দেবপূজক। শেষ পর্যন্ত দেবপূজক ভারতীয় আর্য ও অসুর মতাবলম্বী পারসীক আর্যরা বিবাদে লিপ্ত হয়ে ভিন্ন হয়ে গেল। মজ্‌দা ধর্মের অনুষ্ঠানে মূর্তিপূজা বলিদান বা যাগযজ্ঞাদি কর্মকাণ্ডের কোনো স্থান রইল না।

জরথুশ্‌ত্র ছিলেন দ্বৈতবাদী। প্রাকৃত ও আধ্যাত্মিক জগতের দুটি মূল কারণ তিনি স্বীকার করেছিলেন। মন বাক ও কর্ম—এই তিনের উপরে তাঁর ধর্ম প্রতিষ্ঠিত। তাঁর একেশ্বরবাদের মূল তত্ত্ব সমস্ত বিশ্বের আধ্যাত্মিক চেতনাকে প্রভাবান্বিত করে।

জরথুশ্ত্র আতর মন্দির স্থাপন করেন। আতর সংস্কৃত অথর বা অর্থবান শব্দের অর্থ অগ্নি। অগ্নির প্রহরীদের আথ্রবান বা অর্থবান নাম দেওয়া হয়। জরথুশ্ত্র তাঁর গাথায় প্রাচীন আর্য দেবদেবীর কোনো উল্লেখ করেন নি। পরবর্তী কালে মগ পুরোহিতরা দেবদূত নামে প্রাচীন দেবদেবীকে প্রতীকরূপে গ্রহণ করেন। কিন্তু মূর্তিপূজা বা বলিদানাদি কর্মকাণ্ডের পুনরায় প্রচলন করেন নি।

ঋষি জরথুশ্ত্রের সময়ের প্রাচীন ইরানীয় ধর্মগ্রন্থ ও তার ভাষার নাম এখন জানা যায় না। তাঁর মৃত্যুর দেড় হাজার বছর পরে অথ্রবান বা পুরোহিতেরা তাঁর ভাষা ও ধর্মগ্রন্থের নাম দেন অবেস্তা বা আবেস্তা। এর সঙ্গে ঋগ্বেদের সংস্কৃত ভাষার খুবই সাদৃশ্য বর্তমান। অবেস্তা সাহিত্য পশ্চিম এশিয়ায় আর্যদের শ্রেষ্ঠ অবদান। কবি ফিরদৌসী রচিত শাহ্‌নামা কাব্যে প্রাক্-মুসলমান যুগের যে সব উপাখ্যান আছে, তার কয়েকটির প্রাচীন রূপ অবেস্তায় পাওয়া যায়।

জরথুশ্ত্রর স্বরচিত গাথাগুলি অবেস্তার প্রধান অংশ। জরথুশ্ত্র যখন প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে মনে করেছিলেন যে তিনি মজ্দার সম্মুখীন হয়েছেন, তখন তিনি তাঁকে নানা প্রশ্ন করেছিলেন এবং উত্তরও পেয়েছিলেন। সেই সব প্রশ্নোত্তর কাব্যমণ্ডিত ভাষায় তিনি লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন। তাঁর ধর্মের মূল কথা আছে এই সব গাথায়।

লাও-ৎস্থ ও তাও

প্রথমেই বলা দরকার যে লাও-ৎস্থ তাও ধর্মের জন্মদাতা নন। তাঁর জন্মের বহু আগে থেকেই এই ধর্ম চীন দেশে বিদ্যমান ছিল। খ্রীষ্টের জন্মের এক হাজার বছর আগে থেকেই চীনে অধ্যাত্মচিন্তার প্রচলন ছিল। ঐতিহাসিক প্রমাণে দেখা যায় যে একাদশ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে চীনে যে জ্ঞান চর্চা আরম্ভ হয় তাতে নীতি ও পারমার্থিক বিষয় অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই দার্শনিক মতবাদ বিশ্বের প্রাচীনতম অধ্যাত্ম চিন্তার অন্যতম। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে লাও-ৎস্থ জন্মগ্রহণ করেন উত্তর চীনে। তিনি ঋষিকল্প ব্যক্তি

ছিলেন এবং তাঁর সময়ে প্রচলিত চিন্তা ভাবনাকে নিজের ভাবধারায় সাজিয়ে একখানি গ্রন্থ সংকলন করেন। তিনি এই গ্রন্থের নাম দেন তাও-তে কিঙ বা তাও-তে চিঙ। এই গ্রন্থে একাশিটি ছোট ছোট পরিচ্ছেদ আছে এবং এই সংকলনটিই তাওবাদের আদি গ্রন্থ।

তাও শব্দটি একটি সুন্দর অর্থব্যঞ্জক। যার সাহায্যে আদি বা লক্ষ্যে পৌঁছনো যায়, সেই পথ বা মার্গকে তাও বলে। কিন্তু সাধারণ পথকে তাও বলে না, এ হলো ধর্মের পথ বা দেবতা যে পথের নির্দেশ দিয়েছেন সেই পথ। জীব জগৎ ও তাদের বিবর্তন ও পুরুষার্থ বিষয়ে যে সব ধারণা বা মত প্রচলিত ছিল, সেই মতবাদই লাও-ৎসু নূতন রূপে তাঁর তাও-তে কিং গ্রন্থে সংকলিত করেন। এর পূর্বে এ রকমের সুসংবদ্ধ কোনো গ্রন্থ ছিল না বলে অনেকেই তাঁকে তাওবাদের প্রবর্তক বলে থাকেন।

লাও-ৎসু যে মত ব্যক্ত করেছেন তাতে সকল গুণের অতীত ও অনির্বচনীয় এক সত্তাকে তাও বলা হয়েছে। ইনি রূপ রস গন্ধ স্পর্শের অতীত এক নিরাকার শক্তি। তাঁরই সাকার প্রকাশ ঈশ্বর। এই তাওকে লাভের উপায়ও তিনি বলেছেন। মানুষকে শিশুর মতো সরল হতে হবে। তার জন্য সযত্নে পরিহার করতে হবে বিত্ত ও সম্পদের লোভ ও পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার। তারপরে ধর্মাচরণে মনোনিবেশ করতে হবে। নিষ্কাম ধর্মাচরণে জ্ঞান লাভ হয়। সেই জ্ঞানে তাওকেও জানা যায় এবং তাঁর সঙ্গে একাত্ম হওয়াও সম্ভব।

হিন্দু উপনিষদে ঋত শব্দটি যে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, কতকটা সেই রকমেরই গূঢ় অর্থে তাও শব্দের ব্যবহার। তাও এমন একটি শাশ্বত সত্য পথ, যে পথে বিশ্বের সব শক্তি উৎসারিত হচ্ছে—বিশ্বের সব প্রয়াসের মূলে নিহিত এক অদৃশ্য শক্তি। সমস্ত প্রাকৃতিক আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক ব্যাপারও এই পথে পরিচালিত হচ্ছে। অথচ তাও নিজে অব্যক্ত অরূপ এবং সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অগোচর। ইনি অনাদি অনন্ত শাশ্বত ভূমা ও অপরিবর্তনীয়। ইনিই বিশ্বের মূল কারণ, বিশ্বের আধার ও বিশ্বের চিৎ শক্তি। বিশ্ব সৃষ্টিতে ব্যক্ত হয়েও ইনি বিশ্ব-নিরপেক্ষ ধর্ম বা ঋত।

তাওবাদ প্রবর্তনকারী লাও-ৎস্থ কন্‌ফুশিয়সের চেয়ে বয়সে কিছু বড় হলেও দু'জনে সমসাময়িক ছিলেন। কন্‌ফুশিয়স যে আচরণবিধি প্রবর্তন করেন তা চীনের জনসাধারণকে ব্যবহারনিষ্ঠ করেছিল। কিন্তু তাতে দার্শনিক চিন্তা ভাবনা বা অধ্যাত্মবাদ ছিল না। এ বিষয়ে তাও অনেক পরিণত দার্শনিক চিন্তার ফসল এবং অধ্যাত্মিক চেতনার বিকশিত সম্পদ। তাওবাদকে পণ্ডিতরা দার্শনিক অতীন্দ্রিয় বলে অভিহিত করেছেন।

লাও-ৎস্থর এই মতবাদ পরবর্তী তিন চার শো বছর পর্যন্ত একই রূপে প্রচলিত ছিল। এই সময়ের মধ্যে কন্‌ফুশিয়সের মতবাদও প্রসার লাভ করে এবং ভারত থেকে বৌদ্ধধর্মও চীনদেশে প্রচারিত হয়। চীনের সম্রাটরা এক এক সময়ে এক এক ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। ফলে এই সব মতবাদের অনেক কিছু পরিবর্তিত হয়ে যায়। সবচেয়ে বেশি পাল্টেছে তাওবাদ ও বৌদ্ধধর্ম। এক সময়ে তাওবাদ যখন একটি ধর্মমতে রূপান্তরিত হয় তখন দেখা যায় যে এর মধ্যে জাদুবিদ্যা, যৌনাচার ও নানা কুসংস্কারও ঢুকে পড়েছে।

তাও তে চিং গ্রন্থে আছে যে ঘরের দরজার বাইরে পা না দিয়েও বিশ্বের কোথায় কী হচ্ছে জানা সম্ভব। জানালা দিয়ে বাইরে না তাকিয়েও স্বর্গের তাও দেখা যায়।

আর এক জায়গায় আছে যে অসন্তোষের চেয়ে বড় শাপ আর নেই এবং পাওয়ার তৃষ্ণার চেয়ে বড় পাপ আর নেই। কাজেই যে নিজের সন্তুষ্টিতেও সন্তুষ্ট তার সন্তুষ্টির অভাব কোনো দিন হয় না।

এই গ্রন্থেই লাও-ৎস্থ অলস সরকারের কথাও লিখেছেন। তিনি বলেছেন যে সরকার অলস ও বোকা হলে জনসাধারণ নষ্ট হয় না। কিন্তু সরকার সক্ষম ও তৎপর হলে তারা অসুখী হয়।

এ রকমের নানা চিন্তা ভাবনার কথায় এই গ্রন্থটি পূর্ণ। শোনা যায় যে কামরূপের রাজা ভাস্করবর্মার অনুরোধে সপ্তম শতাব্দীর শেষের দিকে এই গ্রন্থের সংস্কৃত অনুবাদ তাঁর কাছে পাঠানো হয়। এই তথ্য চীনের

ঐতিহাসিকদের লেখা থেকে জানা গেছে, কিন্তু সে অনুবাদ এ দেশে পাওয়া যায় নি।

কন্‌ফুশিয়স ও তাঁর ধর্ম

কন্‌ফুশিয়স ৫৫১ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে জন্মগ্রহণ করেছিলেন চীনদেশে। কন্‌ফুশিয়স তাঁর চীনা নাম নয়, তাঁর পারিবারিক নাম ছিল খুঙ এবং নিজের নাম খুঙ-ফূ-ৎসে। ফূ-ৎসে মানে শিক্ষক। শিক্ষক খুঙ। লাতিনে এই নাম কন্‌ফুশিয়স হয়েছে এবং এখন তিনি এই নামেই প্রসিদ্ধ।

চীনদেশে তখন বিশৃঙ্খলার অন্ত নেই। প্রাচীন সামন্ততন্ত্র ভেঙে পড়ছে বলে দেশব্যাপী অরাজকতা, আইনশৃঙ্খলার অভাব ও দুর্নীতি। জনসাধারণের দুর্দশা চরমে পৌঁছেছে। কন্‌ফুশিয়সের শৈশব কেটেছে কঠিন দারিদ্র্যের মধ্যে, নিজের চেষ্টায় তিনি শিক্ষালাভ করেছেন। তাঁর মনে হয়েছে যে মানুষের সমস্ত দুঃখের মূলে আছে দেশ শাসনের ব্যর্থতা, সমাজ ব্যবস্থায় নতুন ব্যবস্থার সন্ধান দিতে হবে। কন্‌ফুশিয়স এই কাজেই নিজেকে নিযুক্ত করলেন।

তিনি ঈশ্বরের চিন্তা করেন নি, তপস্যা করে আধ্যাত্মিক জ্ঞান সঞ্চয়ের চেষ্টাও করেন নি। জীবনের অভিজ্ঞতায় তিনি মনে করেছিলেন যে জন-সাধারণের দুঃখ দূর করতে হলে অনাবশ্যক যুদ্ধবিগ্রহ পরিত্যাগ করতে হবে। প্রজাদের গুরু করভার থেকে মুক্তি দিতে হবে এবং দেশে প্রচলিত নিষ্ঠুর শাস্তির ব্যবস্থার অবসান ঘটাতে হবে। তিনি ভেবেছিলেন যে যোগ্য রাজপদে অধিষ্ঠিত হতে পারলে তিনি এই সব কাজ করতে পারবেন। তাই একটি সম্মানের পদে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু কিছু দিন কাজ করবার পরেই বুঝতে পারলেন যে প্রকৃতপক্ষে তাঁর কোনো ক্ষমতাই নেই এবং এইভাবে জনগণের দুঃখ মোচন সম্ভব নয়। তিনি পদত্যাগ করলেন। তারপর দেশের নানা স্থানে ঘুরে নিজের মত প্রচার করে বেড়াতে লাগলেন।

তিনি ভেবেছিলেন যে জনগণের দুঃখ দুর্দশা দূর করতে হলে তাদের নৈতিক চরিত্র গঠনই হবে প্রথম কাজ। এর জন্য তিনি বললেন, সবার

প্রতি কর্তব্য পালন ও সবাইকে ভালবাসা, এই দুটি গুণের উপরেই সমাজের উন্নতি নির্ভর করবে। এই দুটিকে তিনি আবার পাঁচ ভাগে ভাগ করলেন —রাজা ও প্রজার কর্তব্য, পিতা মাতা ও সন্তানের কর্তব্য, স্বামী স্ত্রীর কর্তব্য, জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠের কর্তব্য এবং বন্ধুর প্রতি বন্ধুর কর্তব্য। এই-গুলিকে তিনি প্রাকৃতিক নিয়ম ও ঐতিহাসিক নজির দিয়ে দেখালেন। কিন্তু দেখা গেল যে কয়েকজন শিষ্য ছাড়া আর কেউ তাঁর মত মেনে নিল না। তাঁর শিষ্যরা তিনি বৃদ্ধ হয়েছেন দেখে তাঁকে তাঁর নিজের অঞ্চল লু-তে ফিরিয়ে আনেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কন্‌ফুশিয়স তাঁর বিশ্বাসের কথা প্রচার করে যান। তাঁর মৃত্যু হয় একাত্তর বৎসর বয়সে ৪৭৮ কিংবা ৪৭৯ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে।

এর প্রায় দু শতাব্দী পরে জনগণ তাঁর মতের পরামর্শ বুঝতে পারে এবং ক্রমেই তাঁর মতবাদ চারিদিকে প্রসার লাভ করে।

কন্‌ফুশিয়সের ধর্ম চিন্তায় আমরা ঈশ্বরকে পাই না। কোনো অতি-প্রাকৃতের স্থান নেই তাঁর চিন্তাধারায়। তিনি শুধু মানুষের সম্বন্ধেই ভেবেছিলেন এবং শিক্ষাকে সমাজ সংস্কারের কাজে লাগাবার চেষ্টা করেছিলেন। কথোপকথনের মাধ্যমে তিনি শিক্ষা দিতেন, নীতিজ্ঞান দিতেন ছাত্রদের। তিনি মনে করতেন যে চরিত্রে কৃত্রিমতা বা দুর্বলতা আদর্শ ছাত্র হবার পক্ষে অন্তরায়। নীতিজ্ঞান না জন্মালে কেউ পূর্ণাঙ্গ মানুষ হবার যোগ্য হয় না। তিনি দেশের ইতিহাস শিক্ষার ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন এবং কাব্য ও সঙ্গীত শিক্ষায় উৎসাহ দিতেন।

নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে তিনি বুঝেছিলেন যে মানুষই সব। মানুষকে জানাই জ্ঞান, মানুষকে ভালবাসলেই পুণ্য, মানুষের দুঃখ দূর করাই ধর্ম। এ ছাড়া অন্য কোনো তত্ত্বে তাঁর বিশ্বাস ছিল না। তিনি একান্ত ভাবেই মানুষকে নিয়েই একটা বাস্তববাদী নীতি শাস্ত্র রচনা করেছিলেন, আর রাষ্ট্রনীতিকে এর প্রয়োগ ক্ষেত্র ভেবেছিলেন। বিশ্বের সব মানুষকে এক পরিবারভুক্ত ভাবতে হবে। যখন তা পারবে, তখনই সুখী হবে মানুষ। তাঁর মতে জীবনের পরম প্রাপ্তি এই পৃথিবীতেই পাওয়া যাবে, আর

পাওয়া যাবে মানুষের মধ্যেই। এর জন্য স্বর্গ বা অন্য কোনো কল্পনার আশ্রয় নেবার প্রয়োজন নেই।

এই মতবাদ প্রমাণ করবার জন্য তিনি অনেক প্রাচীন কাহিনী থেকে উদাহরণ আহরণ করেন। মানুষ যখন সৎ ও কর্তব্যপরায়ণ ছিল, তখন পৃথিবীতে ছিল এক স্বর্ণযুগ। এই সব কথা তিনি ইয়ু কিং, শু কিং, শি কিং প্রভৃতি নামের পাঁচখানি গ্রন্থে সংকলন করে গেছেন। তাঁর কথামৃত আছে টা-হ্সিও নামে একখানি গ্রন্থে।

অনেকে অবশ্য মনে করেন যে কন্‌ফুশিয়স এই সব গ্রন্থ রচনা বা সংকলন করেন নি। তাঁর শিষ্যরা এই কাজ করেছেন। পরবর্তীকালে এও মনে করা হতো যে তিনি ইতিহাস সংখ্যা ধনুর্বিদ্যা রথবিদ্যা সঙ্গীত ও উৎসব এই ছটি অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে আবদ্ধ বিদ্যা সমাজ সংস্কারের জন্য জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করে গিয়েছিলেন। আজ আমরা যা কনফুশি-য়সের মতবাদ বলে জানি, তা রূপ পেয়েছিল তাঁর মৃত্যুর পরে। চীনের মতো একটি বিশাল দেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতি তাঁর দার্শনিক মতেই প্রভাবিত হয়েছিল।

ইহুদী ও জুডা ধর্ম

জুডা ধর্ম পৃথিবীর প্রাচীনতম ধর্মমতগুলির অন্যতম এবং পরবর্তীকালে এই অঞ্চলের অন্যান্য ধর্মকে গভীর ভাবে প্রভাবিত করেছিল। বর্তমান বিশ্বের অর্ধেকেরও বেশি অধিবাসী খ্রীষ্ট ও ইসলাম ধর্ম অনুসরণ করছে। এই দুই ধর্মে জুডা ধর্মের প্রভাব কতখানি তা অনেকেই জানেন। এই ধর্মের ওল্ড টেস্টামেণ্ট খ্রীষ্ট ধর্মের বাইবেলের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে যাদের এই ধর্ম সেই ইহুদী জাতি খ্রীষ্টানদের দ্বারা চিরকাল নিপীড়িত হয়েছে। তাদের নিজেদের কোনো দেশ ছিল না, দেশে দেশে তারা নিগৃহীত হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে অর্থাৎ ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে নাৎসি নেতা হিটলার তাঁর দেশ জার্মানীতে পঞ্চাশ থেকে ষাট লক্ষ ইহুদী পুরুষ নারী বৃদ্ধ ও শিশুকে গ্যাস চেম্বারে ঢুকিয়ে হত্যা করে-

ছিলেন। কিন্তু এদের উপরে এই নৃশংস অত্যাচার কেন চলেছিল, তা জানতে হলে ইহুদী জাতির ইতিহাস জানতে হবে।

পাঁচ হাজার বছর আগেও ইহুদী জাতির অস্তিত্বের কথা জানা যায়। এরা ছিল প্রাচীন সেমেটিক জাতির অন্তর্গত এবং প্রকৃতিতে যাযাবর। এদের ভাষা ছিল হিব্রু, তাই এদের হিব্রু জাতিও বলা হতো। সে যুগে তারা মরু-ভূমির দেবতা জিহোভার আরাধনা করত নানা অনুষ্ঠান করে।

ইহুদীদের ইতিহাসে আদি পিতামাতার নাম আদম ও ঈভ। ইহুদীরা যখন ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস নদীর উপত্যকায় মেসোপটেমিয়ায় বাস করত. তখন এই সব কাহিনী প্রচলিত হয়। তাদের আদি পুরুষের নাম আব্রাহাম, হিব্রু জাতির জনক বলে তিনি পরিচিত। তাঁকে পাওয়া যায় নোয়ার জলপ্লাবনের পরে। তিনিই বাইবেলের প্রথম ও প্রধান চরিত্র। এঁরা প্রথমে ক্যাল্‌দিন প্রদেশের উর অঞ্চলে এসে বাস করতেন, পরে এঁরা কনান দেশে চলে আসেন। বছরখানেকের জন্য দামাস্কাসের দিকে গেলেও ঈশ্বরের স্বপ্নাদেশ পেয়ে আব্রাহাম আবার কনান দেশে ফিরে এসে বিচ্ছিন্ন যাযাবর উপজাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করেন। তাঁর ও তাঁর পরবর্তী পরিবারবর্গের কাহিনী বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টে সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। এই সব কাহিনী ইহুদী ও খ্রীষ্টান ধর্মের প্রথম শিক্ষা রূপে কয়েক শতাব্দী আদৃত হয়েছে। এই কনান দেশই পরবর্তীকালে প্যালেস্টাইন নামে পরিচিত হয়েছিল।

এর পরে ইহুদীরা দীর্ঘকাল ইজিপ্টে দাসত্ব করে। তারপর বিদ্রোহ করে তারা মোজেসের নেতৃত্বে ইজিপ্ট ত্যাগ করে। বাইবেলে এই ঘটনার নাম এক্সোডাস। আব্রাহাম যে কাজ সম্পূর্ণ করতে পারেন নি, মোজেস তাই করলেন—ইহুদীদের সংঘবদ্ধ করলেন। বাইবেলে তাঁকে আইন কর্তা বলা হলো, তাঁর দশটি নির্দেশ বা Ten Commandments নতুন এক নীতি-মালা। তাঁর নেতৃত্বে হিব্রু ধর্ম-বিশ্বাসের বনিয়াদ পত্তন হলো। প্রকৃত পক্ষে তিনিই যে হিব্রু জাতির জনক তাতে কোনো সন্দেহ রইল না।

ইহুদীদের ইতিহাস বেঁচে থাকার জন্য নিরন্তর সংগ্রামের ইতিহাস। যে

ইতিহাসের আলোচনা এখানে অবান্তর। ধর্মমতে একটা বিরাট অগ্রগতির পরিচয় পাওয়া যায় খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় আটশো বছর আগে। সেই সময়ে নেভিম বা ভবিষৎ-বক্তা Prophetরা দুটি বিপ্লবাত্মক মত প্রচার করেন। তার একটি হলো, জিহোভা কোনো উপজাতি সম্প্রদায়ের দেবতা নন, তিনি সমগ্র মানব জাতির একমাত্র দেবতা। আর দ্বিতীয় মতটি হলো, জিহোভা তাঁর আরাধনাকারীদের কাছে কোনো অনুষ্ঠান চান না। তিনি চান যে সকলে ধর্ম-জীবন যাপন করুক। এ কথা একেবারে নূতন না হলেও এমন জোরালো ভাবে বলা হলো যে সবাই একে নূতন মত বলে ভাবল। দুশো বছরের মধ্যে এই ধর্ম ভবিষ্যৎ-বক্তার ধর্ম রূপে চিহ্নিত হয়ে গেল। এই ধর্মকে যথাযথ রূপ দেবার জন্য পুরোহিতরা আবার ক্ষমতায় ফিরে এলো। তারা তাদের পুরাতন অনুষ্ঠান ও নূতন আদর্শের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য একটি গ্রন্ত রচনা করল। এর নাম The Book of Deuteronomy। এর রচনা কাল ৬২১ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ। এই ঘটনার ছত্রিশ বছর পরেই ইহুদীরা নির্বাসিত হলো ব্যাবিলোনিয়ায়। ব্যাবিলোনিয়ায় তখন পুরোহিতদের অসম্ভব প্রাধান্য। নূতন ভাবের সঙ্গে আদান-প্রদানে জড়া ধর্ম একটা স্থায়ী রূপ ধারণ করল।

ইহুদীদের ধর্মশাস্ত্র এক সময়ে একত্র সংকলিত হলো। তার তিনটি প্রধান অধ্যায়—তোরা বা Law, নেভিম বা Prophets এবং কেতুবিম বা Writings. পরবর্তীকালে খ্রীষ্টানরা এই গ্রন্থেরই নাম দিয়েছিল Old Testament. কিন্তু ইহুদীরা একে বলে Tanak এবং অপেক্ষাকৃত অপ্রধান শাস্ত্র সংগ্রহের নাম Apocrypha। পরিশেষে Talmud নামে একটি মূল্যবান গ্রন্থ রচিত হয়। এটিও ইহুদীদের একটি পবিত্র গ্রন্থ। এই সমস্ত শাস্ত্র গ্রন্থে ধর্ম জীবন যাপনের উপরেই অশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

এই ইহুদী সমাজেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন যীশু খ্রীষ্ট। তাঁর জীবদ্দশায় তিনি Jeshu of Nazareth নামে পরিচিত ছিলেন। এখন তিনি Jesus Christ নামে অভিহিত। ইহুদীরা বিশ্বাস করত যে মানুষের

উদ্ধারের জন্য একজন পরিত্রাতার বা Messishর জন্ম হবে। কিন্তু যীশুকে তারা পরিত্রাতা বলে মেনে নিতে রাজী হয় নি। খ্রীষ্টানরা তাই ইহুদীদের চিরশত্রু। ১২৩৯ খ্রীষ্টাব্দে খ্রীষ্টান ধর্মগুরু পোপ নবম গ্রেগরী ইহুদীদের যীশু খ্রীষ্টধর্ম বিরোধী আখ্যা দিয়ে তাদের আক্রমণ করেন এবং তাদের সমস্ত শাস্ত্রগ্রন্থ পুড়িয়ে ফেলার আদেশ দেন। এই আদেশে ইহুদীদের প্রচুর ক্ষতি হয়। দেশে দেশে তারা নির্যাতিত। নানা দেশ থেকে তারা বিতাড়িত। কালো মানুষের প্রতি সাদা মানুষের যেমন ঘৃণা, তেমনি ঘৃণা জুডা ধর্মের প্রতি খ্রীষ্টানদের।

এই দেশহীন যাযাবার ইহুদী জাতি সারা বিশ্বে গৃহহীন হয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল কেন, সে সম্বন্ধে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে। যীশু খ্রীষ্টকে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করার জন্য কার্তফিলাস নামে একজন ইহুদী রাজ-প্রাসাদ রক্ষী তাঁকে নিয়ে যাচ্ছিল। সে তাঁর ঘাড়ে আঘাত করে ধাক্কা দিয়ে বলেছিল, ‘দেরি করছ কেন, তাড়াতাড়ি চল!’ এর উত্তরে যীশুখ্রীষ্ট বলেছিলেন, ‘আমি এইখানে দাঁড়িয়ে চিরশান্তি লাভ করব, কিন্তু শেষ-দিন পর্যন্ত তোমাকে এই ভাবেই ঘুরে বেড়াতে হবে।’ এই অভিসম্পাতের জন্যই ইহুদীরা দেশহীন গৃহহীন যাযাবর জাতিতে পরিণত হয়েছে। অবশ্য সম্প্রতি তারা ইজরায়েলকে নিজেদের দেশে পরিণত করেছে।

ইহুদীরা একেশ্বরবাদী। তাদের বিশ্বাস যে ঈশ্বরই সৃষ্টিকর্তা ও তিনিই জগৎ শাসন করেন। তিনি তাদের একমাত্র ঈশ্বর আছেন ও চিরকাল থাকবেন। ঈশ্বর অব্যয় অক্ষয় ও নিরাকার, সমস্ত পদার্থের তিনি আদি ও অন্ত। তিনিই একমাত্র পূজ্য। প্রকৃত ধর্মশাস্ত্র হলো বাইবেলের Old Testament। সমস্ত ভবিষ্যৎবক্তা বা Prophetদের মধ্যে মুসা বা Mosesই শ্রেষ্ঠ এবং ঈশ্বর তাঁকে যে বিধির উপদেশ দিয়েছিলেন সেই বিধিই সবাইকে মানতে হবে। এই বিধির কোনো পরিবর্তন হবে না। ঈশ্বর সব মানুষকে জানেন এবং তাদের সব কিছু বুঝতে পারেন। ঈশ্বর ন্যায়ের পুরস্কার ও অন্যায়ের দণ্ড বিধান করবেন। ঈশ্বরের অবতার বা Messiahর জন্ম এখনও হয় নি। সময় হলে তিনি তাদের মধ্যেই জন্মগ্রহণ করবেন।

মৃতরা সেদিন কবর থেকে উঠে তাঁর স্তব করবে।

ইহুদীদের আচার্য নেই, যজ্ঞবেদী বা কোনো ধর্মানুষ্ঠান নেই। তারা বিশ্বাস করে যে মুসার বিধি মেনে চলাই ধর্ম, কৃত পাপের জন্য সরল মনে অনুতাপেই প্রায়শ্চিত্ত হয়। পাপপুণ্য তারা মেনে নিয়েছে। বিশ্বাস করে যে পুণ্যাত্মারা পবিত্রলোকে যায়। কবরে পড়ে থাকে পাপাত্মারা। জীবাত্মার দেহান্তর গ্রহণেও তারা বিশ্বাস করে।

হিন্দুদের মতো ইহুদীরা শুধু নিজেদের মধ্যেই ধর্ম প্রচার করে। মানুষকে ধর্মান্তরিত করায় তাদের বিশ্বাস নেই। তাই এই ধর্মে বিশ্বাসী মানুষের সংখ্যা বিশ্বের বিপুল জনসংখ্যার তুলনায় নিতান্তই নগণ্য। তবু এই ধর্ম আপন মহিমায় আজও ভাস্বর হয়ে আছে।

যীশু খ্রীষ্ট ও খ্রীষ্টধর্ম

বর্তমান বিশ্বের বেশির ভাগ অধিবাসী খ্রীষ্টধর্মে বিশ্বাসী। এই ধর্মের প্রবর্তক যীশু খ্রীষ্টের জন্ম হয়েছিল প্রায় দু হাজার বছর পূর্বে জেরুসালেমের নিকট বেথ্‌লেহেমে। জাতিতে তিনি ইহুদী ছিলেন। হিব্রু ভাষায় তাঁর যীহোশুয়া নামের অর্থ ঈশ্বরই ত্রাণকর্তা। তাঁর জননী মেরি বা মারীয়া চিরকুমারী রূপে স্বীকৃত। খ্রীষ্ট ধর্মগ্রন্থ বাইবেল থেকে জানা যায় যে মেরী যখন নাজারেথের যোসেফের সঙ্গে বাগদত্তা তখন এক স্বর্গদূতের নিকট জানতে পারেন যে তিনি ঈশ্বর পুত্রের জননী হতে চলেছেন। বিবাহের পূর্বেই তিনি যীশুকে গর্ভে ধারণ করেন। হিব্রু ভাষায় মেরীর নাম মিরিয়ম, তৎকালে মরিয়ম বলা হতো। এই শব্দের অর্থ মহীয়সী, ভদ্রমহিলা বা রাজকুমারী। মেরীর স্বামী যোসেফ গ্রামে ছুতোর মিস্ত্রীর কাজ করতেন এবং প্রথম জীবনে যীশুও এই কাজ করেছেন।

সাতাশ বছর বয়সে তিনি তাঁর বাণী প্রথম প্রচার করেন। তিনি জেরুসালেমে এবং গালিলোয় ও যুদেয়ার নানা স্থানে ইহুদীদের নিকট প্রচার করেন যে তারা যে Kingdom of Heaven বা স্বর্গীয় রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি পেয়েছে তা সার্থক হতে আর দেরি নেই। তিনি বললেন যে

শুধু ইহুদী নয় বিশ্বের সকল মানুষ এই রাজ্যে এসে নবজীবন লাভ করুক।

২৭ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিক থেকে ৩০ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিক পর্যন্ত যীশু যে বাণী প্রচার করেছিলেন, তার মূল কথা হলো—সকল মানুষের পিতা ঈশ্বর ক্ষমাশীল ও পরম করুণাময়, মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগ করলেই তাঁর সেবা করা হয়। হিংসা অহঙ্কার ও ভোগের স্পৃহা ত্যাগ করে শিশুর মতো সরল ও পবিত্র মনে পরমপিতা ঈশ্বরে নির্ভর করতে হবে ; সংকীর্ণতা ও স্বার্থপরতা ত্যাগ করে পবিত্র আত্মার প্রেরণায় চলতে হবে।

বহু দিন থেকেই ইহুদীদের মধ্যে একটি ধারণা প্রচলিত ছিল। সেই ধারণা এই বিশ্বাসে পরিণত হয়েছিল যে ঈশ্বর তাদের জন্য একজন মুক্তি-দাতা বা মসীহ পাঠাবেন। যীশুকেই অনেকে এই মুক্তিদাতা রূপে মেনে নিল। তারা ভাবল যে যীশুকেই ঈশ্বর বিশ্বের ত্রাণকর্তা রূপে প্রেরণ করেছেন। এই বিশ্বাসের জন্য তারা খ্রীষ্টান বলে অভিহিত হলো। তারা বলতে লাগল যে যীশুই ঈশ্বর পুত্র বা God-man.

কিন্তু সে সময়ের প্রতিপত্তিশালী ইহুদী যাজক সম্প্রদায় এই কথা মানলেন না। যীশুর বাণী তাঁরা গ্রহণ না করে তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করলেন। তাঁর প্রাণনাশের জন্য বিদেশী শাসনকর্তার হাতে তারা যীশুকে সমর্পণ করলেন। জীবনের শেষ কয়েক দিন যীশুকে অনেক লাঞ্ছনা ও নির্যাতন সহ্য করতে হয় এবং শেষ পর্যন্ত তিরিশ বছর বয়সে অর্থাৎ ৩০ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই এপ্রিল শুক্রবার জেরুসালেমের এক প্রান্তে ক্রুশ বিদ্ধ হয়ে তাঁকে মরতে হয়।

যীশুর আধ্যাত্মিক বাণী ইহুদী জনসাধারণ গ্রহণ করতে পারে নি। তাই যীশুর মৃত্যুতেই তাঁর প্রচারিত ধর্ম লুপ্ত হয়ে যেত। কিন্তু তাঁর অনুগামী খ্রীষ্টানরা বললো যে যীশু মৃত্যুকে জয় করেছেন। একটি উদ্যানের মধ্যে তাঁর মৃতদেহ সমাধিস্থ করা হয়েছিল। দু দিন পর রবিবারেই তিনি পুনরুত্থান করেন এবং তাঁর শিষ্যদের অনেক বার দর্শন দিয়ে চল্লিশ দিন

পরে সশরীরে স্বর্গারোহণ করেন।

এই অলৌকিক ঘটনায় বিশ্বাস করেছিল বহু অশিক্ষিত দরিদ্র দুর্দশাগ্রস্ত ইহুদী। কিন্তু তাতেও এই ধর্ম বেশি দিন বাঁচত না। সেণ্ট্ পল নামে একজন শিক্ষিত ও বিচক্ষণ ইহুদী যীশুর ধর্মতত্ত্বের সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা করে এই ধর্মকে জনপ্রিয় করে তোলেন। তিনি বলেন যে বিশ্বের মানুষ একটি জীবন্ত দেহের মতো, সবাই পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত। প্রথম মানুষ আদমের পাপের জন্যই মানুষের মধ্যে পাপ ও মৃত্যু প্রবেশ করেছে এবং তার আধ্যাত্মিক জীবন কলুষিত করেছে। তবু মানুষের মনে মুক্তির বাসনা আছে এবং তার জন্য পথের অন্বেষণ করে চলেছে। এই পথ দেখাবার জন্য ঈশ্বর তাঁর পুত্র যীশুকে পাঠিয়েছিলেন। যীশু একাধারে ঈশ্বর ও প্রকৃত মানুষ। যারা তাঁকে গ্রহণ করেছে, তিনি তাঁদের ঈশ্বরের সন্তান হবার অধিকার দিয়েছেন। প্রথম মানুষ যে পাপ করেছিল, সেই পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য তিনি নিজের প্রাণ উৎসর্গ করেছিলেন। যীশু শুধু মহাপুরুষ বা উপদেষ্টা নন, তিনি নব জীবনের উৎস। মানব জাতি দেহ, তিনি এই দেহের মস্তক। এই মস্তকের সঙ্গে যুক্ত থাকলেই দেহের সারা অঙ্গে প্রাণ-চাঞ্চল্য স্পন্দিত হতে থাকবে। তাঁর প্রবর্তিত সংস্কার বা ধর্মানুষ্ঠানে তারই সঙ্গে সংযোগ স্থাপিত হয়। বিশ্বের সমস্ত জাতি যখন যীশুর আশ্রয়ে ঐশরাজ্যে মিলিত হবে, তখনই তার পরিত্রাণের কাজ শেষ হবে। ঈশ্বরের সঙ্গে সেদিন বিশ্বের মানুষের হবে পুনর্মিলন।

খ্রীষ্ট শব্দটি গ্রীক, তার অর্থ ঈশ্বর যাকে অভিষিক্ত করেছেন। যীশুকে ঈশ্বর অভিষেক করেছেন বলে তিনি যীশু খ্রীষ্ট। হিব্রু ভাষায় বলে মসীহ। মানুষের মুক্তির জন্য যীশুর মৃত্যুবরণ ও তাঁর পুনরুত্থান খ্রীষ্ট ধর্মের ভিত্তি ও তাঁর ঈশ্বরত্বের প্রমাণ স্বরূপ। খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীরা এই কথা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন। এপ্রিল মাসের শুক্রবারে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল বলে প্রতি বৎসর গুড ফ্রাইডে ও তাঁর পুনরুত্থানের দিন ঈষ্টার সান্‌ডে পালিত হয়। প্রতি রবিবার গির্জায় সমবেত হয়ে তারা যীশুর পুনরুত্থানের দিনটি স্মরণ করে।

যীশু তাঁর শিষ্যদের বলেছিলেন যে দেশ দেশান্তরে গিয়ে তারা যেন বিশ্বের সমস্ত জাতির সব মানুষের নিকট তাঁর বাণী প্রচার করেন এবং তাঁর প্রতি বিশ্বাসী মানুষকে দীক্ষা স্নান করেন। এই নির্দেশ পাবার পরে তাঁর ইহুদী শিষ্যরা প্রথমে ইহুদী সমাজে ও পরে সব ধর্মের মানুষের মধ্যে খ্রীষ্ট ধর্ম প্রচার করে তাদের দীক্ষাস্নাত করতে থাকেন। অতীতে খ্রীষ্ট ধর্মীরা অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি একটা অশ্রদ্ধা প্রকাশ করতেন। কাল-ক্রমে এই মনোভাব দূর হয়েছে। এখন তাঁরা মনে করেন যে যীশু খ্রীষ্ট সমগ্র মানব জাতির পরিত্রাণের জন্য অবতীর্ণ হয়েছিলেন এবং তাঁকে না জেনে ও তাঁর ধর্ম গ্রহণ না করেও তাঁর কৃপালাভ করতে পারে। যুগে যুগে মহাপুরুষেরা জন্মেছেন এই পৃথিবীতে, নানা ভাবে তাঁরা ঈশ্বরের সন্ধান করেছেন, আধ্যাত্মিক জীবন যাপনের জন্য নানা উপদেশ দিয়ে গেছেন। সকলেই বিশ্বাস করেছেন যে ধর্ম মত যাই হোক না কেন, ভক্তি ও আন্তরিকতায় ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ অসম্ভব নয়। খ্রীষ্ট ধর্মেও এই কথা মেনে নেওয়া হয়েছে। যীশু নিজেই বলেছেন, আমি শাস্ত্র ও ঋষিদের আদেশ লোপ করতে আসি নি, এসেছি সম্পূর্ণ করতে।

জুডা ধর্মের মতো খ্রীষ্ট ধর্মেও ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ রূপে মেনে নেওয়া হয়েছে। কেউ কোনো সন্দেহ প্রকাশ করেন নি। ইহুদীরা বিশ্বাস করে যে তাদের সমাজে এক পরিত্রাতা বা মসীহ জন্মগ্রহণ করবেন। কিন্তু যীশুকে তারা ঈশ্বরের পুত্র মসীহ বলে মেনে নিতে পারে নি। খ্রীষ্টধর্মীরা এই কথা মেনে নিয়েছে। তারা বিশ্বাস করেছে যে যীশু খ্রীষ্টকে অবলম্বন করেই তারা মুক্তি লাভ করবে।

ইহুদীদের ধর্মশাস্ত্র খ্রীষ্টধর্মে পরিত্যক্ত হয় নি। খ্রীষ্টানদের বাইবেলের প্রথমাংশ পূর্ববিধান বা Old Testament ইহুদী ধর্মেরই গ্রন্থ। এই অংশ যীশুর জন্মের চৌদ্দশো থেকে একশো বছর পূর্বে রচিত হয়েছিল। বাইবেলের শেষাংশ নব বিধান বা New Testament যীশুর জন্মের পরে প্রথম খ্রীষ্টাব্দের শেষার্ধে রচিত হয়েছে। আয়তনে নববিধান পূর্ব-বিধানের এক চতুর্থাংশ মাত্র। খ্রীষ্টানরা সমগ্র বাইবেল গ্রন্থই ঈশ্বরের

বাণী বলে স্বীকার করেন। প্রাচীন ঋষিরা ও যীশুর শিষ্যরা ঈশ্বরের অনুপ্রেরণাতেই এর এক এক অংশ দীর্ঘ দিনের ব্যবধানে রচনা করেছিলেন। পূর্ববিধানে হিব্রু ভাষায় লিখিত ইহুদীদের আটত্রিশটি শ্রুতি গ্রন্থ এবং সাতটি গ্রীক ভাষায় লেখা গ্রন্থ সংগৃহীত হয়েছে। এর মূল কথা হলো তাদের পরিত্রাণের ইতিহাস। প্রথম মানুষ আদমের আদি পাপের পরে ঈশ্বর একজন পরিত্রাতা প্রেরণের কথা বলেছেন। পূর্ব বিধানে এই আশার কথা। যীশু এলেন পরিত্রাতা রূপে। নববিধানে সেই আদর্শের কথা।

বর্তমানে খ্রীষ্টধর্মেও দলভেদ আছে। প্রধান তিনটি দল হলো রোমান ক্যাথলিক, প্রটেস্টাণ্ট ও ঈষ্টার্ন চার্চ। ধর্মের মূল কথায় কোনো মতান্তর নেই। যেমন, সকলেই খ্রীষ্টকে প্রভু ও পরিত্রাতা বলে মানেন, বাইবেলকেই শাস্ত্র গ্রন্থ বলে স্বীকার করেন, দীক্ষাস্নান বা Baptism-কে সকলেই প্রথম ধর্মসংস্কার ও খ্রীষ্টের অনুষ্ঠিত প্রভুর ভোজ বা Lord's Supper ধর্মের সবচেয়ে পবিত্র অনুষ্ঠান বলে মানেন এবং ঈশ্বরকে ত্রিব্যক্তিময় Trinity বলে উপাসনা করেন। পিতা পুত্র ও আত্মা তার ব্যক্তিগত ভেদ—পিতা হলেন সৃষ্টিকর্তা বা বিধাতা, পুত্র হলেন শাশ্বত বাক্ বা বাণী এবং পরমাত্মা অনন্ত প্রেম। খ্রীষ্টানদের দলভেদ অন্য কারণে—খ্রীষ্টমণ্ডলীর পরিচালনার ব্যবস্থা, মণ্ডলীর সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্ক, ধর্মানুষ্ঠানের রীতি নীতি, বাইবেল ব্যাখ্যার অধিকার প্রভৃতি নিয়েই এই সব দলের মতভেদ। তাতে খ্রীষ্টধর্মের মহিমা ক্ষুণ্ণ হয়েছে বলে মনে হয় না

হজরত মোহাম্মদ ও ইসলাম ধর্ম

'অনন্ত করুণাময়, পরমদয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (আরম্ভ করছি)—সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ্‌রই প্রাপ্য, যিনি অনন্ত করুণাময়, পরমদয়ালু, (যিনি) কর্মফল দিবসের প্রভু, আমরা কেবল আপনারই উপাসনা করি এবং আপনারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি, আমাদের সরল সঠিক (সত্য) পথে চালিত করুন, তাদের পথে—যাদের আপনি অনুগ্রহ দান করেছেন, যারা আপনার ক্রোধে পড়ে নি এবং বিপথে যায় নি।

(হে প্রভু ! আমাদের এ প্রার্থনা গ্রহণ করুন !)

এই প্রার্থনা ইসলাম ধর্মের পবিত্র গ্রন্থ কোরআনের মূল, সূরা ফাতিহা। এটি অনুবাদ করেছেন মাওলানা মোবারক করীম জওহর। এই সূরায় সমগ্র কোরআনের বিষয়-বস্তুর ইঙ্গিত পাওয়া যায় বলে একে উম্মুল কোরআন বা কোরআনের জননী বলা হয়। এই সুরায় সব সময়ে প্রার্থনার উপযোগী সাতটি বাক্য আছে বলে একে সাবউল-মাসানাও বলা হয়। প্রতি নামাজের প্রতি রে'কাতে এই সূরা পাঠ করার বিধি।

এই প্রার্থনা মন্ত্র থেকেই স্পষ্ট বোঝা যাবে যে ঈশ্বরে অপরিসীম বিশ্বাস ইসলাম ধর্মের মূল কথা। তাঁর নাম আল্লাহ্। খ্রীষ্টের জন্মের ছ শো বছর পরে এই ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়। যিনি এই ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা তাঁর নাম হজরত মোহাম্মদ। পৃথিবীর যে অঞ্চলে জুডা ধর্ম প্রচলিত ছিল এবং পরবর্তীকালে যীশুর জন্মের পরে খ্রীষ্টধর্ম প্রবর্তিত হয়, সেই অঞ্চলেই ইসলাম ধর্মের বিকাশ হয়েছে। আরব দেশের মক্কায় ৫৭০ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে অগস্ট হজরত মোহাম্মদের জন্ম হয়েছিল। তাঁর জন্মের পূর্বেই তাঁর পিতা আবদুল্লার মৃত্যু হয় এবং তিনি তাঁর মা আমিনাকে হারান মাত্র পাঁচ বছর বয়সে। তার-পরের তিন বছর পিতামহর নিকট এবং তাঁর মৃত্যুর পরে আত্মীয় আবু তালিবের নিকট তিনি বড় হয়ে ওঠেন।

চল্লিশ বছর বয়স হবার পর তিনি মক্কা থেকে তিন মাইল দূরে হেরা পর্ব-তের এক গুহায় ধ্যানমগ্ন হন এবং এইখানেই তিনি প্রথম বাণী প্রাপ্ত হন। সেই দিনটি ছিল ৬১০ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে জুলাই সোমবার। আর এর পর থেকেই তিনি তাঁর ধর্ম মত প্রচার করতে আরম্ভ করেন।

কিন্তু বারো বছর ধর্ম প্রচারের পর তিনি মক্কায় তাঁর জীবন বিপন্ন বোধ করেন। তাই তিনি ইয়াথ্রিব নামে এক প্রতিবেশী-নগরে চলে আসেন। দশ বছর পরে ৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি দেহরক্ষা করেন। সেই প্রাচীন ইয়াথ্রিব শহর এখন মেদিনা নামে ইসলাম ধর্মের একটি পবিত্র তীর্থ রূপে গণ্য হয়েছে।

হজরত মোহাম্মদের মৃত্যুর দু বছর আগেই ইসলাম ধর্ম আরবের জাতীয়

ধর্মে পরিণত হয় এবং ধীরে ধীরে এশিয়া আফ্রিকা ও ইয়োরোপের নানা স্থানে প্রসারিত হতে থাকে। ইসলাম ধর্ম এখন বিশ্বের প্রধান ধর্মগুলির অন্যতম।

এই ধর্ম সম্বন্ধে নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচায লিখেছেন, 'ধর্মমত হিসাবে ইসলাম প্রগতিশীল। ইসলামী একেশ্বরবাদী তত্ত্বের মধ্যে সাম্যনীতি নিহিত। ঈশ্বর যদি এক হন এবং তিনি যদি সকল মানুষকে সৃষ্টি করে থাকেন, তাহলে তাঁর কাছে সকলেই সমান। এ ক্ষেত্রে প্রত্যেক মানুষ প্রত্যেক মানুষের সমান—এই থেকেই মিল্লাৎ বা বিশ্ব-মুসলিম ভ্রাতৃত্বের ধারণা গড়ে উঠেছে। স্বাভাবিক ভাবেই, ইসলাম ধর্মে কোনো সঙ্কীর্ণ শাসকগোষ্ঠী বা পুরোহিত গোষ্ঠীর স্থান নেই। জ্ঞান, কর্ম আর ভক্তি—এই তিনটি মূল তত্ত্বের উপর ইসলাম ধর্ম প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহ্-র প্রতি পরম নির্ভরতাই মানুষের একমাত্র কর্তব্য। আরবী আবদুল শব্দটির অর্থ : নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে ঈশ্বরের সেবকে রূপান্তরিত করা।

আল্লাহ্ বিশ্বস্রষ্টা ; তিনি একই সঙ্গে বিশ্বময় এবং বিশ্বাতীত। তিনি দৃষ্টির অতীত, কিন্তু তৎসত্ত্বেও সর্বদা স্মরণীয়। তাঁকে স্মরণ করলে তিনি সাড়া দেন। এই স্মরণকে বলা হয় জিকর এবং একাগ্র ভাবে তাঁকে যিনি স্মরণ করেন তিনি মজজুব—তাঁর সামনে আল্লাহ্-র মহিমার প্রকাশ ঘটে। ইসলামে আল্লাহ্ ছাড়াও তাঁর প্রেরিত পুরুষ বর্তমান। আল্লাহ্-র মহিমা উপলব্ধির জন্য তাঁর নির্দিষ্ট পথ এবং নিয়মাবলী প্রয়োজন। মুহম্মদ সেই প্রেরিত মানুষ। আল্লাহ্র গুণাবলী অন্য কোনো কিছুর উপর আরোপ করা যায় না, এই গুণাবলী একমাত্র তাঁর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

কোরানের মারেফাতে এলাহী বা তত্ত্বজ্ঞানের মূল কথা হচ্ছে আল্লাহ্কে পেতে গেলে প্রথমেই তাঁর নাম তসবী (জপ) করতে হবে। সুরা-বকর-এ বলা হয়েছে, আল্লাহ্ বিশ্বাসীদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং অভিভাবক। তাদের তিনি অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে আসেন। এই জ্যোতি বা আলোককে কোরানে 'নূর' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। 'তলমূল মা' আদ বা পরলোক-তত্ত্বের মূল কথা এই যে, দেহের বিনাশের সঙ্গে আত্মার বিনাশ হয় না।

জন্মান্তরবাদ কোরানে স্বীকৃত নয়, কিন্তু সেখানে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র নির্দেশ মানুষকে নিজ কর্মের ফলাফল ভোগ করতে হবে। আল্লাহ্‌-রপ্রতি, তাঁর সমস্ত সৃষ্টির প্রতি, এবং নিজের প্রতি মানুষের যে কর্তব্য আছে, তা যথার্থ ভাবে সম্পাদন করার নাম এবাদত। কোরানে বলা হয়েছে, মানুষ ইচ্ছা তথা শক্তি-শূণ্য অচল জড় পদার্থের মতো সম্পূর্ণ অক্ষম নয়, আবার সে সর্বশক্তিমান এবং সম্পূর্ণ স্বাধীনও নয়। তার শক্তি আছে, কিন্তু তা সীমাবদ্ধ ; জ্ঞান আছে, কিন্তু তা আচ্ছাদিত ; ইচ্ছা আছে, কিন্তু তা রিপু আর প্রবৃত্তির প্রভাবে আবিষ্ট। তাই তার জ্ঞান, শক্তি আর ইচ্ছার সার্থকতার জন্য সে আল্লাহ্‌-র উপর একান্ত ভাবেই নির্ভরশীল।'

কোরআন শরীফ ইসলাম ধর্মের পবিত্র গ্রন্থ। এই গ্রন্থ সম্বন্ধে মাওলানা মোবারক, করীম জওহর লিখেছেন, 'কোরআন শরীফ ; আল্লাহ্‌-র বাণীর সংকলন গ্রন্থ। এ কোনো মানুষের রচনা নয়—স্বয়ং আল্লাহ্‌-ই এই গ্রন্থের রচয়িতা। দেবদূত হজরত জিব্রাঈল (আঃ) আল্লাহ্‌-ব নিকট হতে বাণী নিয়ে শেষ নবী হজরত মোহাম্মদ (দঃ)-এর নিকট তা পৌছে দিতেন। ...হজরত মোহাম্মদ (দঃ) ইন্তেকালেব নয় দিন পূব পযন্ত আল্লাহ-ব প্রত্যাদেশ লাভ করতে থাকেন। আল্লাহ-র ওহী বা প্রত্যাদেশ বাণীব সমষ্টিকে কোরআন শরীফ বলা হয়।...

কোরআন শরীফ একদিনে অবতীর্ণ হয় নি—এটি হজরত মোহাম্মদেব (দঃ) নিকট দীর্ঘ তেইশ বছর ধরে বিভিন্ন সময়ে ও স্থানে, সমস্যাসঙ্কুল নানান পরিস্থিতিতে অবতীর্ণ হয়েছে। যখনই কোনো সূরা বা আয়াত হজরত মোহাম্মদের (দঃ) নিকট অবতীর্ণ হতো, হজরত (দঃ) তৎক্ষণাৎ উপস্থিত সাহাবাদের (শিষ্যদের) লিখে রাখতে ও মুখস্থ করে নিতে বলতেন। সাহাবাগণ সঙ্গে সঙ্গে তা কণ্ঠস্থ করে ফেলতেন। তখনকার পুরুষ ও নারীগণ পরম আগ্রহের সাথে কোরআন মুখস্থ করে রাখতেন। এ ছাড়া হজরতের (দঃ) স্বীয় তত্ত্বাবধানে কোরআনের আয়াতগুলি কাগজাভাবে (সেকালে কাগজ সহজলভ্য ছিল না) হাড় চামড়া ও পাথরের উপর এবং বিশেষভাবে তৈরি রেশমের কাপড়ের উপর লিপিবদ্ধ করিয়ে রাখতেন।...

সুদীর্ঘ তেইশ বছর ধরে বিভিন্ন পরিবেশ ও পরিস্থিতির পটভূমিকায় আল্লাহ্-র নির্দেশসমূহ পর্যায় ক্রমে অবতীর্ণ হয়েছে। একটি মানুষের জীবনে চলার পথে যা কিছু প্রয়োজন, সমাজ জীবনে যা কিছু অপরিহার্য কোরআন শরীফে সে সকল সমস্যার উল্লেখ আছে ও তার সুন্দর সমাধানের ইঙ্গিত আছে। মানব জীবনের এমন কোনো দিক নেই, যেখানে কোরআন আলোকপাত করে নি। মানুষের ধর্মীয় জীবন কেমন হবে, কোন্ পথে গেলে অধ্যাত্ম জীবনের চরমোন্নতি সম্ভব, সমাজ জীবনে মানুষ কেমন ভাবে চলবে, এতিম-অনাথদের সঙ্গে কেমন ভাবে ব্যবহার করবে, মানুষ আত্মীয়-স্বজন পিতা-পুত্র-মাতার মধ্যকার সম্পর্ক কেমন হবে, কোন্ নীতি অনুসরণ করে আমরা ব্যবসা-বাণিজ্য করব, কি ভাবে আমরা দান-খয়রাত করব, কি ভাবে আমরা আমাদের উপার্জিত অর্থ ব্যয় করব, কি ভাবে অপরাধীদের সাজা দেবো, দাম্পত্য জীবন কেমন হবে, সম্পত্তির উত্তরাধিকারী কে হবে, কে কতটুকু অংশ পাবে, ভিন্ন সম্প্রদায়ের সঙ্গে মুসলমানদের ব্যবহার কেমন হবে, মৃত্যু কি, মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থা কি হবে, কবর সংক্রান্ত ব্যাপারের বর্ণনা, ইত্যাদি ইত্যাদি। পার্থিব এবং পারলৌকিক জীবনের এমন কোনো সমস্যা নেই যার উল্লেখ এবং সমাধান কোরআন শরীফে নেই। পৃথিবীর কোনো গ্রন্থ আজ পর্যন্ত এমন বিস্তৃত এবং বিশাল পটভূমিকায় লিখিত হয় নি। ভাবতে অবাক লাগে এমন একটি সুসম্পূর্ণ সংবিধান হাতে থাকতে কেন আমরা ভুল পথে চলি? কেন আমাদের মাঝে এত হানাহানি ও অশান্তি?'

অন্যান্য ধর্মের মতো ইসলাম ধর্মেও কিছু সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছে। হজরত মোহাম্মদের প্রত্যক্ষ সাহচর্য যাঁরা পান নি, তাঁরা ঈশ্বরের প্রকৃতি ও মানুষ ও জড়-জগতের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নিয়ে নানা প্রশ্ন তোলেন। প্রথমে এঁদের তাবেয়ীন বলা হতো, পরে এঁরাও দু ভাগে বিভক্ত হন। যাঁরা ঈশ্বরের শাশ্বত নিয়ন্ত্রণে বিশ্বাসী, তাঁরা হলেন জবরীয়া; এবং যাঁরা মানুষের ইচ্ছার স্বাধীন কর্তৃত্বে বিশ্বাস করতেন, তাঁরা হলেন কদরীয়া। কদরীয়াদের মধ্য থেকেই অদ্বয় বা অদ্বৈতবাদী মূতাজীলা সম্প্রদায়ের

উৎপত্তি হয়েছে। এঁরা ঈশ্বরকেই একমাত্র শাশ্বত সত্তা ও এই জগতকে তাঁরই শক্তির বিক্ষেপ বলে মনে করেন। তাঁরা বললেন যে ঈশ্বরই এই জড়জগৎ সৃষ্টি করেছেন, তাঁর জন্যেই জড়ের অস্তিত্ব ; কাজেই জড় জগৎ কোনো চিরন্তন সত্তা নয়, কতকগুলি বিশেষ গুণের সমন্বয় মাত্র। এঁরাই আবার তিনটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত হলেন—যাঁরা শাস্ত্রীয় মতবাদ যুক্তি দিয়ে প্রমাণের চেষ্টা করলেন, তাঁরা হলেন মূতাকাল্লামীন ; যাঁরা প্রচলিত পাশ্চাত্য দর্শনের বিচার-পদ্ধতি গ্রহণ করলেন, তাঁরা হলেন ফলাসাঁফা বা লুকামা ; আর সুফী সম্প্রদায় শাস্ত্রের বদলে প্রত্যক্ষ অনুভূতি ও আধ্যাত্মিক আবেগকেই প্রাধান্য দিলেন। কালাম বা শাস্ত্র পন্থা এবং হিকমত বা দর্শন ছাড়াও সুফীবাদের উৎস হলো কোরআন। তারা বলছেন যে ঈশ্বর আছেন মানুষের হৃদয়ে, মার্গ ও জ্ঞানের দ্বারাই মানুষ তার নিজের হৃদয়ে ঈশ্বরকে অনুভব করে। সেবা প্রেম ত্যাগ ধ্যান যোগ সংযোগ ও সমীকরণ—এই সাতটি হলো মার্গ ; এবং জ্ঞান দু রকমের—ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধিগ্রাহ্য জ্ঞান ও যে জ্ঞান ঈশ্বরের কৃপায় লাভ হয় সেই পরম জ্ঞান।

সুফী সম্প্রদায়েরও সম্প্রদায় আছে এবং অন্যান্য সম্প্রদায়েরও নানা সম্প্রদায়। এই সবের বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন নেই। ইসলাম ধর্মের মূল কথার কোনো পরিবর্তন হয় নি। ঈশ্বর আছেন, এবং তিনিই এই ধর্ম হজরত মোহাম্মদকে দান করেছিলেন।

গুরু নানক ও শিখধর্ম

হজরত মোহাম্মদের প্রায় নশো বছর পরে ভারতে আর এক নূতন ধর্মের জন্ম হয়। এদেশে জৈন ও বৌদ্ধধর্মের যখন জন্ম হয়েছিল। তখন শুধু সনাতন হিন্দুধর্মই ছিল ভারতবাসার ধর্ম, দ্বিতীয় কোনো ধর্মমতের স্থান ছিল না। কিন্তু এক ভিন্ন পরিবেশে শিখধর্মের প্রতিষ্ঠা হয়। আরব থেকে ইসলামধর্ম ভারতে আমদানি করেছিল আরব বণিকেরা। তারপর এ দেশে মুসলমান বিজয় আরম্ভ হয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই। পঞ্চদশ

শতাব্দীর শেষের দিকে দেখা যায় যে এ দেশের লক্ষ লক্ষ অধিবাসী ইসলামধর্ম গ্রহণ করেছে নানা কারণে। তার মধ্যে রাজনৈতিক ও অর্থ-নৈতিক কারণই প্রধান। অনেকে সামাজিক কারণ আছে বলেও মনে করলেন; ভাবলেন যে হিন্দু সমাজে জাতিভেদও একটি প্রধান কারণের অন্যতম। বহু দেবতার পূজাও একটি কারণ। হিন্দু ধর্মের একটি যুগোপ-যোগী রূপ দেবার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে বলে তারা মেনে নিলেন।

এই ব্যাপারে নানক এগিয়ে এলেন সকলের আগে। তাঁর জন্ম হয়েছিল ১৪৬৯ খ্রীষ্টাব্দে লাহোর থেকে পঁয়ত্রিশ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে তালবন্দী গ্রামে। এই স্থানের নাম এখন নানকানা। তার পিতা কালু ছিলেন গ্রামের হিসাবরক্ষক, তাই এই গ্রামেই তার প্রাথমিক শিক্ষা লাভ হয়। শৈশব থেকেই তাঁর বিদ্যালয়ের শিক্ষায় বিরাগ ছিল এবং তিনি নির্জনে ও সাধু-সন্তের সঙ্গে থাকতে ভালবাসতেন। একজন মৌলবীর নিকট নানক ফার্সী শিখেছিলেন এবং লাহোরের মুসলমান শাসনকর্তার অধীনে সুলতানপুরে এক গুদাম রক্ষকের কাজ পান। তাঁর বিবাহও হয়। কিন্তু কিছু দিন কাজ করবার পরে হঠাৎ একদিন স্নানের পরে বনে গিয়ে সমাধিস্থ হন। এই সময়ে তিনি শুনতে পান যে ঈশ্বর তাঁর নিজের পরিচয় দিয়ে বলছেন যে নানক তাঁর প্রেরিত গুরু। নানকের এই আধ্যাত্মিক জাগরণ হয় ১৫০৭ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে অগস্ট।

এই কথা জানবার পরেই নানক তীর্থ ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন। শুধু ভারতের অন্তর্গত হিন্দু তীর্থে নয়, তিনি ভারতের বাইরেও যান ইসলাম তীর্থ দর্শনে। পশ্চিমে মক্কা মেদিনা ও বাগদাদ থেকে পূর্বে দিল্লী কুরুক্ষেত্র বৃন্দাবন কাশী গয়া ও কামরূপ পর্যন্ত এবং দক্ষিণে সিংহল দেশও ঘুরে আসেন। এই ভ্রমণে তার সঙ্গী ছিলেন মর্দানা নামে এক রবাব বাদক। দীর্ঘ বাইশ বৎসর নানা তীর্থ ভ্রমণ করে এসে তিনি কর্তারপুরে বসবাস শুরু করেন। এইখান থেকেই তিনি তাঁর নূতন ধর্ম প্রচার করেন এবং ১৫৩৮ খ্রীষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন।

নানকের ধর্মমতে এমন একটি সর্বজনীন সহনশীলতার আদর্শ ছিল যে

হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্মের মানুষই তাঁর ধর্ম মত গ্রহণ করতে দ্বিধা করে নি। এই দুই ধর্মের গোঁড়ামি ও আচারপ্রিয়তাকে তিনি প্রশ্রয় দেন নি। ধর্ম বিশ্বাসে যে ঐক্য আছে তাই গ্রহণ করে সামাজিক মিলনের বাধা দূর করবার চেষ্টা করেছিলেন। হিন্দুর জাতিভেদ বহু দেবতার মূর্তি পূজা ও পশু বলির বিধান তিনি মেনে নেন নি। তিনি বললেন, ঈশ্বর এক। তিনিই সত্য। তিনি সৃষ্টিকর্তা, অজ-অমব স্বয়ং প্রকাশ। তাঁর নাম জপ করলেই তাঁর পূজা হয়। তিনি একজন গুরুব প্রয়োজন স্বাকার করেছেন। নদী যেমন সমুদ্রের সঙ্গে মিলিত হয়ে পূর্ণতা লাভ করে, তেমনি সাধারণ মানুষ গুরুতে আত্মসমর্পণ করে ঈশ্বরকে লাভ করে। নানক স্বর্গ নরক ও কর্মফলে বিশ্বাস করতেন। তিনি বলতেন যে ধর্মাচরণ করলেই সমস্ত পাপ ক্ষয় হয় এবং ঈশ্বরের নাম জপ কবেই স্বর্গেব অধিকারী হওয়া যায়। পশুবলির চেয়ে সত্য ভাষণ ভাল; ঈশ্ববে প্রেম তীর্থভ্রমণ ও ধর্মানুষ্ঠানের চেয়ে শ্রেয়। তাঁব মতে সকল মানুষই ঈশ্ববের সন্তান, কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাস দিয়ে মানুষ সমাজে ভেদ-বৃদ্ধি সৃষ্টি কবেছে। এই কালোপযোগী সরল ধর্মমত সেদিন বহু হিন্দু ও মুসলমানকে বিশেষ কবে সমাজে যারা হীন বলে চিহ্নিত হয়েছিল তাবা এই নূতন ধর্মে দীক্ষা নেবার জন্য এগিয়ে এসেছিল।

তাঁর ভক্তরা নিজেদের গুরুর শিষ্য বা শিখ নামে অভিহিত করে। মৃত্যুব অব্যবহিত পূর্বে গুরু নানক তাঁব দুই পুত্রেব দাবি অগ্রাহ্য কবে প্রিয় শিষ্য অঙ্গদকে পববর্তী গুরু নির্বাচন করে তাঁর ধর্মমত প্রচারেব আদেশ দিয়ে যান।

শোনা যায় যে লহনা নামে এক শিষ্যকে আলিঙ্গন করে বলেছিলেন, আমার আত্মা এবারে তোমার মধ্যে প্রবেশ করল এখন তুমি আমার অঙ্গ বলে বিবেচিত হবে। নানকের মৃত্যুর পরে এই লহনাই গুরু অঙ্গদ নামে পরিচিত হন।

গুরুবাদ সম্পর্কে নানক বলেছেন যে বেদ-পুরাণে পরমেশ্বরের চেয়েও গুরুকে বড় বলা হয়েছে। তার অর্থ এই যে ভগবানের ঘরে মুক্তি আছে,

আর সেই ভগবান আছে গুরুর ঘরে।—

পরমেশ্বরসে গুরু বড়া গাওত বেদ পুরাণ।
নানক হরকে মুকত্ হ্যায় গুরুকা ঘর ভগবান॥

দ্বিতীয় গুরু অঙ্গদ শিখদের একটি নূতন সম্প্রদায় রূপে সংগঠিত করেন। গুরুমুখী বর্ণমালা নাকি তাঁরই আবিষ্কার। দশম গুরু গোবিন্দ সিং এই গুরু নির্বাচন প্রথা রহিত করেন। দশ গুরু-বন্দনা থেকে এই দশজন গুরুর নাম জানা যায়।—

গুরু নানক অঙ্গদ অমর গুরু।
গুরু রামদাস জগ্ তারণ কো॥
গুরু অর্জন শব্দ জাহাজ গুরু।
সং সঙ্গত পার উত্তারণ কো॥
গুরু হরগোবিন্দ হররাম গুরু।
হর কৃষণ ভয়ো নিস্তারণ কো॥
গুরু তেগবাহাদুর শিখ দিও।
কলয়ুগমে প্যায়েজ সমারণ কো॥
প্রগটে গুরু গোবিন্দ সিং গুরু।
অবতারণ দুষ্ট সংহারণ কো॥

এই গুরুদের মধ্যে কয়েকজনের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁরা হলেন চতুর্থ গুরু রামদাস, পঞ্চম গুরু অর্জন ও দশম গুরু গোবিন্দ সিং। নানকের মৃত্যুর চল্লিশ বছর পরে রামদাস শিখদের প্রধান ধর্মকেন্দ্র অমৃতসরের প্রতিষ্ঠা করেন। লাহোর শহরে আকবর বাদশাহর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল। তাঁর চরিত্র মাধুর্য ও ধর্ম ব্যাখ্যায় প্রীত হয়ে বাদশাহ তাঁকে যে ভূমিদান করেন, তারই উপর গুরু একটি সুন্দর জলাশয় খনন করে তার নাম রাখেন অমৃত-সরোবর বা অমৃতসর। তারপর নির্মিত হয় হরিমন্দির বা সুবর্ণমন্দির। গুরু অর্জন শিখদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ সংকলন করেন, তার নাম আদি গ্রন্থ বা গ্রন্থ-সাহেব। এই সংকলনে দ্বাদশ থেকে

সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত ছ শো বছরের রচনা স্থান পেয়েছে। গুরু অর্জন নানা প্রদেশের সন্তকবিদের পদাবলী থেকে তাঁদের বাণী সংগ্রহ করে সংকলনভুক্ত করেন। উদাহরণ স্বরূপ জয়দেব নামদেব রামানন্দ কবীর সুরদাস তো আছেনই, তা ছাড়াও আছেন ধন্না পীপা যর্দন রুইদাস প্রভৃতি বহু খ্যাত অখ্যাত নানা ভক্তের বাণী। ধন্না একজন জাঠ, পীপা একজন ছোটখাট রাজা বা জমিদার, যর্দন রেওয়া-রাজের নাপিত ও রুইদাস চামার। শেখ ফরিদ শেখ ভিখন ও সধনা নামে এক কশাই-এর রচনাও আদি গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। গুরুদের মধ্যে আছেন নানক অঙ্গদ অমরদাস রামদাস অর্জন তেগবাহাদুর ও গোবিন্দ সিংহ। গুরু অর্জনের পরবর্তীকালের রচনা গুরু গোবিন্দ সিংহ আদিগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করেন।
গুরু অর্জন ও গুরু তেগবাহাদুর মুসলমান শাসকদের হাতে নিহত হবার পরে দশম গুরু গোবিন্দ সিং মোগল বাদশাহ ঔরঙ্গজেবের আমলে শিখ জাতিকে এক নূতন শক্তিতে উদ্বুদ্ধ করেন। পাঁচজন নির্ভীক বীরকে তিনি খাল্‌সা বা পবিত্র ধর্মে দীক্ষা দেন। তাদের পাঁচটি প্রতীক হলো কেশ অর্থাৎ গোঁফ-দাড়ি ও মাথায় বড় চুল, কঙ্ঘ বা মাথার চিরুনি, কড়া বা হাতে লোহার বালা, কচ্ছ বা অন্তর্বাস, এবং কৃপাণ বা তরোয়াল। ভক্তিবাদী শিখজাতি এই ভাবে ধর্মযোদ্ধায় রূপান্তরিত হন। গুরু গোবিন্দ সিং সকল শিখকে সিংহ উপাধি দেন। জাতি ধর্মের কোনো ভেদ থাকবে না, সব শিখ ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ হবে, এক পাত্রে আহার করবে, পরস্পরকে ঘৃণা করবে না। এ ছাড়াও অসাধু উপায়ে কেউ জীবিকার্জন করবে না, লোভ ত্যাগ করবে, সত্য কথা বলবে ও সকালে জপ্‌জি মন্ত্রে প্রার্থনা করবে, বিপন্ন বন্ধুকে সাহায্য করবে ও সময় মতো শিখ ধর্ম মন্দির গুরুদ্বার দর্শন করবে। গুরু গোবিন্দ সিংহের শেষ নির্দেশ হলো, আর গুরু নয়, তাঁর পর থেকে সকল ধর্মাদেশ আদিগ্রন্থ থেকেই নিতে হবে।
আদি গ্রন্থের মূল কথাও এই—যোগসাধনা পূজানুষ্ঠান কৃচ্ছ্র সাধন বা দীর্ঘ প্রার্থনাও নয়, এই প্রলোভনে ভরা জগতে পবিত্র জীবনই ধর্ম। গুরুকে ভালবাসবে, সব মানুষকে সমান ভাববে, সবার জন্য থাকবে সমবেদনা।

কোনো গর্ব নয়, অহঙ্কার নয়, বিনয় ব্যবহারেই ধর্ম পালিত হবে। নানক বলেছেন, ঈশ্বরই সর্বময় কর্তা, তিনি তাঁর দাস।—

তুঁহে নিরহঙ্কার কর্তার,
নানক বান্দা তেরা।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

হিন্দুধর্মে বিভিন্ন মতবাদ

শঙ্কর ও অদ্বৈতবাদ—রামানুজ ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ—নিম্বার্ক ও স্বাভাবিক দ্বৈতাদ্বৈতবাদ—মধ্ব ও দ্বৈতবাদ—রামানন্দ ও ভক্তিবাদ—চৈতন্যদেব ও অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদ—বল্লভ ও শুদ্ধাদ্বৈতবাদ।

শঙ্কর ও অদ্বৈতবাদ

একটা কথা ভাবলে খুবই আশ্চর্য হতে হয়। বুদ্ধ ও মহাবীরের নির্বাণের পরে প্রায় বারোশো বৎসর এই ভারতের মাটিতে কোনো উল্লেখযোগ্য দার্শনিক ও ধর্ম প্রচারকের আবির্ভাব হয় নি। পাশ্চাত্য দেশে যীশু খ্রীষ্টের জন্মের আনুমানিক চারশো ছিয়াশি বৎসর পূর্বে বুদ্ধ দেহরক্ষা করেন, মহাবীর এর পর তিন-চার বৎসর জীবিত ছিলেন। আর শঙ্করের আবির্ভাব অষ্টম শতাব্দীর শেষের দিকে। ভারতে তখন এক দিকে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শনের প্রাবল্য ও অন্য দিকে হিন্দু পূর্ব মীমাংসা মতের বাড়াবাড়ি। সেই দুর্দিনেই শঙ্করের আবির্ভাব হয়েছিল ভারতে। বর্তমান কেরল রাজ্যের কালাডি গ্রামে নামুদ্রি ব্রাহ্মণ-পরিবারে তাঁর জন্ম হয়েছিল আনুমানিক ৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে। যাঁরা পুনর্জন্ম বিশ্বাস করেন তাঁরা বলেন যে তিনি জাতিস্মর হয়ে জন্মেছিলেন। পূর্বজন্মে অর্জিত সমস্ত জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন তিনি। মাধবাচার্যের শঙ্কর বিজয় গ্রন্থের মতে তাঁর পিতামাতার নাম শিবগুরু ও সতীদেবী। আট বৎসর বয়সে তিনি গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করেন এবং নর্মদার তীরে গোবিন্দাচার্যের নিকটে গিয়ে বলেন, আপনি প্রথমে আদিশেষ ছিলেন, তারপর পতঞ্জলি রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং এখন আপনি গোবিন্দ যোগী। এর পরে তিনি নীলকণ্ঠ

হরদত্ত ও ভট্ট ভাস্করকে তর্কে পরাস্ত করেন। বাণ দণ্ডী ও ময়ূরকে তাঁর নিজের দর্শনে উপদেশ দেন। তিনি হর্ষ অভিনব গুপ্ত মুরারি মিশ্র উদয়নাচার্য কুমারিল মণ্ডল মিশ্র ও প্রভাকরকেও তর্কে পরাস্ত করেন। এই গ্রন্থটি সায়নাচার্যের ভ্রাতা মাধবাচার্যের রচনা কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে এবং গ্রন্থে উক্ত পণ্ডিতরা সকলেই শঙ্করের সমসাময়িক ছিলেন না বলে অনেকে মনে করেন। তবে সাধারণ ভাবে বিশ্বাস করা হয় যে শঙ্কর গোবিন্দাচার্যের নিকটে দর্শনাদি নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন। তারপরে কিছুকাল কাশীতে বাস করার পর বদ্রীনারায়ণে চলে যান। ষোল বছর বয়সে তাঁর অধিকাংশ গ্রন্থ রচনা শেষ হয়। এই সব গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখ-যোগ্য ব্রহ্মসূত্র, দশখানি উপনিষদ ও গীতার ভাষ্য বিবেক চূড়ামণি প্রভৃতি গ্রন্থ এবং স্তোত্রমালা। তিনি বৌদ্ধ ও পূর্ব মীমাংসা মত খণ্ডন করে নিজের বেদান্তানুসারী অদ্বৈত মতের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁরা এই মতের বিরোধী দার্শনিক পণ্ডিতদের সঙ্গে শাস্ত্র বিচার করে সকলকেই পরাস্ত করেন। এই উদ্দেশ্যে দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে তিনি সমগ্র ভারত পরিক্রমা করেন এবং চারি দিকে চারটি মঠ স্থাপন করেন— উত্তরে বদ্রিনাথের পথে জ্যোতির্মঠ, দক্ষিণে কর্ণাটক রাজ্যে শৃঙ্গেরি মঠ, পূর্বে পুরীতে গোবর্ধন মঠ ও পশ্চিমে দ্বারকায় সারদামঠ। তীর্থ আশ্রম প্রভৃতি দশনামী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করে তাদের এই সব মঠের নিয়ন্ত্রণাধীন করেন। তিনি সাংখ্য ন্যায় ও বৈশেষিক মতবাদ খণ্ডন করেন, সব শূন্যবাদ প্রভৃতি বৌদ্ধ মতও খণ্ডন করে বেদান্ত মতকেই স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি শৈব শাক্ত গাণপত্য ও তান্ত্রিক সম্প্রদায়ে প্রচলিত কুসংস্কার ও অনাচার দূর করেন। কিন্তু কোনো দেবতার উপাসনায় হস্তক্ষেপ করেন নি। সম্প্রদায় নির্বিশেষে তিনি তাঁর নিজের মতের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করে গেছেন।

এই মহাপুরুষকে আমরা কোথায় কেমন করে হারিয়েছি তা জানা যায় না। প্রবাদ আছে যে বত্রিশ বছর বয়সে হিমালয় পার হয়ে তিনি কৈলাসে গিয়েছিলেন শিবের দর্শনে, আর ফেরেন নি। তাঁকে শিবের অবতার বলা হয়েছে। মাধবাচার্য তাঁর শঙ্কর বিজয়ে বলেছেন যে নশ্বর দেহ ত্যাগ

করে কৈলাসে তিনি শিবের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন।

শঙ্কর মত অদ্বৈতবাদ নামে অভিহিত। একে মায়াবাদও বলা হয়। দ্বৈত ভাবে স্বগুণ ব্রহ্মেব উপাসনা দ্বারা চিত্তশুদ্ধি করে জ্ঞানযোগ দ্বারা আত্ম-স্বরূপেব জীবন্ত উপলব্ধি এবং চরমে সাযুজ্য মুক্তি অর্থাৎ নির্গুণ ব্রহ্মের সঙ্গে একান্ত অভিন্নত্ব লাভই শঙ্কর মতে সাধকের আদর্শ। অর্ধেক শ্লোকে তিনি তাঁর দার্শনিক তত্ত্ব সুন্দর ভাবে প্রকাশ করে গেছেন। তিনি বলেছেন, যে কথা বহু গ্রন্থে বলা হয়েছে, তা একটি লাইনেও বলা যেতে পারে। ব্রহ্ম সত্য ও জগৎ মিথ্যা, জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন।—

শ্লোকার্ধেন প্রবক্ষ্যামি যদুক্তং গ্রন্থকোটিভিঃ।
ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ॥

বিদেশীরাও শঙ্করেব মত তাঁরই একটি শ্লোক থেকে উদ্ধার করেছে। যদিও কোনো তফাৎ নেই তব ঢেউ যেমন সমুদ্রের, সমুদ্র ঢেউ-এব নয়, তেমনি হে প্রভু আমিও তোমার, তুমি আমার নও।—

সত্যাপি ভেদাপগমে নাথ তবাহং ন মামকীন সত্বম্।
সামুদ্রো হি তবঙ্গ, ক্বচন্ সমুদ্রো ন তারঙ্গঃ॥ —বিষ্ণুস্তব

এর ইংরেজী অনুবাদঃ

Though difference be none, I am of thee.
Not Thou, O Lord, of me ;
For of the sea is verily the wave,
Not of the wave the sea.

শঙ্কর বলেছেন যে, 'এই বিচিত্র বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির পূর্বে একমাত্র চিন্মাত্র পরম ব্রহ্ম বিদ্যমান ছিলেন। এই পরম ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয়। ব্রহ্মই সৎ, আর সৃষ্ট জগৎ অসৎ।' বৌদ্ধ মতে সৃষ্টির পূর্বে কিছুই ছিল না। শঙ্কর এই মত খণ্ডন করে বলেন যে 'অসৎ থেকে সত্যের উৎপত্তি অসম্ভব'। ব্রহ্ম তত্ত্বের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শঙ্কর ও বৌদ্ধদের মতো বিশ্ব-প্রপঞ্চকে শূন্যে পরিণত করেছিলেন, তারপর এই শূন্যবাদ খণ্ডন করেন। তাঁর ব্রহ্ম নির্গুণ চিন্মাত্র হলেও তিনি পূণ ও বিভু বা সর্বব্যাপী, তিনি

স্বপ্রকাশ। তিনি নিষ্ক্রিয়। তিনি স্থূল নন, সৎ বা অসৎ নন, কার্য বা কারণ নন। তিনি ইন্দ্রিয়াতীত। তিনি কায়মনোবাক্যের অগোচর বলে দৃষ্টি তাঁর কাছে পৌঁছয় না, মন তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না, বাক্যেও তিনি আয়ত্ত হন না। তিনি শব্দেরও অগোচর। তিনি জ্ঞাতা নন, জ্ঞেয় নন, তিনি সকল জ্ঞান ও ক্রিয়ার অতীত।

শঙ্কর সবিশেষ বা সগুণ ব্রহ্মকেও অস্বীকার করেন নি। শঙ্কর বলেছেন যে ঈশ্বরই সগুণ ব্রহ্ম এবং ইনিই বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ। শঙ্কর এই সগুণ ব্রহ্মকে মায়িক বা মায়াবী বলেন, তাই ব্রহ্মের এই গুণময় অভিব্যক্তি অনিত্য। আত্মজ্ঞানের আলোয় যখন মায়ার অন্ধকার দূর হয়, তখন এই সগুণ ব্রহ্মের অস্তিত্ব থাকে না। মায়ার জন্যই জীব ও ব্রহ্ম পৃথক মনে হয়। এই বিশ্ব মায়ারই লীলা ও অসৎ। একমাত্র ব্রহ্মই সত্য ও নিত্য। ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয়।

শঙ্কর জীবের মুক্তির কথাও বলেছেন। বেদের কর্মকাণ্ডে যাগযজ্ঞের বিধান আছে। সগুণ ব্রহ্মের জন্যই এই সব অনুষ্ঠান, কিন্তু সগুণ ব্রহ্মের উপাসনায় জীবের মুক্তি হয় না। মুক্তি হয় নির্গুণ ব্রহ্মের জ্ঞানে। জীব ও ব্রহ্মের ভিন্ন জ্ঞান দূর হলেই জীবের মুক্তি।—

তত্ত্বমসি।

রামানুজ ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ

রামানুজের জন্ম ১০১৭ খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজের নিকট শ্রীপেরাম্বুদুর গ্রামে। তাঁর পিতা কেশব ত্রিপাঠী পণ্ডিত ছিলেন এবং পনেরো বৎসর পর্যন্ত রামানুজ তাঁর পিতার নিকটেই বেদাধ্যয়ন করেন। ষোল বৎসর বয়সে তাঁর বিবাহ হয়, কিন্তু পারিবারিক জীবনে শান্তি না পেয়ে তিনি স্ত্রীকে কৌশলে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। কাঞ্চীপুরমের বিষ্ণুভক্ত শূদ্র কাঞ্চিপূর্ণের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়। তাঁর বেদান্ত শিক্ষার গুরু যাদব প্রকাশ ঈর্ষাবশত তাঁকে তীর্থযাত্রার পথে হত্যার চেষ্টা করে-ছিলেন। রামানুজ পালিয়ে আত্মরক্ষা করেন। পরবর্তী জীবনে যাদব

প্রকাশ তাঁরই নিকটে সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁর নাম হয় যতিরাজ। বৈষ্ণবপণ্ডিত যমুনাচার্য কাঞ্চীপুরম থেকে রামানুজকে শ্রীরঙ্গমে আনবার জন্য শিষ্য মহাপূর্ণকে পাঠান। কিন্তু রামানুজ এসে পৌঁছবার পূর্বেই তাঁর মৃত্যু হয়। তাই রামানুজ মহাপূর্ণের নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং পরে পরে যমুনাচার্যের অন্য চারজন শিষ্য কাঙ্কীপূর্ণ, গোষ্ঠপূর্ণ, মালাধর ও বররঙ্গের নিকটেও বৈষ্ণবতত্ত্বে দীক্ষা গ্রহণ করেন। যমুনাচার্য তাঁকে শ্রীরঙ্গমের মন্দিরের অধ্যক্ষ নির্বাচন করে গিয়েছিলেন এবং এই মন্দিরে থেকে তিনি দীর্ঘ কাল বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করেছিলেন। পাণ্ড্য ও চোল রাজ্যের রাজারা ছিলেন শিবভক্ত, তাঁরা রাজ্যের নানা স্থানে শিব মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এর পরে তিরুচিরপল্লীর চোল শাসনকর্তা বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের জন্য রামানুজকে হত্যার আদেশ দিয়েছিলেন। এই সংবাদ পেয়ে রামানুজ শ্রীরঙ্গম থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন যাদবপুরীতে। জৈন রাজা বল্লাল তাঁকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণের পরে তিনি বিষ্ণুবর্ধন নামে পরিচিত হয়েছিলেন। রামানুজের সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত আছে। তিনি দীর্ঘ জীবনের অধিকারী ছিলেন। ১১৩৭ খ্রীষ্টাব্দে একশো কুড়ি বৎসর বয়সে তিনি শ্রীরঙ্গমে দেহরক্ষা করেন। এক শিষ্যের সহযোগিতায় তিনি বেদান্ত সূত্র বেদার্থ সংগ্রহ ও বেদান্তদীপ নামে গ্রন্থ রচনা করেন এবং শ্রীভাষ্য নামে ব্রহ্মসূত্রের টীকা ও শ্রীমদ্ভাগবতেরও একখানি টীকা প্রণয়ন করেন।

তাঁর প্রচারিত ধর্ম ও দর্শন বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ নামে পরিচিত। প্রথমে তিনি বৌদ্ধ মত খণ্ডন করেন এবং তারপর তিনি শঙ্কর প্রচারিত অদ্বৈত মতেরও পরিবর্তন সাধন করেন। শঙ্কর মতে একমাত্র ব্রহ্মই সত্য, এবং জগৎ প্রপঞ্চ মিথ্যা। অনেক সময়ে রজ্জুকে আমরা সর্প বলে ভুল করি, তারপর রজ্জু চিনতে পারলে সর্পভ্রম দূর হয়। ঠিক এই রকম ভাবেই নিজেদের অবিদ্যার জন্য জগৎ প্রপঞ্চকে আমরা ব্রহ্ম ভাবি। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান হলেই অবিদ্যা দূর হয়ে জগৎ প্রপঞ্চের স্বরূপ বুঝতে পারি। কিন্তু রামানুজ চিৎ অচিৎ ও ঈশ্বর এই তিন পদার্থ স্বীকার করেছেন। চিৎ ও অচিতের সঙ্গে

ঈশ্বরের ভেদ অভেদ ও ভেদাভেদ এই তিনও তিনি স্বীকার করেছেন। তাই তাঁর মতে এই জগৎ প্রপঞ্চকে মিথ্যা মনে করা উচিত নয়।

চিৎ ভোক্তা ও জীবপদবাচ্য। নিত্য অনাদি নির্মল জ্ঞানস্বরূপ ও কর্মরূপ অবিদ্যায় আবৃত। অচিৎ পদার্থ ভোগ্য ও দৃশ্যপদবাচ্য। এই জড় জগৎ অচিৎ। আত্মা চিৎ এবং দেহ অচিৎ। ঈশ্বর হলেন নারায়ণ। তিনি সব কিছুর নিয়ামক। সকল চিৎ ও অচিৎ পদার্থ তার শরীর, নারায়ণ প্রভৃতি তার সংজ্ঞা। তিনি এই জগতের সৃষ্টি পালন ও সংহার করেন। তিনিই এই জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ। জগৎ মিথ্যা নয়, চিৎ অচিৎ ও জীবজগৎ তার শরীর। শুধু জ্ঞান নয়, শুধু ভক্তি নয়, জ্ঞানাত্মক ভক্তিতে আমরা তাকে পেতে পারি। তাঁর সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান হলেই আমরা নিজের অন্তরে ও বাহিরে তাঁর অস্তিত্ব অনুভব করি। কিন্তু নিজের সত্তা তাতে লুপ্ত হয় না। শঙ্করের সঙ্গে রামানুজের মতের পার্থক্য তাদের মোক্ষ সম্বন্ধে ধারণায়। ব্রহ্মে লয় হওয়াকেই শঙ্কর মোক্ষ বলেছেন; কিন্তু রামানুজ মনে করেন যে নারায়ণ বা ব্রহ্মকে উপলব্ধি করে ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করার নামই মোক্ষ।

রামানুজের নারায়ণ ভক্তবৎসল, লীলার জন্য তিনি পাঁচ রকমের মূর্তি ধারণ করেন—প্রতিমায় অর্চনার জন্য অর্চা মূর্তি, তার অবতার রূপের নাম বিভব মূর্তি, বাসুদেব সঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই চার তাঁর ব্যূহ মূর্তি, নারায়ণ নামের সূক্ষ্ম রূপই পরম ব্রহ্ম এবং সকল জীবের নিয়ন্তা হলেন অন্তর্যামী। প্রতিমা পূজায় চিত্তশুদ্ধি হলেই ভগবদ্ভক্তি দেখা দেয়। তারপর ক্রমে ক্রমে বিভব ব্যূহ প্রভৃতি মূর্তির উপাসনা করে মোক্ষলাভের অধিকার জন্মে।

রামানুজের মতে উপাসনার পদ্ধতিও পাঁচরকম—অভিগমন উপাদান ইজ্যা স্বাধ্যায় ও যোগ। মন্দির মার্জনা ও অনুলেপনকে অভিগমন বলে, উপাদান হলো ফুল চন্দন প্রভৃতি পূজার উপকরণ সংগ্রহ, ইজ্যা মানে বিগ্রহের পূজা, স্বাধ্যায় অর্থে শাস্ত্রপাঠ বোঝায় এবং ইন্দ্রিয় ও মন সংযম করে ঈশ্বরের ধ্যানকে বলে যোগ। এই পঞ্চবিধ উপাসনায় ভক্তি নামের

জ্ঞান জন্মে ধীরে ধীরে, অহঙ্কার লোপ পায় এবং উপাসক এক আনন্দময় অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এরই নাম মোক্ষ। ভক্তিজ্ঞান বিশেষ জ্ঞানের ফল। রামানুজ বলেছেন যে ঈশ্বরকে পেতে হলে ভক্তির পথেই পেতে হবে। ভাবতে হবে যে আমি নিজে সহস্র অপরাধে অপরাধী, গভীর ভবসাগরে পতিত হয়েছি। হে হরি, এই শরণাগতকে তুমি তোমার করে নাও।—

অপরাধ সহস্রভাজনং পতিতং ভীমভবার্ণবোদরে।

অগতিং শরণাগতং হরে কৃপয়া কেবলং আত্মসাৎ কুরু ॥

ন ধর্মনিষ্ঠোঽস্মি ন চাত্মবেদী ন ভক্তিমাংস্তব চরণারবিন্দে।

অকিঞ্চনোঽনন্যগতিঃ শরণ্যং ত্বৎপাদমূলং শরণং প্রপদ্যে ॥

শ্রীদেবী বা লক্ষ্মীদেবী প্রবর্তিত শ্রীসম্প্রদায়ও এই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে বিশ্বাসী। রামানুজ বেদান্তের সঙ্গে এই সম্প্রদায়ের তামিল বেদান্তের সমন্বয় ঘটিয়ে শ্রীসম্প্রদায়ের মত সুদৃঢ় করেছিলেন বলে শ্রীসম্প্রদায় রামানুজ সম্প্রদায় নামেও অভিহিত হয়। শ্রীসম্প্রদায়ের দার্শনিক সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে যতীন্দ্র রামানুজাচার্য লিখেছেন, 'চিৎ অচিৎ ব্রহ্মতত্ত্বত্রয়ের মধ্যে ব্রহ্ম হচ্ছেন সর্বশরীরী সর্বান্তর্যামী ব্যাপক বস্তু, চেতন জীবাত্মা ও অচেতন জড়বস্তু তাঁর শরীর। এই শরীররূপী চিদবিদ্ বিশিষ্ট শরীরী ব্রহ্ম হচ্ছেন অদ্বয় বস্তু। এই সম্প্রদায়ের উপাস্য দেবতা শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ এবং রামকৃষ্ণাদি বিভিন্ন অবতার। সব সুলভতা হেতু তাহাদের অর্চাবিগ্রহে উপাসকগণের সর্বাধিক প্রবণতা। ইহাদের মতে সংসার বিমুক্তির উপায় শরণাগতি।'

নিম্বার্ক ও স্বাভাবিক দ্বৈতাদ্বৈত বাদ

নিম্বার্কের জন্মকাল সম্বন্ধে কোনো ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায় না। কিন্তু সাধারণভাবে স্বীকৃত হয়েছে যে তিনি একাদশ শতাব্দীর মানুষ এবং আনুমানিক ১১১৪ থেকে ১১৬২ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন। তাঁর জন্ম হয়েছিল তৈলঙ্গ ব্রাহ্মণ বংশে, পিতা-মাতার নাম অরুণ ও জয়ন্তী, মতান্তরে জগন্নাথ ও সরস্বতী। নিম্বার্কের একাধিক নাম ছিল বলে মনে করা হয়। তাঁর পিতৃদত্ত নাম ভাস্করাচার্য এবং অপর নাম নিয়মানন্দ বা

নিম্বাদিত্য।

তাঁর নিম্বার্ক নাম সম্পর্কে একটি কাহিনা প্রচলিত আছে। এক জৈন সন্ন্যাসী তাঁর আশ্রমে এসেছিলেন শাস্ত্র আলোচনার জন্য। এই আলোচনায় সারাদিন কেটে গেল দেখে নিম্বার্ক অতিথির জন্য আহারের ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু সূর্যাস্ত হয়েছে বলে সন্ন্যাসী এই আতিথ্য স্বীকার করতে পারলেন না। নিম্বার্ক দুঃখিত মনে সূর্যের নিকট প্রার্থনা করলেন অস্ত না যেতে এবং সূর্য তাঁর কথায় একটি নিম গাছের আড়ালে রয়ে গেলেন। সন্ন্যাসীর আহার শেষ হবার পরেই সূর্য অস্ত গেলেন। অর্ক নিম্ববৃক্ষে অবস্থান করেছিলেন বলেই এই ঘটনার পরে ভাস্করাচার্যের নাম হয় নিম্বার্ক বা নিম্বাদিত্য। এই কাহিনী আছে ভক্তমাল গ্রন্থে—

কৃষ্ণভক্ত অনুরোধে সূর্যদেব আসি।
প্রহরেক দিবা আছে এমত প্রকাশি॥
ভোজন করিয়া তথা বৈসে যবে যতি।
সূর্য নিজ স্থানে গেলা লইয়া সম্মতি॥

শোনা যায় যে বৃন্দাবনের নিকটে ধ্রুব পাহাড়ে ছিল নিম্বার্কের আশ্রম। তাঁর মৃত্যুর পরে এখানে একটি গদি স্থাপিত হয়েছে। তাঁকে বিষ্ণুর সুদর্শন চক্রের অবতার মতান্তরে সূর্যের আংশিক অবতার মনে করা হয়। তাঁর নিম্বার্ক সম্প্রদায়কে হংস সম্প্রদায় বা সনকাদি সম্প্রদায়ও বলা হয়। নিম্বার্কের গুরু ছিলেন মহর্ষি নারদ।

নিম্বার্ক ব্রহ্মসূত্রের যে ভাষ্য রচনা করেছিলেন তার নাম বেদান্ত পারিজাত সৌরভ। তিনিও ত্রিতত্ত্ববাদী, অর্থাৎ ঈশ্বর চিৎ ও অচিৎ এই তিন তত্ত্ব স্বীকার করেছেন। ঈশ্বর বা ব্রহ্মই মূল তত্ত্ব। দর্শনের আলোচনায় ব্রহ্মকে তিনি পরমাত্মা বা পুরুষোত্তম বলেছেন, কিন্তু ধর্মতত্ত্ব বিশ্লেষণের সময় বলেছেন বিষ্ণু বা কৃষ্ণ, কিংবা রমাকান্ত পুরুষোত্তম বা রাধাবল্লভ কৃষ্ণ। নিম্বার্ক পৃথক ভাবে ধর্ম ও দর্শনের আলোচনা করেছেন, ধর্মের সঙ্গে দর্শনকে মিলিয়ে ফেলেন নি।

তাঁর ব্রহ্ম সগুণ সবিশেষ সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান। তিনিই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের

স্রষ্টা পালক ও সংহারকর্তা। সমগ্র বিশ্ব তাঁরই নিয়ন্ত্রণাধীন। তাঁর দুই রূপ। তিনি উদ্যত বজ্রের মতো ভয়ানক—মহদ্‌ভয়ং বজ্রমুদ্যতম্‌, আবার অশেষ সৌন্দর্য রসের আনন্দময় আকর। এই বিশ্ব তাই এত সুন্দর ও আনন্দের।

তিনিই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ। উপাদান কারণ রূপে তিনি তাঁর সূক্ষ্ম অবস্থার চিৎ ও অচিৎ শক্তিকে স্থূল অবস্থায় জীব ও জড় রূপে প্রকাশ হতে দেন। আর নিমিত্ত কারণ রূপে তিনি জীবাত্মাকে ভোগ্যবস্তু ও কর্মফলের সঙ্গে সংযুক্ত হতে দেন। সূক্ষ্ম অবস্থায় যা তাঁর মধ্যে আছে। তাই স্থূল অবস্থায় জীব ও জড়ে প্রকাশিত হয়।

শঙ্করের মতো নিম্বার্ক জীব ও জগৎকে মিথ্যা বা মায়া বলেন নি। জীবজগৎ ব্রহ্মেরই অংশ। ব্রহ্ম কারণ, জীব-জগৎ কার্য। কারণ ব্রহ্ম ও কার্য জীব-জগতের মধ্যে ভেদ ও অভেদ দুইই সমান ভাবে সত্য নিত্য স্বাভাবিক ও তাদের সহ-অবস্থিতিও সমঞ্জস ও অবিরুদ্ধ। ব্রহ্ম ও জীব-জগৎ সম্বন্ধে নিম্বার্কের এই মতবাদ বেদান্ত দর্শনে মৌলিক এবং এই মতবাদকে স্বাভাবিক দ্বৈতাদ্বৈতবাদ বলা হয়।

নিম্বার্কের মতে জীব অহংজ্ঞান যুক্ত বলেই সে একটা স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব অনুভব করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে স্বাধীন নয়, সে ব্রহ্মেরই অধীন। সঙ্গে জীব তার নিজের এই স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রাখতে সক্ষম নয় বলেই সে সর্বতোভাবে ব্রহ্মের উপরে নির্ভরশীল। জীবের মুক্তি বা মোক্ষ তার দেহত্যাগের পরেই সম্ভব। নিম্বার্ক শুধু দুঃখের অভাবকেই মোক্ষ বলেন নি। সম্পূর্ণ আনন্দময় অবস্থাকে তিনি মোক্ষ বলেছেন। মোক্ষের দুটি অঙ্গ। একটি আত্মস্বরূপের উপলব্ধি ও অন্যটি ব্রহ্ম স্বরূপের উপলব্ধি। মোক্ষ লাভের জন্য তিনি পাঁচটি উপায় বলেছেন। ধর্ম, জ্ঞান, ভক্তি, প্রপত্তি বা শরণাগতি ও আত্মসমর্পণ—এতেই জীবের মুক্তি হবে। নিষ্কাম কর্মে চিত্ত শুদ্ধি হবার পরে শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনে জ্ঞান লাভ হয়। জ্ঞান থেকে ভক্তি। ভক্তি থেকে ধ্যান। এই ভাবেই ব্রহ্মজ্ঞান হয়। ব্রহ্মের উপলব্ধিতেই মোক্ষ। মোক্ষ লাভের অন্য উপায় প্রপত্তি বা শরণাগতি।

শিশু যেমন মায়ের উপরে সম্পূর্ণ নির্ভরশীল, সেইভাবে ব্রহ্মের শরণ নিলেও মোক্ষলাভ হয়। ঈশ্বরে আত্মসমর্পণের নাম প্রপত্তি। আর গুরুর নিকট আত্মসমর্পণকে গুরুসপত্তি বলে। যজ্ঞের হবি দর্বী বা হাতায় করে যেমন অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হয়, তেমনি গুরুর মাধ্যমেও মোক্ষলাভ সম্ভব।

মধ্ব ও দ্বৈতবাদ

মধ্বের কাল ত্রয়োদশ শতাব্দী। ১১৯৭ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ ভারতে তাঁর জন্ম। তাঁর পিতা মধিজা ভট্ট তাঁর নাম রেখেছিলেন বসুদেব। নারায়ণ পণ্ডিত তাঁর 'মধ্বাচার্য বিজয়' গ্রন্থে লিখেছেন যে নারায়ণের আদেশে স্বয়ং বায়ু ধর্ম সংস্থাপনের জন্যে মধ্বাচার্য নামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। শৈশবে অনন্তেশ্বরের মঠে তাঁর বিদ্যারম্ভ। নয় বৎসর বয়সে তিনি শুদ্ধানন্দের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। গুরু তাঁর নাম দেন পূর্ণ প্রজ্ঞ। দীক্ষার পরেই তিনি সংসার ত্যাগ করেন। তিনি আনন্দ তীর্থ আনন্দ জ্ঞান আনন্দ গিরি জ্ঞানানন্দ প্রভৃতি নানা নামে পরিচিত হয়েছিলেন।
দক্ষিণ কানাড়ার উড়ুপিতে তিনি একটি কৃষ্ণমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই সম্বন্ধে একটি অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত আছে। তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। তার মধ্যে ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যম্ শ্রেষ্ঠ। ১২৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ছিয়াত্তর বৎসর বয়সে তিনি দেহ রক্ষা করেন।
মধ্ব পরম বৈষ্ণব ছিলেন। তাঁর মতে সৃষ্টির আদিতে শুধু আনন্দ স্বরূপ নারায়ণ ছিলেন, ব্রহ্মা বা শঙ্কর ছিলেন না।—

একো নারায়ণ আসীৎ ন ব্রহ্মা ন চ শঙ্করঃ।
আনন্দ এক এবাগ্র আসীন্নারায়ণঃ প্রভুঃ॥

এই নারায়ণের দেহ থেকেই জগৎ সৃষ্টি হয়েছে। বৈকুণ্ঠে নারায়ণ লক্ষ্মী ভূমি ও লীলা দেবী এই তিন পত্নীর সঙ্গে সুখে বাস করেন। স্বরূপাবস্থায় তিনি গুণাতীত, কিন্তু মায়ার সঙ্গে যুক্ত হলেই সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণ বিষ্ণু ব্রহ্মা ও শিব রূপে জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ হন।

বিষ্ণুর দেহ থেকে দেবতাদের উৎপত্তি হয়েছে।

মধ্বের ব্রহ্ম বা বিষ্ণু দিব্যদেহধারী, অনন্ত মূর্তিমান ও সচ্চিদানন্দময়। তাঁর মতে পদার্থ শুধু দুটি—স্বতন্ত্র ও পরতন্ত্র। একমাত্র বিষ্ণুই স্বতন্ত্র ও স্বাধীন সত্তা, আর সব পদার্থই পরতন্ত্র বা বিষ্ণুর অধীন। বিষ্ণু নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয় নন, তিনি সগুণ ও সক্রিয়। তিনি জগতের নিমিত্ত কারণ এবং জড় প্রকৃতিই জগতের উপাদান কারণ।

শঙ্করের অদ্বৈত মত তিনি গ্রহণ করেন নি। তিনি দ্বৈতবাদী। জীব ও জগৎ ব্রহ্মের সৃষ্টি এবং তাঁর সৃষ্টিতে তিনি অনুপ্রবিষ্ট, কিন্তু জীব ও জগৎ থেকে তিনি ভিন্ন। শঙ্করের ব্রহ্ম নির্বিশেষ মত তিনি মেনে নেন নি। তিনি বলেছেন যে শঙ্করের নির্গুণ ও নির্বিশেষ ব্রহ্ম বৌদ্ধ মাধ্যমিক শূন্যবাদীদের শূন্য থেকে ভিন্ন নয়। শঙ্করকে তিনি প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলে অভিযোগ করেছেন।

মধ্বের এই দ্বৈতবাদের সঙ্গে পাশ্চাত্যের দ্বৈতবাদের কিছু পার্থক্য আছে। পাশ্চাত্যের দ্বৈতবাদে বিশ্বাস করা হয় যে জীব ও জগৎ সৃষ্টি করে ঈশ্বর তা থেকে ভিন্ন হয়ে আছেন। মধ্ব এই মতের সঙ্গে একটু যোগ করেছেন। তিনি বলেছেন যে ঈশ্বর জীব ও জগৎ থেকে ভিন্ন হয়ে থাকলেও তিনি সর্বত্র অনুপ্রবিষ্ট হয়ে আছেন।

মহোপনিষদের একটি উক্তি থেকে তাঁর মতের কিছু আভাস পাওয়া যায়। পক্ষী ও সূত্রে, বৃক্ষ ও রসে, নদী ও সমুদ্রে, শুদ্ধ জল ও লবণে, চোর ও অপহৃত দ্রব্যে পুরুষ ও ইন্দ্রিয়ে যেমন প্রভেদ, তেমনি ঈশ্বর ও জীবও পরস্পর ভিন্ন ও বিলক্ষণ।—

যথা পক্ষী চ সূত্রঞ্চ নানা বৃক্ষরসা যথা।
যথা নদ্যঃ সমুদ্রাশ্চ শুদ্ধোদলবণে যথা॥
চৌরোপহার্যৌ চ যথা যথা পুংবিষয়াবপি।
তথা জীবেশ্বরৌ ভিন্নৌ সর্বদেববিলক্ষণৌ॥

মধ্বের মতে ঈশ্বর ও জীবে এবং ঈশ্বর ও জড় জগতে যেমন ভেদ আছে, তেমনি জীবে জীবে জড়ে জড়ে এবং জীব ও জড়েও পরস্পর ভেদ আছে।

জীব জ্ঞান স্বরূপ ও জ্ঞাতা কর্তা ভোক্তা অনু ও বহু। মুক্ত জীবও ঈশ্বর থেকে ভিন্ন, কিন্তু ব্রহ্মের অধীন সেবক উপাসক ও দাস। তাঁর মতে মোক্ষ দুঃখের অভাব নয়, পরিপূর্ণ আনন্দ ঘন এক অবস্থার নাম মোক্ষ। তিনি মনে করেন যে জীবিত অবস্থায় মুক্তি সম্ভব নয়, মুক্তির জন্য দেহত্যাগের অপেক্ষা করতে হয়। এই বন্ধনের মূল কারণ হলো অবিদ্যা। তাই বিদ্যা বা জ্ঞানার্জনই মুক্তির প্রথম সোপান। জ্ঞান থেকে ভক্তি ও ভক্তি থেকে ধ্যানের জন্ম। জ্ঞান ভক্তি ও ধ্যানেই মুক্তির সাধনা। ঈশ্বরের প্রসাদ লাভ করেই মুক্তি হয়।

আর একটি নতুন কথা বলেছেন মধ্ব। ব্রহ্ম ও জীব জগতের অভেদ জ্ঞান জীবের অনন্ত নরকবাসের কারণ হয়। ভারতীয় দর্শনে এই নরকবাসের কথা আর কেউ বলেন নি। মধ্ব বলেছেন যে ব্রহ্মের সঙ্গে জীবের সাক্ষাৎ সংস্পর্শ সম্ভব নয়। তাঁর দর্শন ও প্রসাদ পেতে হলে বিষ্ণুর পুত্র ও প্রিয় বিগ্রহ বায়ুর শরণাপন্ন হতে হবে। এই কথায় মনে পড়বে যে নারায়ণ পণ্ডিত তাঁর 'মধ্বাচার্য বিজয়' গ্রন্থে লিখেছেন যে নারায়ণের আদেশে স্বয়ং বায়ুই মধ্ব নামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ঈশ্বরের কৃপালাভের জন্য ঈশ্বরপুত্রের মধ্যস্থতার প্রয়োজন আছে। এই মতবাদও ভারতীয় দর্শনে বিরল।

সংক্ষেপে বলা যায় যে মধ্বর প্রধান সিদ্ধান্ত ন'টি। তিনি প্রত্যক্ষ অনুমান ও শব্দ এখানে মেনে নিয়েছিলেন। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সত্য হলো ব্রহ্মা বিষ্ণু বা হরি এবং তিনিই শাস্ত্রের একমাত্র প্রতিপাদ্য। জীব-জগৎ সত্য ও বিষ্ণু থেকে ভিন্ন। জীবও বদ্ধ ও মুক্ত ভেদে পরস্পর ভিন্ন। তারা বিষ্ণুর সেবক এবং তাঁর কৃপা লাভেই মুক্তি। শ্রদ্ধা ও ভক্তি দিয়ে এই মুক্তির সাধনা। মধ্বই শঙ্কর ও অন্যান্য অদ্বৈতবাদীদের প্রধান সমালোচক। অদ্বৈতমতে নরকবাস করতে হবে, এ তাঁর গোঁড়ামির পরিচয়।

রামানন্দ ও ভক্তিবাদ

দক্ষিণ ভারতে যখন রামানুজ নিম্বার্ক ও মধ্ব শঙ্করের অদ্বৈত মত খণ্ডন করে বৈষ্ণব মত সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন, উত্তর ভারতে তখনও কোনো শক্তি-

শালী মহাপুরুষের আবির্ভাব হয় নি। শৈবতীর্থ কাশীতেও রাঘবানন্দ ছিলেন রামানুজ সম্প্রদায়ের সুপণ্ডিত। কাশীতে বিদ্যাধ্যয়নে এসে রামানন্দ এঁরই শিষ্য হয়েছিলেন। রামানন্দের জন্ম ১২৯৯ খ্রীষ্টাব্দে, অর্থাৎ মধ্বের ঠিক একশো বছর পরে। জ্যোতিষীরা তাঁকে স্বল্পায়ু বলেছিলেন। কিন্তু শুনে আশ্চর্য হতে হয় যে তিনি তিনটি শতাব্দী দেখেছিলেন, তাঁর মৃত্যু হয়েছিল ১৪১০ খ্রীষ্টাব্দে। অর্থাৎ একশো এগারো বছর বয়সে। রামানুজ বেঁচে ছিলেন একশো কুড়ি বছর। কিন্তু তিনি দুটি শতাব্দী দেখেছিলেন। তাঁর জীবনকাল ১০১৭ থেকে ১১৩৭ খ্রীষ্টাব্দ।

প্রথমেই বলা ভাল যে রামানন্দের জন্ম প্রয়াগে কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণ কুলে। তাঁর পিতার নাম পুণ্যসদন ও মাতার নাম সুশীলা। ধর্মীয় দর্শন পড়বার সময়ে রামানন্দের পরিচয় হয় রাঘবানন্দের সঙ্গে। রামানুজ তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে দীর্ঘকাল গুরুর সেবা করেন ও পরে তীর্থভ্রমণে বহির্গত হন। এই তীর্থভ্রমণ শেষ করে কাশীতে ফেরার পরে তাঁকে এক নূতন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়। তাঁর সতীর্থরা বললেন, ভোজ্য ও ভোজন গোপন করা আমাদের শ্রীসম্প্রদায়ের কর্তব্য ; কিন্তু ভ্রমণকালে তুমি নিশ্চয়ই এ নিয়ম পালন করতে পার নি। কাজেই আমরা আর তোমার সঙ্গে একত্র আহার করতে পারি না। গুরু রাঘবানন্দও এই মত সমর্থন করলেন দেখে ক্ষুব্ধ ও অপমানিত রামানন্দ মঠ ত্যাগ করলেন। সংস্কার-মুক্ত মন নিয়ে তিনি নূতন মঠ স্থাপন করলেন কাশীর পঞ্চগঙ্গা ঘাটে। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে ধর্মকে আচারে আবদ্ধ করে রাখলে চলবে না। তাই মুক্ত পুরুষের মতো তিনি সমস্ত বাহ্য আচার ছেড়ে ছিলেন, ব্রাহ্মণেতর জাতিকে টেনে নিলেন বুকে। কষ্টবোধ্য সংস্কৃত ভাষাকে বর্জন করে চল্‌তি ভাষায় সবাইকে উপদেশ দিতে লাগলেন।

রামানন্দর সব চেয়ে বড় কাজ হলো ধর্মকে আচার নিয়মের কঠিন বন্ধন থেকে মুক্ত করে জনসাধারণের উপযোগী করে তোলা। এই কাজের জন্য তিনি জাতি ধর্ম নির্বিশেষে বারো জন ভক্ত শিষ্য গ্রহণ করেছিলেন। নাভাজীর 'ভক্তমাল' গ্রন্থ অনুসারে তাঁরা হলেন কবীর, পীপা, সেনা, ধন্না,

রায়দাস, অনন্তানন্দ, সুখা, সুর, নরহরি, ভাবানন্দ, পদ্মাবতী ও সুরেশ্বরী। এই গ্রন্থে এঁদের পরিচয়ও আছে। পদ্মাবতী ও সুরেশ্বরী নারী এবং অন্যরা পুরুষ ও বিচিত্র তাঁদের পরিচয়। কবীর ছিলেন মুসলমান জোলা, পীপা রাজপুত রাজা, সেনা নাপিত, ধন্না জাঠ, রায়দাস বা রবিদাস ছিলেন মুচি। আবার ব্রাহ্মণও ছিলেন—অনন্তানন্দ ও সুখা ব্রাহ্মণ বলে পরিচিত। শুধু জাতিধর্ম নির্বিশেষে নয়, স্ত্রী পুরুষকেও তিনি ধর্মাচরণে সমান অধিকার দিয়েছিলেন।

রামানন্দ রামভক্ত ছিলেন এবং তাঁর মূল কথা হলো ভক্তি। কিন্তু এই ভক্তিবাদ তাঁর নিজের কথা নয়। ভক্তি শব্দের উৎপত্তি ভজ ধাতু থেকে। অর্থাৎ ভজন বা হৃদয়ের ভগবদাকারে অবস্থান। আবার যা দিয়ে হৃদয়কে ভগবদাকারে করা যায় সে অর্থে সাধন কীর্তনকেও ভক্তি বলা যায়। ধর্মচর্চায় ভক্তিবাদ যে দক্ষিণ ভারত থেকে উত্তর ভারতে এসেছে তাতে সন্দেহের অবকাশ থাকা উচিত নয়। পদ্মপুরাণে ভক্তি নিজেই বলছেন, আমার উৎপত্তি দ্রবিড়ে, বৃদ্ধি কর্ণাটে, মহারাষ্ট্রে কিছুকাল স্থিতির পর জীর্ণ হয়েছি গুজরাতে।—

উৎপন্না দ্রবিড়ে চাহং কর্ণাটে বৃদ্ধিমাগতা।
স্থিতা কিঞ্চিৎ মহারাষ্ট্রে গুর্জরে জীর্ণতাং গতা॥

—পদ্মপুরাণ, উত্তর খণ্ড, ৫০-৫১।

বিষ্ণুপুরাণেও দেখা যায় যে ভক্তির উপদেষ্টা কলিঙ্গ দেশীয়। বিষ্ণুপুরাণ, সপ্তম অধ্যায়, ৩। এই ভক্তিবাদের জন্ম কোন্ সময়ে তা সঠিক জানা না গেলেও দেখা গেছে যে রামানুজের অনেক পূর্বেও এই মতবাদ সগৌরবে প্রচলিত ছিল। পঞ্চম থেকে দশম শতাব্দীর মধ্যে আড়বার বা ঈশ্বর-প্রেমে আত্মহারা ভক্তরা দিব্য প্রবন্ধাবলী রচনা করেন। তাঁদের পরে নানা বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা হয়। যমুনাচার্য শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা হলেও রামানুজের খ্যাতি অনেক বেশি। রামানুজ যুক্তি দিয়ে একে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছিলেন। রামানুজ সম্প্রদায়ভুক্ত রামানন্দ উত্তরাধিকার সূত্রে তা পেয়েছিলেন বললে অন্যায় হবে না। কবীরও এই কথাই

বলেছেন—

ভক্তি দ্রাবিড় উপজী লায়ে রামানন্দ।

প্রগট কিয়ো কবীর নে সপ্তদ্বীপ নৌ খণ্ড॥

জাতের কথা জানতে চাইবে না, আর কার সঙ্গে আহার করছ সে কথাও না। যে হরির ভজনা করে, সে-ই হরির।—

জাতি পাঁতি পুছাই নাহি কোই।

হরিকো ভজে সো হরি কা হোই॥

রামানন্দ নিজে বোধহয় কিছু লিখে যান নি। লিখে থাকলেও কোনো সংকলন গ্রন্থ এখন পাওয়া যায় না। তাঁর নামে শিখধর্মের আদিগ্রন্থে একটিমাত্র গীতি কবিতা পাওয়া যায়।

একদিন বিষ্ণুপূজার নিমন্ত্রণ পেয়ে তিনি বলেছিলেন, আমি কোথায় যাব! নিজের গৃহেই তো আমি সুখী! আমার হৃদয় তো আমার সঙ্গে যাবে না! দুর্বল হয়েছে হৃদয়। এক দিন আমার যাবার ইচ্ছা হয়েছিল। আমি চন্দন ঘষেছিলাম, চুয়া আর সুগন্ধ নিয়ে ভগবানের পূজার জন্য মন্দিরের দিকে চলেছিলাম। গুরু তখন আমার হৃদয়ের মধ্যেই ভগবানকে দেখিয়ে দিলেন। এখন আমি যেখানেই যাই, সেখানে শুধু জল আর পাথর দেখি। হে প্রভু, তুমি তো সব জিনিসের মধ্যেই আছ! বেদ-পুরাণ সব খানি দেখেছি ও খুঁজেছি। ভগবান এখানে না থাকলে তুমি সেখানে যাও।—

কত জাইঐ রে ঘর লাগ্যু রংগু।...

এক দিবস মন ভই উমংগ।

ঘসি চংদন চোআ বহু সুগন্ধ

পূজন চালী ব্রহম ঠাই।

সো ব্রহমু বতাইও গুর মনহী মাহি॥

জহা জাইঐ তঁহ জল পখানা।...

বেদ পুরাণ সভ দেখে জোই।

উঁহা তউ জাই ঐ জউ ঈহাঁ ন হোই॥

প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রে ভক্তির কথা একেবারে ছিল না বললে অন্যায় হবে।

পুবাণ মহাভারতে তো আছেই, বেদ উপনিষদেও আমরা ভক্তির কথা পেয়েছি। বরুণের উদ্দেশে বশিষ্ঠ যে স্তবগুলি রচনা করেছিলেন ঋগ্বেদের সপ্তম মণ্ডলের সেই স্তবগুলি ভক্তি বসেবই পরিচায়ক। দীর্ঘতমা ঋষি বিষ্ণুকে বলছেন, উরুবিক্রমা বিষ্ণুব পবমপদে মধুব উৎস আছে, তিনি প্রকৃতই বন্ধু।—

উরুক্রমস্য স হি বন্ধুরিত্থা বিষ্ণোঃ পদে পরমে মধ্ব উৎসঃ।

—ঋগ্বেদ ১।১৫৪।৫

দৈত্যকুলজাত প্রহ্লাদ নিষ্কাম ভক্তিব কথা বলেছেন। ভক্তিব মধ্যে শুধু আত্মনিবেদনই থাকবে, থাকবে না কোনো ফললাভেব বাসনা। তা থাকলে ভক্তিবই অপমান হবে। মহাভারতেব অন্তর্গত গীতায এই ভক্তিব কথা বলেছেন কৃষ্ণ। এই বকমেব অসংখ্য নিদর্শন আছে ছড়িয়ে।

অনেকে মনে কবেন যে এই ভক্তিবাদ ভাবতেব আদিম সভ্যতায় বিদ্যমান ছিল এবং পববর্তীকালে আর্যেতব জাতিব নিকট থেকেই আর্যবা এই ভক্তিবাদ গ্রহণ কবেছিল। তাই ঐতিহাসিক কালে দ্রাবিড় দেশে আলোয়াব মুনিদেব ববখাতেই তা পুনবায বিকাশ লাভ কবে। ভাবতেব এই প্রাচীন বাণীকে উত্তব ভাবতে বহন কবে আনেন বামানন্দ। তাঁব সুযোগ্য উত্তব সাধক কবীব তা জনসাধাবণেব মধ্যে পবিব্যাপ্ত কবে দেন। শুধু কবীব নন, নামদেব, সদনা, দাদু, বজ্জব, সুন্দবদাস প্রভৃতি মধ্যযুগেব আবও অনেক সন্ত কবি ঈশ্বরেব আবাধনায ভক্তিকেই সব চেয়ে বড কবে দেখিয়ে গেছেন।

বামানন্দ দেহত্যাগ কবেছেন একশো এগাব বছব বয়সে ১৩১০ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁব সম্প্রদায এখন বামাৎ সম্প্রদায নামে পবিচিত। ওঁবা বাম ভক্ত। এই সম্প্রদাযেবও অনেকগুলি শাখা আছে। বামানন্দেব শিষ্য প্রশিষ্যের নামে সেই শাখাগুলি এখন পবিচিত। তাদেব মধ্যে প্রধান হলো কবীবপন্থা, দাদূপন্থা, খাকা, মুলুকদাসী, বয়দাসী, সেনপন্থী ও বাম সনেহী। শ্রেষ্ঠ রাম ভক্তেব আসন পেয়েছেন কবি তুলসীদাস। ধর্মের সংকীর্ণ গণ্ডি ছাড়িয়ে তিনি অমব কবি রূপেই বিশ্বের দরবাবে স্থান পেয়েছেন।

চৈতন্যদেব ও অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদ

চৈতন্যদেবের জন্ম বাংলার নবদ্বীপে ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ফাল্গুনী গ্রহণ পূর্ণিমার সন্ধ্যায়। তাঁর পিতা জগন্নাথ মিশ্রের পৈত্রিক নিবাস ছিল শ্রীহট্টে। তিনি পুত্রের নাম রাখেন বিশ্বম্ভর। জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম রেখেছিলেন বিশ্বরূপ। তাঁদের মাতার নাম শচীদেবী। নিমাই চৈতন্যদেবের ডাক নাম। তাঁর বয়স যখন ছয় সাত বৃছর তখন বড় ভাই বিশ্বরূপ গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে নিরুদ্দেশ হন। দীর্ঘদিন পরে তীর্থভ্রমণ কালে চৈতন্যদেব পন্দারপুরে মাধবেন্দ্র পুরীর এক শিষ্য রঙ্গ পুরীর নিকটে জানতে পারেন যে বিশ্বরূপ দেহরক্ষা করেছেন।

পিতার মৃত্যুর পর ষোল বৎসর বয়সে চৈতন্যদেব অধ্যাপনা আরম্ভ করেন এবং নিজে পছন্দ করে বল্লভ আচার্যের কন্যা লক্ষ্মীপ্রিয়াকে বিবাহ করেন। কিছু দিনের জন্য অধ্যাপনার কাজে তিনি যখন শ্রীহট্টে ছিলেন। সেই সময়ে সাপের কামড়ে তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু হয়। তিনি ফেবার পরে তাঁব মা সনাতন রাজ-পণ্ডিতের বয়স্থা কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়াব সঙ্গে তাঁব পুনরায বিবাহ দেন।

এর কিছুকাল পবে তিনি পিতৃক্রিয়ার জন্য গয়ায় যান। এখানে তিনি মাধবেন্দ্র পুরীর প্রধান শিষ্য ঈশ্বর পুরীর নিকট দশাক্ষর গোপাল মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেন। এরপর থেকেই তাঁর জীবনে পরিবর্তন আসে। তিনি অধ্যাপনার কাজ ছেড়ে নবদ্বীপের বৈষ্ণব গোষ্ঠীতে যোগ দেন এবং সবাইকে সংকীর্তন শেখাতে থাকেন—

হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন॥

এক দিন তাঁকে ভাবাবিষ্ট দেখে তাঁর ভক্তরা তাঁকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করেন।

চৈতন্যদেব সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন চব্বিশ বৎসর বয়সে। কাটোয়ার কেশব ভারতী শিষ্যের নাম দেন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। এর পরে তিনি নীলাচল পুরীতে বসবাস করতে আসেন। প্রথমেই তিনি তীর্থভ্রমণে বেরিয়ে

আলালনাথ থেকে শ্রীকাকুলমের নিকট কূর্মস্থান, সীমাচলমে জিয়ড় নৃসিংহ ক্ষেত্র, গোদাবরী নদী পেরিয়ে মল্লিকার্জুন, অহোবলম, শ্রীরঙ্গম হয়ে সেতু-বন্ধ রামেশ্বর পর্যন্ত যান। তারপরে কেরল ও মহারাষ্ট্রের কোলাপুর পন্দর-পুর নাসিক প্রভৃতি তীর্থদর্শন করে গোদাবরীর তীর ধরে পুরীতে ফিরে আসেন। বছর চারেক পরে তিনি গৌড়ের পথে মথুরা বৃন্দাবনেও ঘুরে আসেন। এই ভাবে ছয় বৎসর তীর্থভ্রমণে কাটবার পরে জীবনের শেষ আঠারো বছর তিনি নীলাচলেই কাটিয়েছিলেন।

যাঁরা তাঁর জীবনের কথা লিখেছেন, তাঁরা তাঁর মৃত্যুর কথা লিখে রেখে যান নি। পরবর্তীকালে রচিত জয়ানন্দের জীবনীকাব্য চৈতন্যমঙ্গল থেকে জানা যায় যে পুরীর রথযাত্রায় রথের সামনে নাচবার সময়ে তাঁর পায়ে একটি ইটের কুচি বিদ্ধ হয়। এরই ফলে ব্যাধিগ্রস্থ হয়ে তাঁর মৃত্যু হয় ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দের আষাঢ় মাসে। তখন তাঁর বয়স সাতচল্লিশ বৎসর।

চৈতন্যের ভক্তদের মধ্যে নিত্যানন্দ, যবন হরিদাস, জগাই ও মাধাই, রূপ ও সনাতন প্রভৃতি নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তক বলা হয়। তিনি জাতি ধর্ম উচ্চনীচ ও পণ্ডিত মূর্খ নির্বিশেষে তার ভক্তি ধর্মের প্রচার করেছিলেন। শুধু ঈশ্বরে ভক্তি নয়, জীবে দয়াও ভক্তির সহায়ক। আর এই ভক্তি ভাব উদ্দীপ্ত করবার জন্য নাম সংকীর্তন - এই তিনটি নির্দেশের উপরেই চৈতন্য জোর দিয়েছিলেন। তাঁর এই মতবাদকে ধর্ম বা রিলিজিয়ন বলা ঠিক হবে না। একে ধর্মের নৈতিক বা আধ্যাত্মিক অনুশাসন বলাই উচিত হবে। তিনি বলেছেন যে মানুষের জাতি বা বর্ণ প্রধান নয়। প্রধান হলো মানুষের আধ্যাত্মিক চেতনা। অভ্যাসের দ্বারা সকল মানুষই সমান অধ্যাত্মশক্তির অধিকারী হতে সক্ষম।

সাধারণ মানুষের মনে এই ধারণার জন্ম হতেই তারা নিজেকে চিনল, আত্মপ্রত্যয় এলো মনে। ভূত ভবিষ্যতের কথা ভুলে বর্তমানকেই তারা প্রাধান্য দিতে শিখল। এত কাল যাদের দৃষ্টি অতীতে ছিল নিবদ্ধ, তারা বুঝতে পারল যে বর্তমানই সব ; যা করবার তা বর্তমান কালেই করতে

হবে। অতীতকে নিয়ে পড়ে থাকলে চলবে না। ভবিষ্যতেব ভাবনাও অবাস্তব। সৃষ্টিব আদিতে মানুষেব মধ্যেই হয়েছে প্রাণেব প্রকাশ, মানুষেবই আধ্যাত্মিক চেতনায জন্ম হযেছে দেবতাব. নিজেব আদর্শ দিয়ে মানুষ দেবতাকে গড়েছে। তাই—

'কৃষ্ণেব যতেক খেলা, সবোত্তম নবলীলা,
নববপু তাঁহাব স্বৰূপ।'

কৃষ্ণ আমাদেবই মতো মানুষ, সেই মানুষকে আমবা উপেক্ষা কবব কোন্ অধিকাবে। চৈতন্য এই নূতন চিন্তাধাবা জনমানসে প্রতিবিম্বিত কবে দিলেন, প্রেম ধর্মে দীক্ষা দিলেন সকলকে। শুধ ধর্মে ও আধ্যাত্মিক চিন্তায নয, সমাজেব সর্বক্ষেত্রে এই ভাবনা প্রতিফলিত হলো। বাঙালী পেল তাব নিজস্ব সঙ্গীত ও সাহিত্য, নবযুগেব সূচনা হলো বাঙলায।

চৈতন্যেব এই মতবাদ গৌড়ীয বৈষ্ণববাদ নামে অভিহিত হলো। তাব শিষ্য ৰূপ, সনাতন বামানন্দ, সার্বভৌম, স্বৰূপ দামোদব চৈতন্যেব কাছে জেনেছিলেন তাঁব জীবতত্ত্ব ও কৃষ্ণতত্ত্ব ভক্তি ও বসতত্ত্ব। গৌড়ীয বৈষ্ণব মতে জীব ও জগৎ ব্রহ্মেবই শক্তি এবং ব্রহ্মেব সঙ্গে একই সমযে তাব ভেদ ও অভেদ সম্পর্ক আছে। আপাতদৃষ্টিতে এই কথা অসম্ভব মনে হতে পাবে। শ্রুতার্থাপত্তি নামে প্রমাণেব সাহায্যে এই মত প্রতিষ্ঠিত হযেছে। গৌড়ীয বৈষ্ণবেবা একেই বলেছেন অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ।

গৌড়ীয বৈষ্ণববাদেব প্রধান দার্শনিক গ্রন্থ 'ভাগবত সন্দর্ভ' বচনা কবেছিলেন জীব গোস্বামী। এই গ্রন্থেব অনুব্যাখ্যায তিনি অচিন্ত্যভেদাভেদবাদেব প্রতিষ্ঠা কবেছেন। কৃষ্ণদাস কবিবাজেব 'চৈতন্য চবিতামৃত'-এ গৌড়ীয বৈষ্ণব দর্শনেব সকল তত্ত্বই সবল বাঙলায লিপিবদ্ধ হযেছিল

বল্লভ ও শুদ্ধাদ্বৈতবাদ

বল্লভেব জন্ম ১৪৭৯ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁব পিতা লক্ষ্মণ ভট্ট অন্ধ্র প্রদেশেব ব্রাহ্মণ ছিলেন, কিন্তু বল্লভেব জন্ম হযেছিল বাবাণসীব নিকট চম্পাবণ্যে। লক্ষ্মণ ভট্ট বেদেব ভাষ্যকাব বিষ্ণুস্বামীব সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। তাঁবা স্বামী-স্ত্রী

তীর্থ পর্যটনে বেরিয়ে বারাণসীতে এসেছিলেন। এইখানে বারাণসীর অধিবাসীদের সঙ্গে ধর্মাচরণ নিয়ে বিষ্ণুস্বামীর বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদ মতাবলম্বীদের বিবাদ বাধে। বিরোধ এমন ভয়াবহ আকার ধারণ করে যে লক্ষ্মণ ভট্ট প্রাণের ভয়ে স্ত্রীকে নিয়ে বারাণসী ত্যাগ করতে বাধ্য হন। তাঁর স্ত্রী যল্লমাগারু তখন অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন এবং পথকষ্টে আট মাসে বল্লভের জন্ম হয়। কিংবদন্তী আছে যে অকালে ভূমিষ্ঠ এই শিশুকে একটি গাছতলায় ফেলে রেখে তাঁর পিতামাতা চলে গিয়েছিলেন। পরে অলৌকিক ভাবে তাঁরা সেই শিশুকে ফিরে পান।

কিছুকাল বারাণসীতে বাস করবার পর লক্ষ্মণ ভট্ট পুত্র বল্লভকে নিয়ে বৃন্দাবনের নিকট গোকুলে বাস করতে আসেন। তাঁর শিক্ষা আরম্ভ হয় নারায়ণ ভট্টের নিকটে। খুবই অল্প সময়ে তিনি সংস্কৃত সাহিত্য ও দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। কিন্তু এগারো বৎসর বয়সে পিতার মৃত্যুর পর তাঁর শিক্ষা ব্যাহত হয়। এর পরেই তিনি সমাজে সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মাচরণের বৈষম্য দেখে ধর্মশাস্ত্রে মনোনিবেশ করেন।

শোনা যায় যে তিনি বিষ্ণুস্বামীর মতের সারতত্ত্ব গ্রহণ করেছিলেন এবং নিজের মত বলে বালগোপালের উপাসনা প্রচার করেছিলেন। তিনি দক্ষিণ ভারতে গিয়েছিলেন কাজে। সেখানে একজন প্রতিভাবান ব্যক্তি তাঁর ধর্মমত গ্রহণ করেন। তারপর বিজয়নগরে মামার বাড়িতে পৌছলে তাঁকে এক তর্কসভায় বসতে হয়। এই সভা বসে রাজা কৃষ্ণরায়ের দরবারে। প্রতিপক্ষ ছিলেন রাজপণ্ডিতরা। তাঁরা পরাজিত হলে রাজা বল্লভের মত গ্রহণ করেন। এই ঘটনার উল্লেখ আছে 'ভক্তমাল' গ্রন্থে।

এর পর তিনি উজ্জয়িনী ও উত্তর ভারতের নানা স্থানে ভ্রমণ করে তাঁর নূতন ধর্মমত প্রচার করেন। প্রথম জীবনে তিনি ব্রহ্মচারী ছিলেন, পরে বিবাহ করেন। বত্রিশ ও সাঁইত্রিশ বৎসর বয়সে তাঁর দুই পুত্র জন্মে। বারাণসীতে তাঁর বাড়ি ছিল এবং শেষ জীবনে প্রায়ই বৃন্দাবনে আসতেন। সেখানে শ্রীনাথের মন্দিরটি তিনিই স্থাপন করেছিলেন। উত্তর ভারতের নানা স্থানে তাঁর বৈঠক আছে। ১৫৩১ খ্রীষ্টাব্দে বাহান্ন বৎসর বয়সে

বারাণসীতে তাঁর মৃত্যু হয়। এই সম্বন্ধে একটি অলৌকিক ঘটনা শোনা যায়। তিনি হনুমান ঘাটে গঙ্গাস্নানে নেমে অন্তর্হিত হয়ে যান এবং সেই স্থান থেকে একটি আগুনের শিখা উঠে সবার চোখের সামনে আকাশে মিলিয়ে যায়।

তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তার মধ্যে প্রধান হলো অনুভাষ্য নামে ব্রহ্মসূত্রের একখানি ভাষ্য। এই গ্রন্থটি তিনি শেষ করতে পারেন নি, এটি সম্পূর্ণ করেছিলেন তার কনিষ্ঠ পুত্র বিঠ্ঠলনাথ।

বল্লভ যে আধ্যাত্মিক মতবাদ প্রচার করেন তা শুদ্ধাদ্বৈতবাদ নামে অভিহিত। শঙ্করের অদ্বৈতবাদের সঙ্গে এই মতের সামান্য পার্থক্য আছে। শঙ্কর শুধু ব্রহ্মকেই সত্য ও জীবজগৎকে মিথ্যা বলেছেন। বলেছেন যে অবিদ্যা বা মায়ার জন্যই আমরা জীবজগৎকে সত্য মনে করি ; জ্ঞানের দ্বারা এই মায়া দূর হলেই বুঝতে পারি যে জীবজগৎ সত্য নয়, সত্য শুধ্ ব্রহ্ম। বল্লভও বললেন যে ব্রহ্মই একমাত্র সত্য ; কিন্তু জীবজগৎও আছে, তা ব্রহ্মেরই অংশ এবং মিথ্যা নয়। এই কারণেই বল্লভের মতবাদ শুদ্ধাদ্বৈতবাদ নামে অভিহিত। তাঁর অদ্বৈতবাদে অবিদ্যা বা মায়ার কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু অবিদ্যা যে বন্ধনের মূল কারণ সে কথাও তিনি বলেছেন।

বল্লভকে বিষ্ণুস্বামীর অনুগামী বলা হয়। তিনি ছিলেন বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদের প্রবর্তক এবং সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য শিষ্য গ্রহণ করতেন না। মহারাষ্ট্রের বিখ্যাত মহাপুরুষ জ্ঞানদেব তাঁর শিষ্য ছিলেন। নামদেব ও ত্রিলোচন জ্ঞানদেবের শিষ্য। এঁরা বল্লভের সমসাময়িক ছিলেন এবং তাঁদের ভক্তি-মূলক রচনা মারাঠী সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ হয়ে আছে।

বল্লভ তাঁর অধ্যাত্ম চিন্তায় দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদের সমন্বয়ের চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেছেন যে জীব ও জড় জগতের সব কিছু নিয়েই ব্রহ্ম। আগুনের ফুল্‌কি যেমন আগুনেরই অংশ, তেমনি জীবাত্মাও ব্রহ্মেরই অংশ। এই ভাবে জড় জগৎও ব্রহ্মেরই অংশ। সৎ চিৎ ও আনন্দ—ব্রহ্মের এই তিন গুণের মধ্যে চিৎ ও আনন্দ শক্তি জড়ে আবৃত আছে, ব্যক্ত আছে তার সত্তা।

বল্লভের মতে ব্রহ্ম সর্বব্যাপী ও সর্বত্র তাঁর অধিষ্ঠান। তিনি একাধারে সৃষ্টির নিমিত্ত কারণ ও উপাদান কারণ। ব্রহ্ম থেকে অভিন্ন ও তাঁর সম্পূর্ণ অধীন হয়েও জীব নিজেকে স্বতন্ত্র মনে করে। এইজন্যেই সংসার চক্রে তার বন্ধ অবস্থা, জন্ম জন্মান্তরেও তার মুক্তি নেই। বল্লভ বিদেহ মুক্তিতে বিশ্বাস করেন। অর্থাৎ তাঁর মতে এই জগতে জীবিত অবস্থায় মুক্তি হয় না, মৃত্যুর পরেই মুক্তিলাভ সম্ভব হতে পারে।

শঙ্করের সঙ্গে আর এক বিষয়ে তাঁর মতের পার্থক্য আছে। শঙ্করের অদ্বৈতবাদে জ্ঞানের প্রাধান্য, কিন্তু বল্লভ ভক্তিবাদকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। ভক্তির ভিত্তিতেই তিনি তাঁর অদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছেন। অথচ গভীর ভাবে ভেবে দেখলে বুঝতে পারা যায় যে ভক্তিবাদের মূলে আছে দ্বৈতবাদ, ঈশ্বরকে ভিন্ন না ভাবলে ভক্তের পক্ষে উপাসনা সম্ভব নয়। আবার অভিন্ন ভাবলে ব্রহ্ম ও জীব জগতের বিরাট প্রভেদের কোনো কারণ পাওয়া যায় না। এইজন্যই পণ্ডিতরা বল্লভের এই শুদ্ধ দ্বৈতবাদ স্ববিরোধ দোষ দুষ্ট বলে মনে করেন। কিন্তু তাঁর এই দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদে সমন্বয়ের চেষ্টা নিঃসন্দেহে সাহসের পরিচায়ক। ভক্তিবাদকে তিনি পুরাতন দার্শনিক মতের ভিত্তির উপরে স্থাপন করেছিলেন।

বল্লভ ভক্তিকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন। যাঁরা শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে উপযুক্ত সাধনা ও নিজের চেষ্টায় মুক্তি লাভ করেন, তাঁদের মর্যাদা ভক্তি। সর্বসাধারণের জন্য পুষ্টি ভক্তি। ঈশ্বরের কৃপায় তাঁরা মুক্তি লাভ করতে পারেন। এর জন্য বনবাসী হয়ে তপস্যার প্রয়োজন নেই, উপবাস প্রভৃতি দৈহিক কষ্ট স্বীকারেরও প্রয়োজন নেই। গৃহস্থ সব রকম সুখ ও আরামের মধ্যে সংসার ধর্ম পালন করেও ঈশ্বরের কৃপালাভে সক্ষম হতে পারে। তাঁর মতে মর্যদা ভক্তরা সাযুজ্য মুক্তি অর্থাৎ ঈশ্বরে মিলিত হন এবং পুষ্টি ভক্তরা প্রাপ্ত হন সালোক্য মুক্তি অর্থাৎ তাঁরা কৃষ্ণের সঙ্গে গোলকে থেকে গোপ গোপীদের সঙ্গে রাসলীলায় যোগ দিতে পারেন।

বল্লভের মতে মধুর ভাব ও শৃঙ্গার রসেরই প্রাধান্য। তাই কৃষ্ণের উপাসনাই মানুষের শ্রেষ্ঠ ধর্ম এবং রাসলীলাই শ্রেষ্ঠ মুক্তি।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

হিন্দুধর্মে সম্প্রদায় ভেদ

বৈষ্ণব সম্প্রদায় : শ্রীসম্প্রদায়—ব্রহ্ম সম্প্রদায়—রুদ্র সম্প্রদায়—সনকাদি সম্প্রদায়—রামানুজ সম্প্রদায়ের শাখা প্রশাখা—আচারী—রামানন্দী বা রামাৎ—কবীর পন্থী—দাদূপন্থী—রুইদাসী—সেনপন্থী—খাকী—মলূকদাসী—রামসনেহী—মীরাবাঈ—তুলসীদাস—বাবকবী বা বিটঠল সম্প্রদায়—চৈতন্য সম্প্রদায় ও তার শাখা প্রশাখা—শঙ্করদেব ও মহাপুরুষিয়া সম্প্রদায়—শৈব সম্প্রদায়—দশনামী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়—দণ্ডী—সন্ন্যাসী—নাগা—অঘোরী—আলেখিয়া—দর্শনী—তপস্বী সন্ন্যাসী—ঠিকরনাথ—স্বর্ভঙ্গী—ব্রহ্মচারী—যোগী—নাথ সম্প্রদায়—বসব ও লিঙ্গায়েৎ সম্প্রদায়—আতুর মানস ও অন্ত সন্ন্যাসী—ভোপা—দশনামী ভাট—শক্তি সম্প্রদায়—কাপালিক—কবারী—ভৈরব ও ভৈরবী—চর্নিযাপন্থ।—গাণপত্য সম্প্রদায়—সৌর সম্প্রদায়।

তেত্রিশ কোটি দেবতার মধ্যে হিন্দুরা নিত্য উপাসনার জন্য মাত্র পাঁচজন দেবতাকে বেছে নিয়েছে। এই দেবতারা হলেন বিষ্ণু, শিব, শক্তি অথাৎ শিবজায়ার নানা রূপ, সূর্য ও গণেশ। তিন প্রধান দেবতার মধ্যে ব্রহ্মা বাদ পড়েছেন, বাদ পড়েছেন দেবরাজ ইন্দ্র এবং বেদ ও পুরাণের অন্য সব দেব দেবী। বিষ্ণুর পত্নী লক্ষ্মীও বাদ পড়েছেন। তাই হিন্দুদের প্রধান পাঁচটি সম্প্রদায় হলো বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত, সৌর ও গাণপত্য। তন্ত্রসারে এই কথা আছে—

> শৈবানি গাণপত্যানি শাক্তানি বৈষ্ণবানি চ।
> সাধনানি চ সৌরাণি চান্যানি যানি কানি চ।
> শ্রুতানি তানি দেবেশ ত্বদ্বক্ত্রান্নিঃসৃতানি চ॥

তন্ত্রসারের এই উক্তি থেকেই বোঝা যাবে যে এক সময়ে এই পাঁচটি

সম্প্রদায় বোধহয় সমান গৌরবের অধিকারী ছিল। কিন্তু বর্তমান কালে সৌর ও গাণপত্য সম্প্রদায়ভুক্ত হিন্দুর সংখ্যা খুবই সামিত, বৈষ্ণব, শৈব ও শাক্তের সংখ্যা তুলনায় অনেক বেশি।

বৈষ্ণব সম্প্রদায়

যাঁরা বিষ্ণুর উপাসক তাঁরাই বৈষ্ণব। পুরাকালে ভাগবত প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার ছিল। মহাভারতের শেষ দিকে বৈষ্ণব শব্দ পাওয়া যায়। বিষ্ণু ঋগ্বেদের দেবতা। বশিষ্ঠ ঋষি বলছেন, হে অভিলাষপ্রদ বিষ্ণু, তুমি তোমার সবজন হিতকারী দোষ রহিত অনুগ্রহ বুদ্ধি আমাদের দাও।—

ত্বং বিষ্ণো সুমতিং বিশ্বজন্যামপ্রযুতামেবয়াব মতিং দাঃ।

ঋগ্বেদ ৭। ১০০।৮

তাঁকে 'গোপা' বা গাভাদের রক্ষক (১।২২।১৮) ও যুবা আকমারঃ বা চির-কিশোর বলা হয়েছে। (১।১৫৫।৬) তেত্তিরায় উপনিষদে তিনি প্রেম স্বরূপ ও আনন্দলাভের উপায় বলা হয়েছে। (২'৭) তাঁকে বরণ করেই তাঁকে লাভ করা যায়। (মুণ্ডক উপনিষদ ৩।২।৩) গীতায় আছে যে তাঁর প্রসাদ ছাড়া তাকে পাওয়া যায় না।

এই বৈষ্ণবদের মধ্যেও আবার অনেকগুলি সম্প্রদায় আছে। শঙ্করাচার্যের সময়ে বৈষ্ণবদের যে সব সম্প্রদায় ছিল, তাদের পরিচয় আর পাওয়া যায় না। বর্তমানে পদ্মপুরাণে বর্ণিত চারটি সম্প্রদায়েরই প্রাধান্য দেখতে পাওয়া যায়। একটি শ্লোকে বলা হয়েছে, যারা সম্প্রদায়বিহান, তাদের মন্ত্র নিষ্ফল। তাই কলিযুগে চারজন সম্প্রদায় প্রবর্তন করবেন। শ্রী, মাধ্বা, রুদ্র ও সনক এই চারজন বৈষ্ণব পৃথিবী পবিত্র করবেন। হে দেবী, এই চারজনই কলি যুগে চারটি সম্প্রদায় প্রবর্তন করবেন।—

সম্প্রদায়বিহানা যে মন্ত্রাস্তে নিষ্ফলা মতাঃ।
অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ॥
শ্রীমাধ্বা-রুদ্র সনকা বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতি পাবনাঃ।
চত্বারস্তে কলৌ দেবি সম্প্রদায় প্রবর্তকা॥ —পদ্মপুরাণ

'প্রমাণ প্রমেয় রত্নাবলীর' একটি শ্লোক থেকে এই চারটি সম্প্রদায় প্রবর্তকের নাম পাওয়া যায়। এই শ্লোকে বলা হয়েছে, লক্ষ্মী রামানুজকে, ব্রহ্মা মধ্বাচার্যকে, রুদ্র বিষ্ণুস্বামীকে এবং সনক সনন্দ সনাতন ও সনৎ কুমার নিম্বাদিত্যকে সম্প্রদায় প্রবর্তক রূপে মেনে নিলেন।—

রামানুজং শ্রীঃ স্বীচক্রে মধ্বাচার্যঞ্চতুর্মুখঃ।
শ্রীবিষ্ণুস্বামিনং রুদ্রো নিম্বাদিত্যং চতুঃ সনঃ॥

হিন্দী 'ভক্তমালেও' এই চারজনের নাম পাওয়া যায়। তাতে বলা হয়েছে যে পূর্বকালে হরি চব্বিশবার দেহ ধারণ করেছিলেন এবং কলিযুগে তিনি চারবার দেহ ধারণ করে ধর্ম সম্প্রদায় প্রবর্তন করেছেন।—

শ্রীরামানুজ উদ্ধার সুধানিধি অবনি কল্পতরু॥
বিষ্ণুস্বামী রোহিত সিন্ধু সংসাব পাব করু॥
মধ্বাচারজ মেঘ ভক্তিশরতসর ভরিয়া।
নিম্বাদিত্য আদিত্য কুহুর অজ্ঞান জ়হরিয়া॥

শ্রী সম্প্রদায়

রামানুজের নামে পরিচিত হলেও রামানুজ এই সম্প্রদায় প্রবর্তন করেন নি। এই সম্প্রদায় প্রবর্তন করেছিলেন লক্ষ্মী দেবী বা শ্রী দেবী। তাঁর নামেই এই সম্প্রদায়ের শ্রী সম্প্রদায় নাম হয়েছে। রামানুজের জন্মের কয়েক শতাব্দী পূর্বে এই ঘটনা ঘটেছিল। এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় এই কারণে যে পরবর্তী কালে আড়বারগণ এই সম্প্রদায়ের পুষ্টি সাধন করেন। আড়বারদের কাল পঞ্চম-ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে দশম শতাব্দী পর্যন্ত। আড়বার শব্দটি তামিল, এর অর্থ ঈশ্বর প্রেমে নিমগ্ন ব্যক্তি। বিভিন্ন সময়ে বারোজন আড়বার জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে অণ্ডাল দেবী নামে একজন মহিলাও ছিলেন। সবাই ব্রাহ্মণ ছিলেন না, সমস্ত বর্ণ থেকেই তাঁরা এসেছিলেন এবং সমাজের সর্ব স্তর থেকে। এক দিকে যেমন রাজা ও জমিদার ছিলেন, তেমনি অন্য দিকে অত্যন্ত দরিদ্রও ছিলেন। তাঁদের মধ্যে বৈরাগ্য ও ভক্তির অপরূপ সমন্বয় ঘটেছিল। তাঁদের দিব্য উক্তিগুলি

'দ্রাবিড় বেদান্ত' নামে চাব হাজাব শ্লোকে সংবক্ষিত আছে। এতে আড়-বাবদেব তত্ত্বজ্ঞান বৈবাগ্য ঈশ্ববানুভব প্রেম ও ভক্তিব পবিচয আছে। তাবা সকলেই মনে-প্রাণে বৈষ্ণব ছিলেন। সংকীর্তন তাঁদেব ভজন ধাবাব একটি মুখ্য অঙ্গ। এই আড়বাবগণ শ্রী সম্প্রদাযেব ভাবধাবাকে এমন ভাবে পবিপুষ্ট কবেছিলেন যে শ্রী সম্প্রদাযকে আড়বাব সম্প্রদাযও বলা হযে থাকে।

এই সম্প্রদাযেব প্রধান আচাযবা হলেন নাথ মুনি, যামুন মুনি, বামানুজ, লোকাচার্য স্বামী প্রভৃতি। বামানুজ আড়বাবদেব 'অমিল বেদান্ত' ও বৈদিক ঋষিব সংস্কৃত বেদান্তেব মধ্যে সমন্বয স্থাপন কবে শ্রী সম্প্রদাযকে সমৃদ্ধ কবেছিলেন। দেশে তখন শৈব মতেব প্রাধান্য ছিল। চোল ও পাণ্ড্য বাজাবা ছিলেন শৈব। বামানুজেব বৈষ্ণব ধর্ম প্রচাব দেখে ত্রিচিবপল্লাব চোল শাসনকর্তা তাঁকে হত্যাব আদেশ দিযেছিলেন। বামানুজ জৈন বাজা বল্লালেব আশ্রযে পালিযে গিযে আত্মবক্ষা কবেছিলেন এবং পববর্তী কালে বাজা বল্লালকেও বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা দেন। তিনি শঙ্কবাচাযেব অদ্বৈতবাদ খণ্ডন কবে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রচাব কবেন। এই মতে সংসাব থেকে মুক্তিব উপায হলো শবণাগতি।

শ্রী সম্প্রদাযকে এখন বামানুজ সম্প্রদাযও বলা হয। লক্ষ্মী-নাবাযণ এই সম্প্রদাযেব উপাস্য দেবতা। বামকৃষ্ণ প্রভৃতি বিভিন্ন অবতাবেবও তাবা পূজা কবেন—কখনও একক ভাবে, কখনও যুগল মূর্তিতে। সম্প্রদাযেব মধ্যে মতভেদ আছে এবং এবই জন্য নানা শ্রেণীব উদ্ভব হযেছে। চাবটি মূল সম্প্রদাযেব বর্ণনাব পবে বামানুজ সম্প্রদাযেব শাখা প্রশাখাব কথা বলা হবে।

ব্রহ্ম সম্প্রদায়

মধ্বাচায এই সম্প্রদাযেব প্রবর্তক বলে একে মধ্বাচাবী সম্প্রদাযও বলা হয। আবব সাগবেব তীবে কর্ণাটক বাজ্যেব দক্ষিণ কানাড়া জেলাব উডুপিতে এই সম্প্রদাযেব মূল কেন্দ্র। মধ্ব এই মন্দিব প্রতিষ্ঠা কবে-

ছিলেন। তিনি আরও আটটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করে আটজন সন্ন্যাসীকে মঠাধ্যক্ষ নিযুক্ত করে যান। তাঁরাই পর্যায়ক্রমে উত্তিপির মন্দিরে অধ্যক্ষের কাজ করেন।

মধ্ব স্পষ্ট ভাষায় দ্বৈতবাদ প্রচার করেন। অর্থাৎ তাঁর মতে জীবাত্মা নিত্য, কিন্তু ঈশ্বরের অধীন; উভয়ে চির সম্বন্ধে আবদ্ধ, কিন্তু এক নয়। যুক্তি দিয়ে তিনি শঙ্করের অদ্বৈতবাদ ও রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ খণ্ডন করেছেন। পরমাত্মায় জীবের লয় বা নির্বাণ মুক্তি তিনি স্বীকার করেন না; শৈবদের যোগ ও বৈষ্ণবদের সাযুজ্যও তিনি মানেন না। তিনি বৈষ্ণব, কিন্তু তাঁর বিচারে শৈব বিদ্বেষ নেই। তিনি বলেছেন যে নারায়ণ বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মী ভূমি ও লীলা দেবী এই তিন পত্নীর সঙ্গে সুখে বাস করেন। কিন্তু তাঁর প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে বিষ্ণুর সঙ্গে শিব পার্বতী ও গণেশের পূজা হয়।

বিষ্ণু ও শিবের সহ-অবস্থান দেখে অনেকে মনে করেন যে মধ্ব নিজে শৈব ছিলেন ও পরে বৈষ্ণব হয়েছিলেন। এই অনুমানের পিছনে কয়েকটি যুক্তিও আছে। সেগুলি হলো—তাঁর দীক্ষা হয়েছিল অনন্তেশ্বর শিবের মন্দিরে, তিনি শঙ্করাচার্য প্রবর্তিত তীর্থ উপাধি গ্রহণ করেন এবং শঙ্করাচার্য ও তাঁর শিষ্যদের মধ্যে শ্রদ্ধা ও প্রীতির সম্পর্ক বর্তমান। সব চেয়ে বড় কথা এই যে তাঁর বিষ্ণু মন্দিরে শৈব দেবতার পূজা হয় এবং তিনি জীবদ্দশায় শৈব ও বৈষ্ণবদের বিবাদ ভঞ্জনে যত্ন নিয়েছিলেন বলে শোনা যায়।

রুদ্র সম্প্রদায়

সাধারণভাবে বল্লভাচার্যকে এই সম্প্রদায়ের প্রবর্তক বলা হয়। কিন্তু ঐতিহাসিক বিচারে জানা যায় যে বল্লভাচার্যের বৈদান্তিক মতবাদ অনেক আগে থেকেই প্রচলিত ছিল। 'প্রমাণ প্রমেয় রত্নাবলী'র মতে বিষ্ণুস্বামী এই সম্প্রদায়ের প্রবর্তক ছিলেন। বিষ্ণুস্বামী বেদের একজন ভাষ্যকার। কিন্তু তাঁর জীবন সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। পণ্ডিত ভাণ্ডারকার বলেছেন যে দিল্লীশ্বরের অধীন একজন দ্রাবিড় রাজার মন্ত্রী ছিলেন বিষ্ণু-

স্বামীর পিতা এবং বিষ্ণুস্বামীর বৈদান্তিক মতেরও আলোচনা করেছেন। এই মতের সঙ্গে বল্লভাচার্যের শুদ্ধাদ্বৈতবাদ মতের কোনো পার্থক্য নেই। অক্ষয়কুমার দত্ত লিখেছেন যে বিষ্ণুস্বামী শুধু সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণকেই শিষ্য-রূপে গ্রহণ করতেন এবং মহারাষ্ট্রের সন্ত কবি জ্ঞানদেব তাঁর শিষ্য। জ্ঞান-দেব বা জ্ঞানেশ্বরের কাল ১২৭৫ থেকে ১২৯৬ খ্রীষ্টাব্দ। এই হিসাবে বিষ্ণুস্বামী ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন বলে মেনে নিতে হয়। কিন্তু জ্ঞানদেবের জীবনীপাঠে জানা যায় যে রামানুজের শিষ্য রামানন্দ কাশীতে জ্ঞানদেবকে সন্ন্যাস ধর্মে দীক্ষা দিয়েছিলেন এবং পরে তাঁর পত্নী আছে জেনে তাঁকে সংসারী হবার আদেশ দিয়েছিলেন। তাঁর একুশ বছরের জীবনে বিষ্ণুস্বামীর সংস্পর্শে কখন এসেছিলেন তা জানা যায় না। ঐতিহাসিকরা বলেন যে বল্লভাচার্যের বহু পূর্বে রাজস্থান, মহারাষ্ট্র ও গুজরাতে বৈষ্ণব ধর্ম প্রসার লাভ করেছিল। খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতকের শেষের দিকে রাজস্থানে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচলিত হয়েছিল। বল্লভাচার্যের কাল ১৪৭৯ থেকে ১৫৩১ খ্রীষ্টাব্দ। তার পূর্বে ভক্ত কবি নরসিংহ মেহতা গুজরাতে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করেন। তাঁর কাল ১৪১৫ থেকে ১৪৮১ খ্রীষ্টাব্দ। এর পরেই বল্লভাচার্য রাজস্থান ও গুজরাতে বালগোপালের পূজার প্রবর্তন করেন। তিনি বলেন যে ঈশ্বরের উপাসনায় উপবাস বা কোনো শারীরিক ক্লেশ স্বীকারের প্রয়োজন নেই। বিষয় সুখে লিপ্ত থেকে তাঁর সেবা হয়। এরই নাম পুষ্টিমার্গ। তাই বল্লভাচারী সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবরা বিষয়াসক্তি ও ভোগবিলাসকে ধর্মের অন্তরায় বলে মনে করেন না।

বল্লভাচার্যের পুত্র বিঠ্ঠলনাথ এই সম্প্রদায়ে রাধাকৃষ্ণের উপাসনার প্রচলন করেন।

সনকাদি সম্প্রদায়

এই সম্প্রদায়ের প্রবর্তক যে নিম্বাদিত্য তাতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। এইজন্য এই সম্প্রদায়ের অন্য নাম নিমাৎ সম্প্রদায়। ইনি নিম্বার্ক নামেও পরিচিত। তাঁর স্বাভাবিক দ্বৈতাদ্বৈতবাদ সম্পর্কে পূর্বেই আলোচনা

করা হয়েছে। তাঁর সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবরা রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তির উপাসনা করেন। শ্রীভাগবত তাঁদের প্রধান শাস্ত্রগ্রন্থ। নিম্বাদিত্যের জন্ম দক্ষিণ-দেশে হলেও তাঁর প্রধান গদি এখন মথুরার নিকটে যমুনার তীরে। তাঁর প্রধান দুই শিষ্য কেশব ভট্ট ও হরিব্যাস নিমাৎ সম্প্রদায়ের দুটি শাখার প্রবর্তন করেছেন। তাদের নাম বিরক্ত ও গৃহস্থ। মথুরা ও ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে এই সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু বল্লভাচারী সম্প্রদায়ের মতো প্রভাব ও প্রতিপত্তি এঁদের নেই।

রামানুজ সম্প্রদায়ের শাখা প্রশাখা

চারটি প্রধান বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে রামানুজ সম্প্রদায়েরই প্রভাব সব চেয়ে বেশি এবং তার শাখা প্রশাখাও অনেক।

আচারী

এই শাখাকেই রামানুজ সম্প্রদায়ের মূল শাখা বলা যায়। রামানুজ ও তাঁর প্রথম দিকের শিষ্যদের উপাধি ছিল আচার্য এবং তাঁরা বিষ্ণুর উপাসক ছিলেন। এই আচার্য শব্দ থেকেই আচারী সম্প্রদায়। এঁরা সকলেই ব্রাহ্মণ ও বিষ্ণুর উপাসক। শুধু দক্ষিণ ভারতে নয়, উত্তর ভারতেও এঁরা ছড়িয়ে আছেন।

রামানন্দী বা রামাৎ

রামানন্দ রামানুজের শিষ্য বা প্রশিষ্য ছিলেন না। তার জন্ম উত্তর ভারতে রামানুজের বহুকাল পরে। কিন্তু তিনি বামানুজ সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন বলে তাঁর প্রতিষ্ঠিত রামাৎ সম্প্রদায় রামানুজ সম্প্রদায়ের শাখা হিসাবে গণ্য হয়ে থাকে। রামানুজ সম্প্রদায়ের কঠিন আচার নিয়ম রামানন্দ তাঁর তীর্থভ্রমণ কালে পালন করতে সক্ষম হন নি বলে তিনি গুরু কর্তৃক বিতাড়িত হন এবং বিদ্রোহী রামানুজ তাঁর প্রতিষ্ঠিত নূতন সম্প্রদায় থেকে এই সব আচার নিয়ম তুলে দেন। রামানুজসম্প্রদায়ে ব্রাহ্মণের আধিপত্য

ছিল ; কিন্তু রামানন্দ জাতিধর্ম নির্বিশেষে তাঁর শিষ্য গ্রহণ করে বৈষ্ণব সমাজে জাতি ও বর্ণভেদ তুলে দিলেন। তাঁর প্রধান দ্বাদশ শিষ্য নানা ধর্ম ও বর্ণ থেকে তার সম্প্রদায়ে যোগ দেন এবং নানা শাখা প্রশাখায় রামানন্দী সম্প্রদায়কে জনপ্রিয় করে তোলেন

রাম রামানন্দী সম্প্রদায়ের ইষ্টদেবতা। এইজন্য এই সম্প্রদায়ের অন্য নাম রামাৎ সম্প্রদায়। এঁরা রাম ও সীতার যুগল এবং পৃথক মূর্তির পূজা করে থাকেন। অনেকে বিষ্ণুর অন্যান্য মূর্তি ও শালগ্রাম শিলার উপরে পূজাও করে থাকেন।

কবীর পন্থী

রামানন্দের শিষ্যদের মধ্যে প্রধান হলেন কবীর। আনুমানিক ১৪৪০ খ্রীষ্টাব্দে কাশীতে তার জন্ম। প্রবাদ যে তিনি কোনো ব্রাহ্মণ বিধবার সন্তান। লোকলজ্জার ভয়ে মা তাকে পরিত্যাগ করলে এক মুসলমান জোলা দম্পতি এই শিশুকে লালন করে। শৈশবেই তার ঈশ্বর ভাবনার উন্মেষ হয় এবং তিনি গুরুর অন্বেষণ করেন। শোনা যায় যে এক দিন শেষ রাতে তিনি গুরুলাভের আশায় গঙ্গার ঘাটে শুয়েছিলেন। অন্ধকারে তার দেহে পা লাগলেই রামানন্দ 'রাম রাম' বলে ওঠেন। কবীর এর পর থেকেই রামানন্দের শিষ্য রূপে পরিচিত হন এবং রামমন্ত্রই গ্রহণ করেন। কবীর অশিক্ষিত ছিলেন। জ্ঞানলাভের জন্য তিনি ভারতের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করেন। অনেকে বলেন যে কবীর বিবাহ করেন নি। কিন্তু লোঈ নামে এক নারীর সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দেখে অন্যান্যরা মনে করেন যে এই নারী তার শিষ্যা নয় তার স্ত্রী ছিলেন। কবীরের এক পুত্র ও এক কন্যাও ছিল। তিনি তাঁত বুনে সংসার চালাতেন। ১৫১৮ খ্রীষ্টাব্দে আটাত্তর বৎসর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।

যত দূর জানা যায় কবীর তার তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেছিলেন হিন্দু যোগী ও দার্শনিক এবং মুসলমান সুফীদের সংস্পর্শে এসে। তাঁর নিজস্ব উপলব্ধির ক্ষমতা ও স্বভাব কবিত্ব তাঁর সহায় হয়েছিল। তিনি ভক্তি ও নিষ্ঠা

সহকারে তাঁর জ্ঞানের কথা সহজ ভাষায় কীর্তন করতে আরম্ভ করলে জনসাধারণ তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হতে শুরু করে। কবীরের ধর্মে হিন্দু-মুসলমান ভেদের কথা ছিল না, ছিল সমন্বয় সাধনের চেষ্টা। ধর্মের কঠিন আচার-অনুষ্ঠানের তিনি বিরোধী ছিলেন, সমাজের অপ্রয়োজনায় রীতি নীতি ও সংস্কার তিনি বর্জন করেছিলেন। তাই এক দিকে যেমন ধর্মান্ধ ব্যক্তিরা তাঁর প্রতি রুষ্ট হয়েছিল, তেমনি অন্য দিকে সমাজের অনাদৃত ও নিগৃহীত মানুষেরা তাঁর প্রতি গভীর ভাবে আকৃষ্ট হয়েছিল।

কবীর বললেন, 'খোদা যদি মসজিদেই বাস কবেন তবে আর সব মুলুক কাঁর। তীর্থে মূর্তিতে রামের বাস। এই দ্বৈত ভাবের মধ্যে সত্য কোথায়। হায় পূর্বদিকে হরির বাস, আর পশ্চিমে আল্লার মোকাম। আরে খুঁজে দেখো হৃদয়ের মধ্যে, সেখানেই রাম রহিমান।'—

জৌর ফুদাই মসীত বশত হৈ ঔর মুলিক কিসকেরা।
তীরথ মূরতি রাম নিবাসা ছুহুঁমৈ কিলহুঁল হেরা॥
পূরিব দিশা হরী কা বাসা পছিম অলহ মূকামা।
দিল হী খোজি দিলৈ দিল ভীতরি ইহাঁ রাম রহিমানা॥

তিনি আরও বললেন, 'হিন্দু মরে রাম রাম করে, মুসলমান মরে খোদা খোদা করে, এই সব ভেদ বুদ্ধির মধ্যে যে না পড়ল সেই তো বাঁচল।'—

হিন্দু মুয়ে রাম কহি মুসলমান খুদাই
কহৈ কবীর সো জীবতা ছুহ মৈঁ কদে ন জাই॥

কবীর এই কথা আরও স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, 'গুপ্ত প্রকট একই চিহ্নে তো সবাই চিহ্নিত, তবে কাকে বা বল ব্রাহ্মণ আর কাকেই বা বল শূদ্র। ঝুটা গর্বে কেউ ভুলে থেকো না। হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি সব ভেদ বুদ্ধিই শুধু মিছে ভ্রান্তি।'—

গুপ্ত প্রকট হৈ একৈ মুদ্রা।
কাকৌ কহিয়ে ব্রাহ্মণ শুদ্রা॥
ঝূট গর্ব ভুলৌ নতি কোঈ।
হিন্দু তরুক ঝূঠ কুল হোঈ॥

জাতি ধর্ম ও বর্ণভেদ দূর করার কথাই কবীর নানা ভাবে বলেছেন। অধ্যাত্ম জগতে এ সবের কোনো দাম নেই। তাই কবীর বলেন, 'বেদ-কোরাণে সংসারে ধর্মভেদ নিয়ে এ-সব কা মিছে গোলমেলে কথা। কে বা পুরুষ কে বা নারী। একই বিন্দ একই মলমূত্র এক চাম এক ইন্দ্রিয় এক জ্যোতি থেকেই সবাই উৎপন্ন, তবে কে বা ব্রাহ্মণ আর কে বা শূদ্র।'—

ঐসো ভেদ বিগূর্চন ভারী।
বেদ কতেব দীন অরু ছুনিয়া কৌন পুরিখ কৌন নারী।
একৈ বুংদ একৈ মলমূতব এক চাম এক গূদা।
এক জোতি থৈ সব উতপনা কৌন ব্রাহ্মণ কৌন স্দা।

তাই তিনি বলেছেন, 'ওরে অতি-সেয়ানা মানুষ, সব ছল ছাড়ো। কবীর বলেন, ভগবানকে ভজনা করো।'—

ছাড় কপট নর অধিক-সয়ানী।
কহহিঁ কবীর ভজ সারংগ-পানী॥

কবীর বলেছেন, জলেও মাছের পিপাসা, এ কথা শুনে আমার হাসি পায়। ঘরের বস্তু দেখতে না পেয়ে উদাসী বনে বনে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু মথুরায় যাও বা কাশীই যাও, আত্মজ্ঞান না হলে এই জগতই মিথ্যা।—

পানী বিচ মীন পিয়াসী,
মোহি সুন সুন আবত হাঁসী।
ঘরমেঁ বস্তু নজর নহি আবত,
বন বন ফিরত উদাসী।
আতক জ্ঞান বিনা জগ ঝুঁঠা,
ক্যা মথুরা ক্যা কাসী॥

কবীর তাঁর দীর্ঘ জীবন ধরে মানুষের ভেদ বুদ্ধি দূর করবার জন্য আত্মজ্ঞান অর্জনের কথা প্রচার করলেন, বললেন এক ঈশ্বরের কথা, নিজের মনের মালিন্য নির্মল করে তাঁর কাছে পৌঁছবার উপায়ের কথা। বললেন, জপের মালা ঘুরিয়েই জীবন গেল, মনের ঘোর দূর হলো না। তাই হাতের মালা ত্যাগ করে এখন মনের মালা ঘোরাও।—

মন্‌কা ফেরৎ জনম গয়ো গয়ো না মন্‌কা ফের।
করকা মন্‌কা ছোড় কর মন্‌কা মন্‌কা ফের॥

তাঁর উপদেশের সার কথা ছিল এই যে প্রত্যেক মানুষকে কাজ করে খেতে হবে। উপার্জনের অর্থে অপরকে সাহায্য করতে হবে, নিজের স্বার্থে সঞ্চয় করা উচিত নয়। তিনি বলতেন, সহজ হও, সত্য পথে চল। সত্যকে উপলব্ধি কর নিজের মধ্যে। ধর্মের ভেদ শুধু নামেই, আসলে ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়। শাস্ত্রগ্রন্থে আচার অনুষ্ঠানে বা তীর্থে তাঁকে পাওয়া যাবে না। তিনি অন্তরের ধন। সবার অন্তরেই তিনি আছেন।

কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পরেই তাঁর মরদেহ সৎকার নিয়ে হিন্দু মুসলমানে বিবাদ দেখা গেল। তাঁর হিন্দু শিষ্যরা তার দেহ দাহ করতে চাইল, আর মুসলমান শিষ্যরা চাইল কবর দিতে। একটি অলৌকিক কাহিনির জন্ম হলো এই বিবাদ মেটানোর জন্য। মৃতদেহের ঢাকা তুলে দেখা গেল এক রাশ ফুল। হিন্দুরা সেই ফুল দাহ করে কাশীতে নির্মাণ করল কবীর চৌরা; আর মুসলমানরা তা মগহরে কবর দিল। হিন্দু ও মুসলমান কবীর পন্থীদের মধ্যে আর কোনো সংশ্রব রইল না।

হিন্দু কবীর পন্থীরাও দুদলে বিভক্ত হয়ে গেছে। ছত্রিশ গড়ে এখন দ্বিতীয় দলের কেন্দ্র। জাতিভেদও ঢুকে পড়েছে। ব্রাহ্মণরা পৈতে নিয়ে নিম্ন বর্ণের মানুষকে অস্পৃশ্য বলে জপের মালা ধারণও নিষিদ্ধ করেছেন। কবীর নিজে ভক্তির পথ অবলম্বন করেছিলেন। বৈষ্ণব ভক্তিবাদের প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল। কিন্তু উপাসনা বা ধর্মীয় ক্রিয়া কলাপে তাঁর বিশ্বাস ছিল না। গৃহস্থ কবীর পন্থীরাই নিজেদের আচার অনুষ্ঠান পালন করে থাকেন। সন্ন্যাসীরা শুধু কবীরের ভজনা করেন, কবীরের বাণী গান করাই তাঁদের একমাত্র উপাসনা। কবীর পন্থীদের প্রামাণ্য গ্রন্থের নাম 'বীজক'।

দাদূপন্থী

দাদূর জন্ম ১৫৪৫ খ্রীষ্টাব্দে। কেউ বলেন রাজস্থানে তাঁর জন্ম, আবার কেউ বলেন উত্তরপ্রদেশের জৌনপুরে। কিন্তু সাধারণ ভাবে মেনে নেওয়া

হয়েছে যে গুজরাতের আমেদাবাদ শহরে তাঁর জন্ম এবং তাঁর কর্মক্ষেত্র ছিল রাজস্থানে। তিনি হিন্দু ছিলেন না মুসলমান, এ নিয়েও বিতর্ক আছে। অনেকের মতে তিনি মুসলমান ধুনুরির পুত্র, আবার অনেকে তাঁকে হিন্দু মুচির ছেলে বলে মানেন। তিনি নিজে বলতেন, আমি হিন্দু নই, মুসলমানও নই ; আমি ঈশ্বরকে ভালবাসি। দাদু বিবাহ করে গৃহস্থ জীবন যাপন করেছিলেন। ১৬০৩ খ্রীষ্টাব্দে রাজস্থানের নারাইনায় ঊনষাট বছর বয়সে দাদু দেহরক্ষা করেন।

উইলসন সাহেবের মতে দাদু রামানন্দের শিষ্যপরম্পরায় ষষ্ঠ। কিন্তু তাঁর আধ্যাত্মিক মতবাদ কবীরের দ্বারায় পুষ্ট দেখে অনেকেই মনে করেন যে তিনি কবীরের পুত্র ও শিষ্য কামালের নিকটে দীক্ষা নিয়েছিলেন। কবীরের মতো দাদুও ভারতের নানা স্থানে ভ্রমণ করে নানা ধর্ম ও সম্প্রদায়ের সাধন-পদ্ধতির অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করেন। বাঙলার বাউলদের প্রতিও তিনি গভীর ভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন বলে শোনা যায়। তাঁর শিষ্য রজ্জব ও আরও অনেকের রচনা থেকে জানা যায় যে আকবর বাদশাহের সঙ্গে দাদুর চল্লিশ দিন ধর্মালোচনা হয়েছিল। আকবর বয়সে বছর চারেকের বড় ছিলেন এবং এই আলোচনা হয়েছিল তাঁর রাজধানী ফতেপুর সিক্রির নিকটে। আকবর এই আলোচনায় গভীর ভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন বলে শোনা যায়।

কবীরের মতো দাদুও মানুষের জাতি ধর্ম ও সম্প্রদায় ভেদের বিরোধী ছিলেন। তিনিও অত্যন্ত সরল কথ্য ভাষায় তাঁর মত ব্যক্ত করে গেছেন। তিনি বলেছেন, 'হিন্দু বলে আমার পথই পথ, মুসলমান বলে আমার পথই সাচ্চা।'—

হিন্দু মারগ কহৈ হমারা তুরক কহৈ রাহ মেরী।

কিন্তু 'আল্লা রামের ভ্রম আমার ছুটেছে, হিন্দু তুরুক কোনো ভেদই নেই।'—

অলহ রাম ছুটা ভ্রম মেরা
হিন্দ তুরক ভেদ কুছ নাহি।

'তুমিই অলখ ইলাহী, তুমিই রাম রহীম।'

অলখ্ ইলাহী এক তূ তূহী রাম রহীম।

দাদূ বলেছেন, 'ব্রহ্মাকে এমন করে খণ্ড খণ্ড করে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে নিয়েছে ভাগ করে, পূর্ণ ব্রহ্মাকে ছেড়ে সবাই বদ্ধ হলো ভ্রমের গাঁঠে।'—

খংড খংড করি ব্রহ্মকৌঁ পখি পখি লিয়া বাঁটি
দাদূ পরণ ব্রহ্ম ভজি বঁধে ভরম কি গাঁঠি।

তিনি স্পষ্ট ভাষায় প্রচার করেছেন যে 'সাম্প্রদায়িক ভেদ রহিত যে পথ তাই হলো পূর্ণ পথ।'—

দ্বৈ পখ রহিত পংথ গহি পূরা।

আর 'সব ঘটে একই আত্মা।'—

সব ঘট একৈ আত্মা ক্যা হিন্দ মুসলমান।

তিনি একথাও বলেছেন, 'সকলে যে বলেন সম্প্রদায়ে না থাকলে কাজ করা যায় না, কিন্তু ধরিত্রী, আকাশ, জলবায়ু, দিনরাত্রি, চন্দ্র, সূর্য এঁরা তো দয়াময়ের সব চেয়ে বড় সেবক। এঁরা কার দলে। অলখ ইলাহী জগদগুরু ছাড়া আর তো কেউ এদের মালিক নেই।'—

দাদ যে সব কিসকে পংথমে ধরতী অরু অসমান।
পানী পবন দিনরাতি কা চংদ সূর রহিমান॥
যে সব কিসকে হৈব রহে যহু মেরে মন মাঁহি।
অলখ ইলাহী জগতগুরু দূজা কোঈ নাহি॥

হিন্দ ও মুসলমান নির্বিশেষে তিনি বহু ভক্ত ও শিষ্য রেখে গিয়েছিলেন। তিনি 'সম্প্রদায় সৃষ্টির বিরোধী ছিলেন, আচার অনুষ্ঠানের প্রতি তাঁর বিরাগ ছিল এবং কোনো রকম সাধন প্রণালীতে তাঁর বিশ্বাস ছিল না। ঈশ্বরে ভক্তি ও সকল মানুষের সঙ্গে মৈত্রী—এই তাঁর মূল কথা। তিনি বিশ্বাস করতেন যে ঈশ্বরের চিন্তায় নিয়োজিত হয়ে সত্যের সাধনাতেই মানুষ মুক্তিলাভ করবে। তিনি বলেছেন, যিনি সকল বস্তুকে সর্বাঙ্গসুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই আমার ঈশ্বর। তাঁরই হাতে জীবন মরণের বিচার। তাঁরই চিন্তা কর।—

সোই হমারা সাঁইয়াঁ জে সবকা পূর্ণহার।
দাদূ জীবন মরণকা জাকৈ হাথি বিচার॥

দাদূর মৃত্যুর পরে দাদূপন্থীরা প্রথমে তিন শাখা ও পরে বাহান্নটি প্রশাখায় বিভক্ত হয়েছে বলে শোনা যায়। যে নারাইনায় দাদূর লোকান্তর হয়, সেখানেই দাদূপন্থীদের প্রধান দেবস্থান। দাদূর শয্যা ও শাস্ত্রগ্রন্থের পূজা হয়। এঁদের হাতে শুধু জপের মালা থাকে।

রুইদাসী

রুইদাস বা রবিদাস পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীর একজন সন্ত সাধক। তিনি রয়দাস বা রৈদাস নামেও পরিচিত। কিন্তু তার জন্ম-মৃত্যুর সন তারিখ বা জীবনী সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। 'ভক্তমাল' গ্রন্থে তাঁর সম্বন্ধে যতটুকু জানা যায় তা অলৌকিক ঘটনায় পূর্ণ। তবে তাঁর জন্ম যে কাশীর উপকণ্ঠে এক চামারের ঘরে, সে বিষয়ে নিঃসংশয় হওয়া গেছে। পরবর্তী কালে তিনি রামানন্দের প্রধান বারোজন শিষ্যের অন্যতম হয়েছিলেন বলে মনে করা হয়। শিখদের আদিগ্রন্থ 'গ্রন্থসাহেব' এঁর নামে প্রচলিত গোটা [illegible]বিশেক ভজন আছে। কবীর ও মীরাবাঈ-এর রচনায় এঁর নামের উল্লেখ আছে।

ঈশ্বর সম্বন্ধে রুইদাস বলেছেন যে তিনি অক্ষয় ও অবিনশ্বর ; এবং প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যেই তিনি জীবাত্মা রূপে বিদ্যমান। বৈরাগ্য ও একনিষ্ঠ ভক্তি দিয়েই তাকে পাওয়া যায়। তাঁর এই মতবাদ অবলম্বন করে একটি সম্প্রদায় গড়ে উঠেছে। এই সম্প্রদায়ের মানুষেরা নিজেদের রুইদাসী বা রৈদাসী বলে পরিচয় দিয়ে থাকেন। এঁদের মধ্যে অধিকাংশই চামার জাতের। শুধু উত্তরপ্রদেশে নয়, এই সম্প্রদায়ের প্রভাব পাঞ্জাব, রাজস্থান, গুজরাত ও মহারাষ্ট্রেও বিস্তৃত হয়েছে।

ভক্তমালের কবি নাভাজী রুইদাসকে জাতে তোলবার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি লিখেছেন যে এক ব্রহ্মচারী গুরুর শাপে চামারের ঘরে জন্ম নেন। কিন্তু মায়ের বুকের দুধ খেতে অস্বীকার করলে রামানন্দ সেই চামার

পরিবারকে রাম মন্ত্রে দীক্ষা দেন। এই রুইদাস চামারের কাজ করেছিলেন এবং তাঁর স্বজাত ও সবার কাছে প্রচার করেছিলেন রামানন্দের ভক্তিবাদ। তিনি লিখেছেন :

তুমি যদি পাহাড় হও তো আমি তোমার ময়ূর ;
তুমি যদি চাঁদ হও তো আমি তোমার চকোর।
আমি যদি তোমাকে ত্যাগ করি তো কার সঙ্গে মিলিত হব ?
যদি তুমি প্রদীপ হও তো আমি তোমার পলতে ;
যদি তুমি তীর্থ হও তো আমি তোমার যাত্রা।
তোমার সঙ্গে আমি যুক্ত করেছি আমার পবিত্র প্রেম ;
তোমার সঙ্গে মিলিত হয়ে আমি অন্য সবাইকে ছেড়েছি।
যেখানেই আমি যাই সেখানেই তোমার সেবা ;
হে প্রভু, তোমাব মতো আর কেউ তো নেই।
তোমার পূজা করে মৃত্যুর ফাঁদ কাটা হয়েছে।
তোমার কৃপা লাভের জন্যেই ববিদাস তোমার নাম গাইছে।

সেনপন্থী

রামানন্দের প্রধান বারোজন শিষ্যের মধ্যে সেন বা সেনা নামে একজন নাপিত ছিলেন। তিনি বন্ধগড়ের রাজবাড়িতে কাজ করতেন। তাঁর বিষ্ণু-ভক্তি সম্বন্ধে 'ভক্তমালে' একটি অলৌকিক কাহিনা পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁর জন্ম মৃত্যু বা জাবনা সম্বন্ধে কোনো ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায় না। শুধু এইটুকু জানা গেছে যে এই সেন তাঁর নিজের নামে একটি সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই সম্প্রদায়ের মানুষ সেনপন্থা নামে পরিচিত।

খাকী

কীল নামে রামানন্দী সম্প্রদায়ের এক বৈষ্ণব এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁর গুরু কৃষ্ণদাস ছিলেন রামানন্দের দ্বাদশ শিষ্যের অন্যতম

আশানন্দের শিষ্য। কিন্তু 'ভক্তমালে' এঁর কোনো উল্লেখ নেই দেখে এই সম্প্রদায়কে অত প্রাচীন মনে করা উচিত নয়। খাকী শব্দের অর্থ মাটি বা ভস্মলিপ্ত। এই সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবরা নিজেদের দেহে মাটি বা ভস্ম লেপন করেন বলেই সম্প্রদায়ের এই নাম হয়েছে। শৈবদের মতো এঁরা মাথায় জটাও রাখেন। এঁরা রাম সীতা ও হনুমানের উপাসক। অযোধ্যার নিকটে হনুমানগড়ে তাঁদের প্রধান মঠ এবং জয়পুরে কীলের সিংহাসন আছে।

মলূকদাসী

অনেকেই মনে করেন যে খাকী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা কীল মলূকদাসকে দীক্ষা দিয়েছিলেন। 'ভক্তমালের' কবি নাভাজি নিজেই লিখেছেন যে তিনি কীলের শিষ্য অগ্রদাসের নিকট উপদেশ লাভ করেছিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে তাঁর গ্রন্থে কীল ও তাঁর খাকী সম্প্রদায়ের কোনো পরিচয় নেই। নাভাজি আকবর বাদশাহের সমকালীন ছিলেন বলে মলূকদাসকেও ঐ সময়ের মানুষ মনে করা যেতে পারে। কিন্তু মলূকদাসীরা তাঁদের প্রতিষ্ঠাতাকে ঔরঙ্গজেবের সমকালীন বলে মনে করেন।
যত দূর জানা যায়, মলূকদাস এলাহাবাদের নিকটে মালিকপুরের এক বণিকের পুত্র ছিলেন। এইখানেই তাঁর জন্ম হয় এবং এইখানেই তাঁর প্রধান মঠ স্থাপিত হয়েছে। এঁরা রামের উপাসক এবং মঠের মন্দিরে রামের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ ছাড়াও এলাহাবাদ কাশী লক্ষ্ণৌ অযোধ্যা বৃন্দাবন ও জগন্নাথ ক্ষেত্রে মঠ স্থাপিত হয়েছে। মলূকদাস জগন্নাথক্ষেত্রে দেহরক্ষা করেছিলেন বলে সেখানকার মঠের বিশেষ প্রতিষ্ঠা আছে।
মলূকদাস বলতেন, সাপ কারও চাকরি করে না, পাখিও করে না কোনো কাজ। মলূকদাস বলেন যে রামই সকলের দাতা।—

অজাগর করে ন চাকরী পংছী করে ন কাম।
দাস মলূকা যোঁ কহে সবকা দাতা রাম॥

তিনি বলতেন, হে দীনবন্ধু দীননাথ, আমার দিকে তাকাও। আমার সোনার মোহর নেই, রূপোর টাকাও নেই। গাঁটে কড়ি পয়সাও নেই যে তাতে কিছু কিনি। ক্ষেত-খামার নেই, বাণিজ্য ব্যাপার নেই, এমন মহাজনও নেই যার কাছে কিছু পেতে পারি। ভাই নেই, বন্ধু নেই, কুটুম পরিবার নেই। এমন কোনো মিত্র নেই যে তার শরণ নিতে পারি। মলূকদাস বলছে যে পরের আশা ছেড়ে দাও। এমন ধনী পাবার পর তুমি আর কার শরণ নেবে ?—

দীনবন্ধু দীননাথ মেরে তন্ হেরিয়ে।
সোনেকা সোনৈয়া নহিঁ, রূপেকা রূপৈয়া নহিঁ,
কৌড়ি পয়সা গাঠ নহিঁ, যাসো কুছ লীজিয়ে।
খেতি নহিঁ, বারি নাহিঁ, বণিজ-ব্যাপার নহিঁ,
ঐসা কোঈ সাহু নহিঁ, যাসো কুছ লীজিয়ে॥
ভাই নহিঁ, বন্ধু নহিঁ, কুটুম কবোনা নহিঁ।
ঐসা কোঈ মিত্র নহিঁ, যাকে ঢিগ লাগিয়ে॥
কহে তো মলূক দাস, ছোড় দে পরাই আশ।
ঐসা ধনী-পায়কে শরণ কাকে জাইয়ে॥

রামসনেহী

রামচরণ নামে রামানুজ সম্প্রদায়ের এক বৈষ্ণব এই সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন। জয়পুরের নিকট এক গ্রামে তাঁর জন্ম ; কিন্তু প্রতিমা পূজার বিরোধী ছিলেন বলে জন্মভূমি থেকে বিতাড়িত হন। নানা স্থান ভ্রমণ করে উদয়পুরের নিকটে এসেও বেশি দিন বাস করতে পারেন নি। তিনি আশ্রয় পেয়েছিলেন সাহেপুরে। উনআশি বৎসর বয়সে এইখানেই তার মৃত্যু হয়। তিনি বহু শ্লোক রচনা করে যান।
রামচরণের বারোজন প্রধান শিষ্য ছিল। তাঁদের জন্য তিনি কঠোর নিয়ম পালনের ব্যবস্থা করেছিলেন। যাঁরা ধর্মযাজক হবেন, তাঁরা জৈন সাধুদের মতো কৃচ্ছ্রসাধন করে থাকেন। রাম তাঁদের উপাস্য দেবতা। তিনি সর্ব-

শক্তিমান ও সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কর্তা। জীবাত্মা এই রামের অংশ, কিন্তু স্বাধীনভাবে কিছু করার ক্ষমতা জীবাত্মার নেই, রামের ইচ্ছাতেই সব হবে। যারা শাস্ত্রজ্ঞ, তাদের পাপের ক্ষয় নেই। কিন্তু যারা অজ্ঞান, তারা শাস্ত্রপাঠ তপস্যা ও অনুতাপ করে পাপমুক্ত হতে পারে। রামসনেহীরা প্রতিমা পূজার বিরোধী। তাঁরা বলেন যে রামের আরাধনা করলে অন্য কোন দেবতার পূজার প্রয়োজন নেই। রাজস্থান গুজরাত ও মহারাষ্ট্রের কয়েক স্থানে এই সম্প্রদায়ের প্রসার দেখতে পাওয়া যায়।

মীরা বাঈ

শুনে আশ্চর্য হতে হয় যে মধ্যযুগের ভক্তকবি মীরা বাঈএর নামেও একটি সম্প্রদায় আছে। অনেকে একে বল্লভাচারী সম্প্রদায়ের শাখা বলে মনে করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মীরা বাঈ কৃষ্ণভক্ত ছিলেন, তাঁর উপাস্য-দেবতা ছিলেন গিরিধর গোপাল বা রণছোড়জী। ভক্তিবাদকেই তিনি মনে প্রাণে মেনে নিয়েছিলেন। তাঁর সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণবরা রণছোড়জী ও মীরা বাঈকেই বিশেষ রূপে ভক্তি করে থাকেন।

'ভক্তমালে' মীরা বাঈ সম্বন্ধে এমন অনেক কথা আছে যা ঐতিহাসিক প্রমাণে সত্য বলে মনে হয় না। যেমন আকবর বাদশাহ তানসেনকে নিয়ে তাঁর গান শুনতে এসেছিলেন। বৃন্দাবনে রূপ গোস্বামীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের কথাও ভিত্তিহীন। কারণ ঐতিহাসিকরা মনে করেন যে মীরা বাঈএর জন্ম হয়েছিল আনুমানিক ১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দে যোধপুর রাজ্যের একটি গ্রামে। কর্নেল টড তাঁকে রাণা কুম্ভের রাণী বলেছেন। কিন্তু ঐতিহাসিকরা বলেন যে তাঁর বিবাহ হয়েছিল রাণা সঙ্গের পুত্র কুমার ভোজের সঙ্গে এবং বিধবা হবার পর তিনি সাধুসঙ্গ ও স্বরচিত ভজন গানে এমনই মত্ত হয়ে ওঠেন যে রাজ পরিবারের সঙ্গে তাঁর বিবাদ বৃদ্ধি পায়। তিনি মেবার ত্যাগ করে প্রথমে বৃন্দাবনে ও পরে দ্বারকায় চলে যান। তাঁর মৃত্যুর আনুমানিক কাল ১৫৬৩ থেকে ১৫৭৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। ভক্তরা বলেন যে তিনি রণছোড়জীর মূর্তির সঙ্গে মিলিত হয়ে অদৃশ্য হন।

মীরা বাঈ কোনো সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠার চেষ্টা কোনো দিন করেন নি। শৈশব থেকেই তিনি কৃষ্ণভক্ত এবং পরবর্তী জীবনে এই ভক্তি তাঁর সমস্ত দেহ মন আচ্ছন্ন করে। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি তাঁর গিরিধর গোপালের নাম কীর্তন করে গেছেন। তিনি বলেছেন, গিরিধর গোপালই আমার, অন্য কেউ নেই। যাঁর মাথায় ময়ূরের মুকুট, তিনিই আমার পতি। তাঁর গলায় কৌস্তুভ মণি আর বুকে ভৃগুপদচিহ্ন। তাঁর হাতে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম ও কণ্ঠে মালা। আমি তো ভক্তি জেনে এসে মুক্তি দেখে মুগ্ধ হয়েছি। অশ্রুজল সেচন করে প্রেমের বীজ বপন করেছি; আর সাধুদের সঙ্গে বসে বসে লোক-লজ্জার ক্ষয় করেছি। এখন তো এ কথা প্রচার হয়ে গেছে, সকলেই জানে। প্রেম আর যুক্তি দিয়ে মন্থন করে আমি ঘি-মাখন বার করে নিয়েছি, এখন যার ইচ্ছে সে ঘোল খেতে পারে। রাজার ঘরে জন্ম হলে সব সুখই পাওয়া যায়; কিন্তু মীরার প্রেম হয়েছে প্রভুর প্রতি, এর জন্যে যা হবার তা হোক।—

মেরে গিরিধর গোপাল দূসরো ন কোঈ।
থাকে শির মৌরমুকুট মেরে পতি সোঈ॥
কৌস্তুভমণিকণ্ঠ পদিকষ্ট উরসি দেশ জোঈ।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম কণ্ঠমাল সোঈ॥
মৈ তো আই ভক্তি জানি মুক্তি দেখি মোঈ।
আঁসুআন জল সীঁচি সীঁচি প্রেমবীজ রোঈ॥
সাধুন্ সঙ্গ্ বৈঠি বৈঠি লোকলাজ খোঈ।
অব তো বাত ফয়ল গয়ী জানে সব কোঈ॥
প্রেমভী মথানী মথি যুক্তিসে বিনোঈ।
মাখন ঘৃত কাঢ়ি লেত ছাঁছ পিয়ে কোঈ॥
রাজন ঘর জনম লেত সবে বাত হোঈ।
মীঁরা প্রভু লগন লগী হোনি হো সো হোঈ॥

তুলসীদাস

ভক্তিবাদের প্রসঙ্গে তুলসীদাসের নাম না করলে এ আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তুলসীদাসও মধ্য যুগের কবি এবং রাম-ভক্তিই তাঁর কবিত্বের প্রেরণা জুগিয়েছে। কিন্তু তিনি কোনো সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা না করলেও সমগ্র উত্তর ভারতে তাঁর অপরিসীম প্রভাব আজও অক্ষুণ্ণ আছে। তাঁর রচিত 'রামচরিত মানস' জনসাধারণের ধর্মগ্রন্থে পরিণত হয়েছে। 'ভক্তমালে' তুলসীদাসের পরিচয় আছে। ১৫২৩ বা ১৫৩১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর জন্ম বলে অনুমান করা হয়। উত্তরপ্রদেশের বাঁদা জেলার রাজপুর গ্রামে এক কনৌজী ব্রাহ্মণের ঘরে তাঁর জন্ম। আত্মারাম দ্বিবেদী তাঁর পিতার নাম। নিজের নাম ছিল রামবোলা। পত্নীর নাম রত্নাবলী। রত্নাবলীর বিদ্রূপেই তিনি সংসার ত্যাগ করেছিলেন। ১৬২৩ বা ১৬২৪ খ্রীষ্টাব্দে কাশীতে তিনি দেহ রক্ষা করেছিলেন।

ঈশ্বর সম্বন্ধে তাঁর ধারণা তিনি কবিতায় লিপিবদ্ধ করে গেছেন।—

> যো কহ নির্গুণ ব্রহ্ম হোয় ভজন করতক তাহি।
> আলম্ব ন বিনু মনসিক ধ্যান করে নর নহি॥
> নির্গুণ ব্রহ্ম ভজহি নর কৈসে।
> নাম রূপ নহি আলজ তৈয়সে॥
> মন অবলম্বত রূপ লোড়াই।
> নির্গুণ রূপ রহিত সদাই॥
> বুদ্ধি বৃত্তি অবলম্বত কাকো।
> যো নহি হোত অবয়ব তাকো॥
> নির্গুণকো ভজহিঁ যো জ্ঞানী।
> তাকোভী ভ্রম করি মন মানী॥
> বেদান্তিগণ কহত হেঁয় শম্বাদি ভ্রম তাহি।
> মণিকে জ্যোতিমে মণি মিলে যদ্যপি ভ্রম জগমাহি॥
> দীপশিখাকো জ্যোতিমে মণিভ্রম মানত যোই।
> ধায় জায় নহি পাত মণি বিসম্বাদি ভ্রম সোই॥

দৌউ যত্তপি হোয় ভ্রমরূপা।
প্রিয়বর শুনহু ইহ যুক্তি অনুপা ॥

রামপ্রসাদ সেন এর অনুবাদ করেছেন :

যে বলে, 'ব্রহ্ম নিরাকার, আমি বন্দনা করি তার,'
আশ্রয়হীন, শূন্য মনেতে ধেয়ান করিবে কার ?
নির্গুণে নর ভজিতে চায়,
নাহি নাম রূপ আকার তায়।
মন প্রলোভিত রূপের দিকে,
নির্গুণ, সে যে বড়ই ফিকে।
বুদ্ধি ছুটিবে কিসের পিছু ?
যার নাহি কায়া, আকার কিছু।
নির্গুণে জ্ঞানী ভজিছে জ্ঞানে,
সে-ও ভুল করি মনেরে মানে।
বেদান্ত কহে, বজ্র-বহ্নি সকলি মায়ার মায়া,
মণির জ্যোতিতে মণি খুঁজে ফেরা, সকলি ছায়ার ছায়া।
দীপের শিখাকে মণি ভ্রম হয়, দেখি উজ্জ্বল কান্তি,
ধেয়ে যায় তবু নাহি পায় মণি—বিসম্বাদের ভ্রান্তি।
ইহারেই বলে ভ্রমের স্বরূপ, প্রিয়বর শুন তবে,
অনুপম এই যুক্তি কখনো খণ্ডিত নাহি হবে।

বারকরী বা বিট্ঠল সম্প্রদায়

মহারাষ্ট্রের পণ্ডারপুরে আছে বিট্ঠল দেবের মন্দির। তাঁর অনেক নাম—বিঠল, বিঠোবা, বিঠো, বিঠ, ইট্ঠল, ইটোবা, ইট, পাণ্ডুবর কোনোটা ডাক নাম, কোনটা বা আদরের নাম। বিষ্ণুই এখানে এই সব নামে পরিচিত। এবং এই দেবতাকে নিয়ে ধনী দরিদ্র গৃহস্থের একটি সম্প্রদায় গড়ে উঠেছে। এই বিট্ঠল ভক্তরাই বারকরী নামে পরিচিত।

এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতার নাম খুঁজতে গেলে পুণ্ডলিক নামে এক ব্যক্তির

পরিচয় জানা যাবে। তিনি বোধহয় চতুর্দশ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। অনেকে একেই বারকরী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা বলে মনে করেন। কিন্তু মহারাষ্ট্রে বৈষ্ণব ধর্ম বিস্তৃত হয়েছিল খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর শেষের দিকে এবং পণ্ডারপুরের বিট্‌ঠল দেবের মন্দির ও মূর্তিও অনেক প্রাচীন। এই অঞ্চলের অনেকেরই বিশ্বাস যে এই মূর্তি নামদেবের হাত থেকে খাদ্য গ্রহণ করতেন। ভক্ত কবি নামদেবের কাল ১২৭০ থেকে ১৩৫০ খ্রীষ্টাব্দ। তাঁরই জীবদ্দশায় মহারাষ্ট্রের আর একজন প্রধান সন্ত কবি জ্ঞানেশ্বর বা জ্ঞানদেব বিদ্যমান ছিলেন। ১২৭৫ থেকে ১২৯৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত একুশ বৎসরের জীবনকালে তিনি বিট্‌ঠল দেবের নামে অধ্যাত্ম ভাবময় বহু 'অভঙ্গ' বা পদ রচনা করেন। তিনি লিখেছেন, বল বিনা যেমন শক্তি হয় না, তেমনি ভাব বিনা ভক্তি হয় না। আর ভক্তি ছাড়া মুক্তিও হয় না। ত্রিবেণী সঙ্গমে স্নান করে নানা তীর্থে ভ্রমণ করলাম ; কিন্তু মন মানল না, সবই ব্যর্থ হলো। জপতপ কর্ম তো ধর্ম নয়, হরিনাম ছাড়া মুক্তি নেই।—

> ভাবেঁ বীণ ভক্তি, ভক্তি বীণ মুক্তি।
> বলেঁ বীণ শক্তি, বোলুঁ নয়ে॥
> ত্রিবেণী সঙ্গমী নানা তীর্থ ভ্রমী।
> চিত্ত নাহীঁ নামীঁ তবি তেঁ ব্যর্থ॥
> জপতপ কর্ম, ক্রিয়া লেম ধর্ম।
> হবী বিনেঁ লেম নাহীঁ দুজা॥

এই ধর্মই বারকরীর ধর্ম। পুণ্ডলাকের বহু আগে থেকেই এই ধর্মমত পণ্ডরপুরে প্রচলিত ছিল।

মহারাষ্ট্রে আর তিনজন সন্ত কবিব অভ্যুদয় হয়েছিল অনেক পরে। একনাথের কাল ১৫৩৩ থেকে ১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দ। তিনিও বৈষ্ণব ছিলেন এবং ভক্ত ছিলেন দেবগিরির জনার্দন স্বামীর। তুকারাম ১৬০৮ থেকে ১৬৪৯ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন বলে অনুমান করা হয়। তিনি ছিলেন বিট্‌ঠল ভক্ত। তিনি বলেছেন যে ধ্যানের সময় তিনি নামদেব ও বিট্‌ঠল দেবের আদেশ পেয়েছিলেন কবিতা রচনার। দেবতার নাম করলেই তাঁর মন

থেকে জাতি-বৈষম্য দূর হয়ে যায়। মহারাষ্ট্রের সন্তদের মধ্যে সমস্ত জাতের মানুষ ছিলেন। তাঁরা কেউ কুমোর, কেউ কর্মকার, কেউ মালী তেলী নাপিত, অচ্ছ্যুৎ ও পরিচারিকাও আছেন। এমন কি, মুসলমান তাঁতি ও কসাইও আছেন। দেবতার নামে সবাই রচনা করেছেন 'অভঙ্গ'। তুকারামের নিকটে ঈশ্বর দয়ালু পিতা নন, তিনি স্নেহময়ী জননী। তিনি লিখেছেন—

কঁই তো দিবস দেখেন মী ডোলাঁ।
কল্যাণ মঙ্গলামঙ্গলাচেঁ॥
আয়ুষ্যাচ্যা শেরটী পায়াসবেঁ ভেটী।
কলিবরে তুটী জাল্যা ত্বরে॥
সরো হে সঞ্চিত পদবীচা গোরা।
উতাবীল দেবা মন জালে॥
পাউল্য পাউলীঁ করিতাঁ বিচার।
অনন্ত বিকার চিত্তা অঙ্গী॥
ক্ষণউনিঁ ভয়াভীত হোতো জীব।
ভাকিতসেঁ কীবঁ অট্টহাসেঁ॥
তুকা ক্ষণে হোইল আইকিনে বগনী।
তরী চক্রপাণী ধাবঁ ঘালা॥
দুঃখাচ্যা উত্তরী আলবিলে পায়।
পাহাণঁ তেঁ কায় অজুন অন্ত॥

রবীন্দ্রনাথ এর অনুবাদ করেছেন :

যেদিন হেরিবে কবে এ মোর নয়ান—
কেবলই মঙ্গল যবে, কেবলই কল্যাণ।
পরমায়ু অবসানে ভেটিব চরণ,
টুটিবে সত্বর মোর সকল বন্ধন।
সকল বন্ধন মোর হোক অপসৃত—
উতলা হয়েছে, দেব, তাই মোর চিত।

পদে পদে দেখি আমি করিয়া বিচার
মন-অঙ্গে রহিয়াছে অনন্ত বিকার।
ভয়ে ভীত তাই মোর চকিত পরাণ—
সকাতরে চাহি কৃপা, করো পরিত্রাণ।
তুকা ভণে তব কানে পশিবে এ কথা—
দীন-উদ্ধারণ প্রভু ; শীঘ্র এসো হেথা।
চরণ ধরিয়া ডাকি তোমারে একান্ত—
এখনো কি দুঃখ মোর হইবে না অন্ত?

শিবাজীর গুরু রামদাস স্বামী তুকারামের সমসাময়িক এবং তাঁর কাল ১৬০৮ থেকে ১৬৮২। কিন্তু তিনি বারকরী সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন না। তিনি ছিলেন রামভক্ত এবং ক্ষাত্রবীর্যে বিশ্বাসী। তিনি নানা স্থানে মারুতি বা হনুমানের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁব রচিত কবিতা মারাঠীরা উপাসনার সময়ে আবৃত্তি করে থাকেন।

চৈতন্য সম্প্রদায় ও তার শাখা প্রশাখা

বিহার ও বাঙলাব বৈষ্ণব ধর্মেব নিদর্শন পাওয়া যায় গুপ্তযুগের প্রথম দিকে। শাহাবাদ জেলার মুণ্ডেশ্বরী পাহাড়ের একটি চতুর্থ শতাব্দীর শিলালিপিতে নারায়ণ-মন্দিরের উল্লেখ আছে ; এবং বাঁকুড়ার নিকট শুশুনিয়া পাহাড়ে রাজা চন্দ্রবর্মন বিষ্ণুর নামে গুহা ও চক্রচিহ্ন নির্মাণ করে দেন। ষষ্ঠ বা সপ্তম শতাব্দীতে উত্তর বঙ্গের পাহাড়পুরে পাথরে তৈরি কৃষ্ণলীলার নানা মূর্তি পাওয়া গেছে।

বাঙালী মনে প্রাণে বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ কবেছে চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পরে অর্থাৎ ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকে। অনেকে মনে করেন যে চৈতন্য স্বয়ং মধ্বের সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। তার প্রধান কারণ এই যে তাঁর দীক্ষা গুরু ঈশ্বরপুরী মধ্ব সম্প্রদায়ের মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য ছিলেন। সাধারণ বিশ্বাসে বৈষ্ণবদের চারটি সম্প্রদায়ই মান্য। তাই চৈতন্য সম্প্রদায়কে তাঁরা মধ্ব সম্প্রদায়ের একটি শাখা হিসাবে গণ্য করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এই

দুই সম্প্রদায়ের উপাস্য দেবতা ও আধ্যাত্মিক মতবাদ বিচার করলে চৈতন্য সম্প্রদায়কে একটি স্বতন্ত্র সম্প্রদায় বলে স্বীকার করতে হয়। বাঙলার বৈষ্ণব আচার্যরা শাস্ত্রানুসারে সমন্বয়ের দৃষ্টিতে অচিন্ত্য ভেদাভেদ নামে দর্শনের যে নূতন তত্ত্বের সন্ধান দিয়েছেন, মধ্বের দ্বৈতবাদে তা অনুপস্থিত।

চৈতন্যদেব এই সম্প্রদায়ের প্রবর্তক নন, তিনি এই সম্প্রদায়ের উপাস্য দেবতায় পরিণত হয়েছেন। এই সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবদের মতে অদ্বৈত ও নিত্যানন্দও বিষ্ণুর অংশাবতার, তাঁরা চৈতন্যের অঙ্গস্বরূপ। এঁরা রূপ, সনাতন, জীব, রঘুনাথ ভট্ট, রঘুনাথ দাস ও গোপাল ভট্ট এই ছয় জনকে আদি গুরু বলে মানেন। এঁরা ছাড়াও আরও অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি চৈতন্যের শিষ্য হন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন শ্রীনিবাস, শ্রীস্বরূপ. গদাধর পণ্ডিত, রামানন্দ, হরিদাস প্রভৃতি। কৃষ্ণ এঁদের উপাস্য দেবতা। এঁরা বলেন, কৃষ্ণাস্তু ভগবান্ স্বয়ং। তাঁর হ্রাস-বৃদ্ধি নেই, ধ্বংস নেই। তিনি ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর রূপে সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের কর্তা। তিনি অবতার ও বংশাবতার রূপে তাঁর লীলা প্রকাশ করেন। কৃষ্ণদাস তাঁর চৈতন্য চরিতামৃতে লিখেছেন যে কৃষ্ণই চৈতন্যরূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন : তাঁর ইচ্ছা ছিল—

আমা হৈতে রাধা পায় যে জাতীয় সুখ।
তাহা আস্বাদিতে আমি সদাই উন্মুখ॥

সেইজন্যই তিনি রাধার মতো গৌরাঙ্গ হয়েছিলেন এবং নিজেকে রাধা ভেবে কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত হয়ে উঠেছিলেন। এই সম্প্রনায়ের মূল কথা ভক্তি ও কৃষ্ণ-প্রেম। জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলেই এই সম্প্রদায়ে প্রবেশ করতে পারে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের শাখা প্রশাখার শেষ নেই। কতগুলি সম্প্রদায় আমাদের বিশেষ পরিচিত, আবার কতগুলির নাম তেমন পরিচিত নয়। যেমন বাউল, ন্যাড়া, দরবেশ ও সাঁই, সহজী, গৌরবাদী, স্পষ্টদায়ক, কর্তাভজা, রামবল্লভী, সাহেবধনী, আউল, খুশীবিশ্বাসী, জগন্মোহনী, হরি-বোলা, রাতভিকারী, বলরামী, সাধ্বিনী, রাধাবল্লভী, সফীভাবক, হজরতী, গোবরাই প্রভৃতি। উৎকলেও অনেক সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব আছেন। যেমন

বিন্দুধারী, অতিবড়ী, কবিরাজী, সৎকুলী, অনন্তকুলী, যোগী, গিরি ও গুরুবাসী বৈষ্ণব।

বৈষ্ণবদেরও নানা জাতি আছে। যেমন ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব, খণ্ডেত বৈষ্ণব, করণ বৈষ্ণব, গোপ বৈষ্ণব, কালিন্দী ও চামার বৈষ্ণব। এ ছাড়াও আছে চরণদাসী, মার্গী, হরিশ্চন্দী, সঠ ন পন্থী, মাধ্বী, চুহড়পন্থী, কুডাপন্থী, হরিব্যাসী, রামপ্রসাদী, রড়গল, লস্করী, চতুর্ভুজী, বৈরাগী, ফরারী বাণশয্যী, পঙ্কধ্বনী প্রভৃতি বৈষ্ণব তপস্বী, কামধেম্বা, মটুকাধারী, বৈষ্ণব ব্রহ্মচারী ও পরমহংস, বৈষ্ণবদণ্ডী বা ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসী এবং বৈষ্ণব নাগা।

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের এই সব সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনার প্রয়োজন নেই। শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে এঁরা সকলেই বৈষ্ণব এবং এঁদের মধ্যে ভেদ শুধু আচার অনুষ্ঠানের।

শঙ্করদেব ও মহাপুরুষিয়া সম্প্রদায়

আসামে বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার করেন শঙ্করদেব। তাঁর জন্মের তারিখ সঠিক জানা যায় না। কেউ বলেন ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দ, আবার কেউ বলেন ১৪৭৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর জন্ম। তাঁর পিতা কুসুমবর কোচ রাজা বিশ্ব সিংহের ভয়ে কামরূপ ত্যাগ করে অহোম রাজাদের আশ্রয়ে নওগাঁ জেলার বড়দোয়া গ্রামে চলে আসেন। কিন্তু শঙ্করদেব আবার কামতায় ফিরে যান এবং শেষ জীবন কামতা-কামরূপ রাজার আশ্রয়ে অতিবাহিত করেন। তিনি জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি প্রচার করেন এবং তাঁর সম্প্রদায়ের নাম মহাপুরুষিয়া সম্প্রদায়। তিনি রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং তাঁর মতে রাধাভাবের স্থান নেই। তিনি ব্রাহ্মণের প্রাধান্যও মানতেন না। শিষ্য মাধবদেবের সঙ্গে তিনি গ্রামে গ্রামে কীর্তন গানের প্রচলন করেন।

শৈব সম্প্রদায়

বর্তমানে বিষ্ণুর উপাসনা হিন্দু সমাজের একটা মুখ্য অংশ জুড়ে থাকলেও এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে শিবের উপাসনাই এ দেশে অনেক

আগে থেকে প্রচলিত ছিল। প্রাগ্‌বৈদিক যুগের অর্থাৎ সিন্ধু সভ্যতার সময়ের যে সব নিদর্শন মাটির নিচ থেকে পাওয়া গেছে, তার থেকেই প্রমাণিত হয়েছে যে পশুপতি শিব ছিলেন সে যুগের উপাস্য দেবতা। কোথাও ধ্যানমগ্ন জটাধারী যোগীরূপে কোথাও বা শক্তির প্রতীক লিঙ্গ-রূপে তাঁকে পাওয়া গেছে। হরাপ্পায় পাওয়া একটি পোড়া মাটির সীল উল্লেখযোগ্য। তার একদিকে একটি যোগীমূর্তি, অন্যদিকে বৃষ ও ত্রিশূল ধ্বজ। এর থেকেই নিঃসংশয় হওয়া যায় যে শিব ছিলেন প্রাগ বৈদিক যুগের দেবতা।

ঋগ্বেদে আমরা রুদ্র দেবতার উল্লেখ পাই। তিনি সুন্দর এবং ভীষণ। শরণার্থীকে তিনি রক্ষা করেন, রোগ নিরাময় করেন এবং গ্রামকে সমৃদ্ধ করেন। তিনি পশুরক্ষা করেন এবং নিবারণ করেন মারীভয়। তৈত্তিরীয় সংহিতায় তিনি 'গিবিশ গিরিত্র' অর্থাৎ হিমালয়ের দেবতা, পার্বতী তাঁর স্ত্রী। তাণ্ড্য ব্রাহ্মণে তিনি মৃগয়াধিপ এবং অথর্ববেদে কিরাতরূপী। মহা-ভারতেও তিনি এই রূপেই অর্জুনকে দেখা দিয়েছেন।

এর থেকেই সপ্রমাণ হয় যে আর্যপূর্ব ও আর্যেতর জাতির দেবতা শিব বৈদিক রুদ্রের সঙ্গে মিলে মিশে বর্তমান হিন্দু ধর্মে একজন প্রধান দেবতায় পরিণত হয়েছেন। কিন্তু এর জন্য তাঁকে প্রবল সংঘাতের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। দক্ষ শিবহীন যজ্ঞ করেছিলেন, সেই দক্ষযজ্ঞ পণ্ড হয়েছিল। তৎকালীন সমাজ শিবকে প্রধান তিন দেবতার অন্যতম বলে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন।

শিব যোগীশ্রেষ্ঠ, অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়েও চির দরিদ্র। তিনি কখনও রজতগিরিনিভ সুন্দর, নিখিলের ভয় হরণকারী অথচ নিরহঙ্কার। কখনও বা ঘোর কৃষ্ণ মহাকাল সদৃশ, নটরাজ মূর্তিতে বিশ্বের প্রলয় কর্তা। তিনি সংসারী, অথচ বন্ধনে উদাসীন। উপাসকদের নিকটে তাঁর নানা মূর্তি—যোগী শিব একক, শক্তির সঙ্গে দ্বৈত, পরিবার প্রমথ নন্দীভৃঙ্গীর সঙ্গে তিনি বহু। হিন্দুর জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলের সমান প্রিয় দেবতা তিনি।

যে ভাবে অনার্য দেবতা শিব বৈদিক রুদ্রের স্থান অধিকার করেছেন, ঠিক তেমনি ভাবেই অনার্য লিঙ্গ পূজা আর্য সমাজে প্রচলিত হয়েছে। এই লিঙ্গ পূজা যে পুরাকালের কৃষি সংস্কৃতি থেকে জাত ও লালিত প্রচলিত প্রবাদ ও কিংবদন্তীতে তার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। লিঙ্গ পূজায় শিবের সঙ্গে শক্তিও যুক্ত হয়ে আছেন। এক সঙ্গেই শিব-শক্তির পূজা হয়ে থাকে। এই দুই-ই সৃষ্টির সঙ্গে যুক্ত। শুধু শস্য উৎপাদনে নয়, প্রজননের জন্যও এই দুই অপরিহার্য। এই ধারণা থেকেই যে লিঙ্গ পূজার উদ্ভব হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই।

যোনি ও লিঙ্গের প্রতীকের উপরে শিব পূজার অনার্য বিধি গ্রহণ করবার পরে আর্যরা এর এক কারণ দেখাবার প্রয়োজন বোধ করেন। পদ্মপুরাণের উত্তর খণ্ডে আমরা একটি কাহিনী পাই। তাতে রাজা দিলীপ ঋষি বশিষ্ঠকে জিজ্ঞাসা করছেন, সস্ত্রাক শিব এই বিগর্হিত রূপ কেন পেয়েছিলেন? এই প্রশ্নের উত্তরে বশিষ্ঠ বলেছিলেন যে একদা মন্দর পর্বতে এক সত্রে সমবেত ঋষিরা কোন্ দেবতা ব্রাহ্মণদের পূজ্য তা স্থির করতে চেয়েছিলেন। তাঁরা ঠিক করেন যে এর বিচারের জন্য একে একে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিবের নিকটে যাবেন এবং প্রথমেই গেলেন কৈলাসে শিবের নিকটে। কিন্তু দ্বাররক্ষী নন্দী তাঁদের বাধা দিয়ে বললেন যে দেখা হবে না। শিব পার্বতীর সঙ্গে ক্রীড়ারত আছেন। ঋষিরা বহুক্ষণ অপেক্ষা করেও যখন দেখা পেলেন না, তখন ভৃগু শাপ দিলেন যে সঙ্গমে রত থেকে ব্রাহ্মণদের অবমাননার জন্য শিবের মূর্তি হবে যোনি-লিঙ্গ রূপ এবং ব্রাহ্মণেরা শিবের পূজা করবে না। এই কাহিনী থেকেই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে ব্রাহ্মণেরা লিঙ্গ পূজা করতেন না, পরবর্তীকালে এই বিধান বদলেছে।

অন্যান্য পুরাণে শিব বা লিঙ্গ পূজার মাহাত্ম্য বর্ণনা আছে। মৎস্য পুরাণে আছে যে জগতে যত পুণ্য কাজ আছে তার মধ্যে শিব পূজাই প্রধান। সহস্র অশ্বমেধ ও শত বাজপেয় যজ্ঞের চেয়েও শিব পূজায় বেশি ফল পাওয়া যায়।

অশ্বমেধ সহস্রাণি বাজপেয় শতানি চ।

মহেশার্চনপুণ্যস্য কলাং নাহন্তি ষোড়শীম্॥ —মৎস্য পুরাণ

স্কন্দ পুরাণেও এই রকমের কথা আছে। শিব লিঙ্গ পূজায় যে ফল লাভ হয়। অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞে তার কোটি ভাগেরও এক ভাগ হয় না। যে শিব লিঙ্গ পূজা করে, সে সকল পাপ থেকে মুক্ত হয়। জগতের জীবের জন্ম থেকে জন্মান্তর হয়, মুক্তি হয় শিব লিঙ্গ পূজায়।—

অগ্নিহোত্রাস্ত্রিবেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বহু দক্ষিণাঃ।

শিবলিঙ্গার্চনস্যেতে কোট্যংশেনাপি তে সমাঃ॥

হিত্বা ভিত্বা চ ভূতানি হিত্বা সর্বমিদং জগৎ।

যজেদ্দেবং বিরূপাক্ষং ন স পাপেন লিপ্যতে॥

অনেক জন্ম সাহস্রং ভ্রম্যমাণশ্চ জন্মসু।

কঃ সমাপ্নোতি বৈ মুক্তিং বিনা লিঙ্গার্চনং নবঃ॥ —স্কন্দ পুরাণ

লিঙ্গপুরাণেও আমরা পাই যে একমাত্র শিবলিঙ্গ পূজাতেই চতুবর্গ ফল লাভ হয় এবং অষ্ট-ঐশ্বর্য-সিদ্ধি হয়। স্বয়ং নারায়ণ বলেছেন যে স্বর্গ মর্ত্য ও পাতালে যত দেবতা আছেন, একমাত্র শিবেব পূজা করলেই সব দেবতার পূজা হয়।—

শিবস্য পূজনাদ্দেবি চতুর্বর্গাধিপো ভবেৎ।

অষ্টৈশ্বর্য যুতো মর্ত্যঃ শম্ভুনাথস্য পূজনাৎ॥

স্বয়ং নারায়ণেনোক্তং যদি শম্ভুং প্রপূজয়েৎ।

স্বর্গে মর্ত্যে চ পাতালে যে দেবাঃ সংস্থিতাং সদা।

তেষাং পূজা ভবেদ্দেবি শম্ভুনাথস্য পূজনাৎ॥ —লিঙ্গপুরাণ

মনে হয় পুরাকালে মানুষ যখন নিরাকার ঈশ্বরের একটা রূপ দেবার চেষ্টা করে, তখন তাদের মনে প্রকৃতি-পুরুষ-সঙ্গমে সৃষ্টির আরম্ভের কথাই মনে এসেছিল এবং ঈশ্বরকে তারা লিঙ্গরূপে কল্পনা করেছিল। পরবর্তী কালে এই ঈশ্বর শিব-শক্তিতে পরিণত হয়েছেন এবং লিঙ্গ পূজার ধারাটি অব্যাহত ভাবে চলে এসেছে। শুধু ভারতে নয়, বিশ্বের নানা স্থানে এই লিঙ্গ পূজার প্রচলন ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে। রোমানরা প্রিয়াপস

ও গ্রীকরা ফ্যালাস পূজা বলত। মিশর ইসরাইল ও চীন দেশেও এই প্রথা বিদ্যমান ছিল। এই সব দেশে লিঙ্গ পূজা ও লিঙ্গ নিয়ে শোভাযাত্রার কথাও শোনা যায়।

শিবের উপাসকরা শৈব নামে অভিহিত। শৈব দর্শন ও সাধনা খুবই প্রাচীন এবং শৈব ধর্মে শিবই পরমপুরুষ। স্বয়ং শিবই শৈব ধর্মের প্রবক্তা বলে শৈবদের বিশ্বাস। শৈব সাধনার পদ্ধতি মূলত যোগাশ্রিত। শৈব যোগী ব্রহ্মচারী সাধক।

শৈব সম্প্রদায়ে যে সব শাখা প্রশাখা আছে, তাদের সাধনার পদ্ধতিতে কিছু পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। এদের দুটি প্রধান ধারা —একটি দর্শনতত্ত্বের উপরে নির্ভরশীল, অন্যটি ব্যবহারিক সাধন প্রণালীর অনুসরণকারী।

শৈবদের মধ্যে উদাসীন বা সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ই প্রধান। বহু প্রাচীন কাল থেকেই সন্ন্যাসধর্ম এ দেশে প্রচলিত ছিল। কিন্তু কালক্রমে তা দুর্বল হয়ে পড়ে। নবম শতাব্দীর গোড়ার দিকে শঙ্করাচার্য এই সম্প্রদায়কে পুনরুজ্জীবিত করেন এবং তখন থেকেই এই সম্প্রদায় নানা নামে প্রবল হয়ে ওঠে।

দশনামী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়

শঙ্করাচার্য শিবের অবতার ছিলেন বলে মনে করা হয়। তিনি নিজে সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং সারা দেশে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম খণ্ডন করে হিন্দু ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর প্রধান শিষ্য ছিলেন চারজন। তাঁদের নাম পদ্মপাদ, হস্তামলক, মণ্ডল ও তোটক। পদ্মপাদের দুই শিষ্যের নাম তীর্থ ও আশ্রম ; হস্তামলকের দুই শিষ্য বন ও অরণ্য ; মণ্ডলের তিন শিষ্যের নাম ছিল গিরি, পর্বত ও সাগর এবং তোটকের তিন শিষ্য সরস্বতী, ভারতী ও পুরি নামে পরিচিত হন। এগুলি নাম নয়, উপাধি। শিষ্যদের বিশেষ লক্ষণ দেখে এই সব উপাধি দেওয়া হয় এবং এই দশজন শিষ্যের নামেই দশনামী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়।

প্রাণতোষিণী তন্ত্রের অবধূত প্রকরণে এই নামকরণের অন্তর্নিহিত অর্থ

নিরূপণ করা হয়েছে। ত্রিবেণী সঙ্গমতীর্থে যিনি তত্ত্ব ভাবে স্নান করেন, তিনি তীর্থ এবং যিনি আশাপাশ বিবর্জিত যাতায়াত বিনির্মুক্ত আশ্রম গ্রহণে প্রৌঢ়, তিনি আশ্রম। যিনি নিষ্কাম মনে সুরম্য নির্ঝরের নিকট বনে বাস করেন, তিনি বন এবং যিনি সব ত্যাগ করে অরণ্যেই চিরদিন বাস করেন, তিনিই অরণ্য। যিনি গিরিবাসী ও গীতাভ্যাসে গম্ভীর, তাঁকে গিরি বলা হয় এবং যিনি পর্বতমূলে বাস করে ধ্যান ধারণায় প্রৌঢ়, তাঁকেই পর্বত বলা হয়। যিনি সাগরের মতো গম্ভীর ও আপন মর্যাদা লঙ্ঘনে বিরত, তিনি সাগর এবং যিনি স্বরূপ জ্ঞান-বিশিষ্ট সংসার সাগরে সার-জ্ঞানী, তিনিই সরস্বতী। যিনি বিদ্যাভারে পূর্ণ হয়েও সব ভারত্যাগ করেন ও দুঃখ ভার জানেন না, তিনি ভারতী এবং যিনি জ্ঞান তত্ত্বে পূর্ণ ও পরম ব্রহ্মে রত, তাঁরই নাম পুরি।

শঙ্করাচার্য প্রতিষ্ঠিত চার মঠে এই দশনামী সন্ন্যাসীরা অবস্থান করেন— পুরি ভারতী ও সরস্বতীরা শৃঙ্গেরী মঠে, তীর্থ ও আশ্রমেরা দ্বারকার সারদা মঠে, বন ও অরণ্যেরা পুরীর গোবর্ধন মঠে এবং গিরি পর্বত ও সাগরেরা বদ্রিনাথের পথে জ্যোতির্মঠে। সন্ন্যাস গ্রহণ করে যিনি এই দশনামীর যে সম্প্রদায়ে যোগ দেবেন, তিনি সেই নামই পাবেন। এখন দেখা যায় যে অরণ্য প্রায় বিলুপ্ত হয়েছে, সাগর ও পর্বতও খুব বিরল।

এঁরা নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসক। এঁদের মতে যিনি ব্রহ্ম, তিনিই শিব এবং শঙ্করাচার্য শিবের অবতার। বেদান্ত চর্চা ও আত্মজ্ঞান সাধনই এঁদের প্রধান ধর্ম। সূত সংহিতায় আছে যে শিব সন্ন্যাসীদের দেবতা।—

যতীনাঞ্চ মহেশ্বরঃ।

শিবগীতায় শিবের সাকার ও নিরাকার এই দুই রূপেরই বর্ণনা আছে। এঁদের মধ্যে বিদগ্ধ পণ্ডিত ও গ্রন্থকার অনেক আছেন। বেদের ভাষ্যকার মাধবাচার্য সন্ন্যাস গ্রহণের পর বিদ্যারণ্য স্বামী নামে খ্যাতি লাভ করেন। এই দশনামীরাই বৃত্তি ও সাধন অনুসারে দণ্ডী পরমহংস সন্ন্যাসী প্রভৃতি উপাধি গ্রহণ করেন।

দণ্ডী

যাঁরা হাতে দণ্ড কমণ্ডলু নিয়ে ভ্রমণ করেন, তাঁরা দণ্ডী নামে পরিচিত, এঁরা ব্রাহ্মণ। পিতা-মাতা স্ত্রী-পুত্র-কন্যা থাকলে দণ্ডী হওয়া যায় না। দণ্ড ধারণ মানে শিখা ও সূত্র ত্যাগ করে পুনর্জন্ম লাভ। এঁদের নিয়মিত মাথা ও গোঁফ দাড়ি মুড়োতে হয়, গেরুয়া বস্ত্র ও রুদ্রাক্ষের মালা ধারণ করে দেহে ভস্ম মাখতে হয়। আগুনের স্পর্শে আসা নিষিদ্ধ বলে একবেলা ভিক্ষান্ন গ্রহণ করতে হয়, কিংবা কোনো সঙ্গী ব্রহ্মচারী রেঁধে দিলে খাওয়া যায়। বারো বছর পরে এই দণ্ডা বিসর্জন দেওয়া চলে। দণ্ডীরা শঙ্করাচার্যের মত অনুসরণ করেন এবং মনে করেন যে দশনামীর মধ্যে তীর্থ আশ্রম সরস্বতী ও কিছু ভারতী শঙ্করাচার্যের প্রকৃত শিষ্য, অন্যরা তাঁর প্রবর্তিত নিয়ম থেকে বিচ্যুত হয়েছেন।

কাশী ও পশ্চিমাঞ্চলের কিছু দণ্ডী ঘরবারী দণ্ডী নামে পরিচিত। তাঁরা সংসারী এবং বিষয়কর্মও করেন। মাঝে মাঝে গেরুয়া কাপড় পরে দণ্ড কমণ্ডলু নিয়ে তীর্থভ্রমণ করেন। সেই সময়ে দণ্ডীদের মতো ভিক্ষাও করেন।

সন্ন্যাসী

সন্ন্যাসী বলতে আমরা জটাজুটধারী শৈব উদাসীন বুঝি। কিন্তু এঁরা নিজেদের অবধূত বলে থাকেন। তন্ত্রের মতে কলিযুগে সন্ন্যাস আশ্রম নিষিদ্ধ বলে অবধূতরাই সন্ন্যাসী নামে পরিচিত। শুধু ব্রাহ্মণ নয়, অন্য বর্ণের মানুষেরও অবধূত হবার অধিকার আছে। দণ্ডীদের মতো সংসারীদের অবধূত হবার বাধা আছে। বাপ-মা স্ত্রী-পুত্র-কন্যা থাকলে সংসার ত্যাগ করে অবধূত হওয়া যায় না। গুরুর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করতে হয়। শিখা সূত্র ত্যাগ করে নিজের নামটিও ত্যাগ করতে হয়। শিব মন্ত্র দিয়ে দশনামীর একটি নাম গুরুই ঠিক করে দেন।

হংস পরমহংস কুটীচক বহূদকরাও সন্ন্যাসী। এঁরা সকলেই মোক্ষ লাভের জন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। কিন্তু হংস কুটীচক ও বহূদক ব্রাহ্মণের মতো

গায়ত্রী জপ করেন এবং পরমহংস জপ করেন প্রণব মন্ত্র। এছাড়াও পরমহংসকে একটি মহাবাক্য গ্রহণ করতে হয়। এই মহাবাক্য ঈশ্বরের স্বরূপ ও জীব ও ব্রহ্মের অভেদ সূচক বাক্য। দ্বৈতবাদীরা যেমন রাম-রাম কৃষ্ণ-কৃষ্ণ হরি-হরি বা দুর্গা-দুর্গা বলে থাকেন, তেমনি এই সন্ন্যাসীরা অদ্বৈত মতে সোঽহং, শিবোঽহং, অহং ব্রহ্মাস্মি, তত্ত্বমসি বা অয়মাত্মা ব্রহ্ম বলে থাকেন। এই সবের অর্থ আমিই সেই, আমিই শিব, আমি ব্রহ্ম, তুমি সেই ব্রহ্ম বা এই জীবাত্মা ব্রহ্ম। এরই নাম মহাবাক্য।

পরমহংসদের মধ্যেও দুটি ভাগ দেখতে পাওয়া যায়—কেউ দণ্ডী পরমহংস, কেউ বা অবধূত পরমহংস। অর্থাৎ কেউ দণ্ড ত্যাগ করে পরমহংস হন। আর কেউ অবধূত হবার পরে পরমহংস হন।

স্ত্রীলোককেও অবধূত হতে দেখা গেছে। পশ্চিমাঞ্চলে এই সন্ন্যাসিনাদের অবধূতানী বলা হয়। অবধূতী সংস্কৃত শব্দ। সন্ন্যাসীদের মতো তাঁরাও ভস্ম মাখেন ও রুদ্রাক্ষ ধারণ করেন এবং ভিক্ষা করে তীর্থ ভ্রমণ করেন।

ঘরবারী দণ্ডীদের মতো ঘরবারী সন্ন্যাসীও আছে। তাঁরা গৃহী ও সংসারী। তাঁদের বিবাহাদি নিজেদের সম্প্রদায়ের মধ্যেই হয়। কিন্তু সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীরা তাঁদের নিকৃষ্ট মনে করেন।

ত্যাগ-সন্ন্যাসীরা সর্বত্যাগী। এঁরা ভিক্ষা করেন না। কিছু পেলে খান, না পেলে খান না। পরিধেয়র ব্যাপারেও তাই। বস্ত্র পেলে পরিধান করেন, না পেলে বিবস্ত্র থাকেন। তত্ত্বজ্ঞানে উচ্চমার্গে পৌঁছলেই ত্যাগ-সন্ন্যাসী হওয়া সম্ভব। কাশীর তৈলঙ্গ স্বামী ত্যাগ-সন্ন্যাসী ছিলেন বলে প্রসিদ্ধি আছে।

নাগা

নাগা শব্দটি হিন্দুস্থানী নঙ্গা শব্দ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ উলঙ্গ। এক সময়ে এক সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীরা উলঙ্গ থাকতেন বলে তাঁরা নাগা সন্ন্যাসী নামে অভিহিত হয়েছিলেন। তাঁরা মাথার জটা খোঁপার মতো করে বাঁধেন। কিন্তু এখন আইন ভঙ্গের ভয়ে আর উলঙ্গ অবস্থায় থাকতে পারেন না।

নাগফনী নামে এক রকমের কৌপীন পরিধান করেন। এঁরা বিভূতির উপাসনা করেন। এঁদের নিরঞ্জনী নির্বাণী প্রভৃতি আখড়া আছে। আখড়ার মোহান্তরা শিষ্য গ্রহণ করেন।

নাগা সন্ন্যাসীরা উগ্র স্বভাবের এবং কলহপ্রিয়। প্রয়োজন বোধে যুদ্ধ-বিগ্রহে সক্ষম। কুম্ভমেলায় বৈষ্ণবদের সঙ্গে এঁদের বিবাদের কথা প্রবাদে দাঁড়িয়েছে।

অঘোরী

অঘোর মন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে সন্ন্যাসীরা অঘোরী হন। এক সময়ে সকলের ধারণা ছিল যে অঘোরীরা দৈব শক্তির অধিকারী এবং সন্ন্যাসীরাও অঘোর মন্ত্রকে অত্যন্ত শক্তিশালী মনে করে অঘোরী হতেন। তাঁরা উৎকট বিধানে কোনো ঘোর রূপা শৈব-শক্তির উপাসনা করেন। অঘোরীরা নরবলি দিতেন এবং নরমাংস খেয়ে সেই মৃত মানুষকে পুনর্জীবিত করতে পারতেন বলে সাধারণের বিশ্বাস ছিল। শৈব উদাসীনরা এই সব কথা বলে থাকেন।

বর্তমানে অঘোরীদের সংখ্যা খুব কম। শোনা যায় যে তাঁরা সবকিছু ব্রহ্ম-ময় মনে করেন, এই সমদৃষ্টি প্রচারের জন্য নিজের শরীরে চন্দন জ্ঞানে মল মূত্রও লেপন করে থাকেন এবং নানা রকমের বীভৎস কাজ করে গৃহস্থকে ভয় দেখান।

আলেখিয়া

যে সন্ন্যাসীরা অলয় নাম করে ভিক্ষা করেন তাঁদের আলেখিয়া বলা হয়। এঁদের বৈশিষ্ট্য হলো এই যে এঁরা যা পান তা একা খান না, রেঁধে বেড়ে অন্য সন্ন্যাসীদেরও খাওয়ান। সাধারণত সন্ন্যাসীরা যখন এক সঙ্গে তীর্থযাত্রায় বার হন, তখন ভিক্ষা করে সবাইকে রেঁধে খাওয়ানোর ভার নেন আলেখিয়ারা।

দঙ্গলী

ভিক্ষাবৃত্তি ত্যাগ করে যে সন্ন্যাসীরা ব্যবসায়ী হয়েছেন তাঁরা দঙ্গলী নামে পরিচিত। এঁরা মঠ প্রতিষ্ঠা করে থাকেন এবং শিষ্যদের নানা রকমের

ব্যবসায় নিযুক্ত করেন। এই অর্থে মন্দির প্রতিষ্ঠা ও সন্ন্যাসীদের খাওয়া পরার ব্যবস্থা করেন।

তপস্বী সন্ন্যাসী

সন্ন্যাসীদের অনেকেই নানা রকমের শারীরিক ক্লেশ স্বীকার করে তপস্যা করে থাকেন। যাঁরা জল-শয্যায় তপস্যা করেন, তাঁদের বলে জলশয্যী; এবং যাঁরা জলধারার নিচে বসে তপস্যা করেন, তাঁরা জলধারা তপস্বী নামে অভিহিত। শীতের সময়ে এই জল তপস্যা অত্যন্ত কঠিন। তেমনি গ্রীষ্মের সময়ে কঠিন পঞ্চধূনীদের তপস্যা। এঁবা নিজের চারি দিকে ও সামনে পাঁচ জায়গায় ধূনি বা আগুন জ্বেলে তপস্যা করেন। কেউ তুই বাহু তুলে, কেউ আকাশের দিকে মুখ করে, কেউবা সারাক্ষণ দাঁড়িয়ে তপস্যা করেন। এঁরা উর্ধ্ববাহু, আকাশমুখী ও ঠাড়েশ্বরী নামে পরিচিত। যাঁরা উর্ধ্বপাদ ও অধোমস্তকে তপস্যা করেন, তাঁরা উর্ধ্বমুখী। কেউ বা মৌনী বা মৌনব্রতী। নিতান্ত প্রয়োজন হলে আকারে ইঙ্গিতে মনের ভাব প্রকাশ করেন, কিন্তু কথা বলেন না। নখ রাখা যাঁদের ব্রত, তাঁরা নখী। যাঁরা নিজেদের জিতেন্দ্রিয় বলে প্রচার করবার জন্য উলঙ্গ থেকে লিঙ্গে সারাক্ষণ লোহার কড়া ধারণ করেন, তাঁরা কড়া লিঙ্গী।

আহারের সংযমও এক রকমের তপস্যা। যাঁরা শুধু ফলমূল খেয়ে জীবন ধারণ করেন, তাঁরা ফরারী বা ফলহারী নামে পরিচিত। যাঁরা তুধ ছাড়া আর কিছু খান না, তাঁরা হলেন তুধাধারী এবং যাঁরা লবণ বর্জন করেছেন, তাঁরা অলুনা নামে আভহিত হন।

এছাড়া দশনামী সন্ন্যাসীদের আরও নানা রকমের নাম আছে। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো অওখড়, গুদড়, সুখড়, রুখড়, ভূখড়, কুকড় ও উখড়।

ঠিকরনাথ

ঠিক্‌রা নামের এক রকমের মাটির পাত্রে ভিক্ষা করেন বলে এই সন্ন্যাসী-দের ঠিকরনাথ বলা হয়। সাধারণত এঁদের সৌরাষ্ট্র ও কচ্ছ অঞ্চলেই দেখা যায়। এঁরা ভৈরবের উপাসক এবং এঁদের জাতির বিচার নেই।

স্বর্ভঙ্গী

এঁরাও জাতিবর্ণের বিচার ত্যাগ করেছেন এবং ভিক্ষায় সকলের অন্নই গ্রহণ করেন। এঁদের সঙ্গে অঘোরীদের অনেক মিল আছে। যদিও এঁরা সকলেই দশনামী সম্প্রদায় ভুক্ত, তথাপি অন্যান্য দশনামী সন্ন্যাসীরা এঁদের ঘৃণার চক্ষে দেখে থাকেন।

ব্রহ্মচারী

ব্রাহ্মণের প্রথম আশ্রম ব্রহ্মচর্য। কিন্তু এই ব্রহ্মচারীরা প্রথম আশ্রমভুক্ত নন। এঁরা স্বতন্ত্র একটি সম্প্রদায়। গৃহস্থরাও ব্রহ্মচারী হতে পারেন। তবে সাধারণত উদাসীনরাই ব্রহ্মচারী হয়ে থাকেন। শঙ্করাচার্যের চার মঠে চার রকমের ব্রহ্মচারা আছেন—জ্যোতির্মঠে আনন্দ, শ্রীঙ্গেরীতে চৈতন্য, গোবর্ধন মঠে প্রকাশ ও সারদা মঠে স্বরূপ ব্রহ্মচারী। এঁরা দশনামী নন, অথচ এঁদের মধ্যে অনেকে কঠোর তপস্যাও করে থাকেন।

যোগী

পাতঞ্জলের যোগদর্শন এ দেশে পুরাকালেই প্রবর্তিত হয়েছিল। অনেকেই এই যোগধর্ম গ্রহণ করে যোগী নামে বিখ্যাত হয়েছেন। যোগীরাও শৈব সম্প্রদায় ভুক্ত। এঁরা ব্রহ্মচয পালন করেন এবং হঠযোগ অভ্যাস করে নানা অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হন। যোগ শাস্ত্রে দু রকমের ধ্যান আছে। তারা বিশ্বাস করেন যে সগুণ বা সাকার দেবতার ধ্যানে অনি-মাদি ঐশ্বর্য লাভ হয় এবং নির্গুণ বা নিরাকার ব্রহ্মের ধ্যানে সমাধিস্থ হয়ে যে-কোনো শক্তি লাভ করা যায়। এমন কি স্বেচ্ছায় দেহত্যাগ করে মোক্ষলাভও সম্ভব।

যোগীদের মধ্যেও কয়েক শ্রেণী আছে। গুরু গোরক্ষনাথ যে শ্রেণীর প্রবর্তন করেন তা কন্‌ফট্ যোগী নামে পরিচিত। এঁরা তাঁদের গুরুকেই শিবের অবতার বলে মনে করেন। গোরক্ষনাথ কবীরের সমসাময়িক ছিলেন বলে মনে করা হয়। কবীরের 'বীজক' গ্রন্থে তাঁর নামের উল্লেখ

আছে। একটি প্রবাদ থেকে জানা যায় যে তিনি আদিনাথের নাতি ও মৎস্যেন্দ্রনাথের পুত্র।

আদিনাথকে নাতী মচ্ছন্দ্রনাথকে পূত।
মৈঁ যোগী গোরখ অবধূত।

হঠযোগ প্রদীপিকা প্রভৃতি গ্রন্থে এঁকে নয় জন নাথের একজন বলা হয়েছে। বাঙলা ও উড়িষ্যায় যখন চৈতন্যদেব বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করছিলেন, যোগী গোরক্ষনাথ সেই সময়েই পশ্চিমাঞ্চলে পতঞ্জলের যোগ দর্শন প্রচার করেছিলেন। তাঁর মতে যোগবলেই মানুষ সব কিছু পেতে পারে এবং যোগীরাই জগতে শ্রেষ্ঠ ও যে-কোনো বর্ণের মানুষ যোগ সাধনার অধিকারী। অনেক অলৌকিক কাহিনী তাঁর সম্বন্ধে প্রচলিত আছে। তিনি হঠযোগের প্রবর্তক বলেও স্বীকৃত। হঠযোগ সম্বন্ধে কয়েকখানি গ্রন্থ তিনি সংস্কৃতে রচনা করেছিলেন।

নাথ সম্প্রদায়

নাথ ধর্মের উদ্ভব কোন্ সময়ে হয়েছিল তা সঠিক বলা যায় না। তবে অনুমান করা হয় যে নাথ সিদ্ধাচার্যরা দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে বর্তমান ছিলেন। বাঙলায় যে চারজন নাথ গুরুর নাম পাওয়া যায় তাঁরা হলেন মীননাথ বা মৎস্যেন্দ্রনাথ, গোরক্ষনাথ, জালন্ধরী পা বা হাড়িসিদ্ধা ও কানু-পা। এঁরা শৈব, কিন্তু তন্ত্র হঠযোগ সহজিয়া প্রভৃতি মতের সংমিশ্রণে এঁদের সাধনমার্গ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। যোগীরা মাথায় জটা রাখেন, দেহে ভস্ম মাখেন, কানে কড়ি ও কুণ্ডল, গলায় সুতো, কাঁধে ঝোলা, হাতে ত্রিশূল, বাহুতে রুদ্রাক্ষ ও পায়ে নূপুর। বাঙলার নাথরা জাতে যুগী, পেশায় তাঁতি বা কবিরাজ। চৈত্রের গাজনে এঁদের উৎসব। অনেকে মৎস্যেন্দ্রনাথকে গোরক্ষনাথের গুরু বলে থাকেন। এঁর নামেও মৎস্যেন্দ্রী যোগী আছেন। এ ছাড়াও অওঘড়, শারঙ্গীহার, ডুরীহার, ও কাণিপা নামের যোগী আছেন। বিক্রমাদিত্যের ভ্রাতা ভর্তৃহরির নামেও এক শ্রেণীর যোগী আছেন, তাঁরা ভর্তৃহরিকেই তাঁদের শ্রেণীর প্রবর্তক বলে

মানেন।
অঘোরপন্থী যোগীরা কুৎসিত আচরণ করেন বলে জনশ্রুতি আছে। অনেক সময় এঁদের সঙ্গে অঘোরিণীও থাকে।
গৃহস্থ যোগীর কথাও শোনা যায়। তাদের সংযোগী বলে। আবার যোগ ধর্ম গ্রহণ করে স্ত্রীলোকেও যোগিনী হতে পারে। তাঁরা নাথিনী নামে পবিচিত।

বসব ও লিঙ্গায়ৎ সম্প্রদায়

লিঙ্গায়ৎ সম্প্রদায়ের জন্ম দক্ষিণ ভারতের কর্ণাটক রাজ্যে। দ্বাদশ শতাব্দীতে এই সম্প্রদায় প্রবর্তন করেন বসব নামে এক ব্রাহ্মণ। কানাড়ী ভাষায় বৃষভ শব্দকে বসব বলে। লিঙ্গায়ৎরা তাঁকে শিবের বাহন নন্দীর অবতার বলে মনে করেন। এঁরা শিবলিঙ্গের উপাসক। স্ত্রী পুরুষ তাঁদের গলায় শিবলিঙ্গ ধারণ করেন। কিন্তু বৈদিক ক্রিয়াকর্ম মানেন না।
বসবেব জন্ম বিজাপুর অঞ্চলে দ্বাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে। কৃষ্ণা ও ও মলপ্রভা নদীব সঙ্গমে সঙ্গমেশ্বরে তাঁর মৃত্যু হয় ১১৬৮ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁর পিতা শৈব ব্রাহ্মণ ছিলেন, কিন্তু পুত্র উপবীত গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন বলে তাঁকে তাড়িয়ে দেন। বসব কল্যাণে এসে তাঁর মামার আশ্রয় নেন। রাজার চাকরি করে খ্যাতি ও প্রতিপত্তি হলে তিনি জৈন ও বৈষ্ণব ধর্মেব বিরুদ্ধে নিজের মত প্রচাব শুরু কবেন। এর মধ্যে ছিল দেবতা ও ব্রাহ্মণের নিন্দা ও হিন্দুদের জাতিভেদ ক্রিয়াকর্ম তীর্থভ্রমণ প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতি বিধানের অবমাননা। তিনি লিঙ্গোপাসনা, স্ত্রী পুরুষের সমান অধিকার, বিধবা বিবাহ, দাহপ্রথার পরিবর্তে মৃতদেহেব সমাধি প্রভৃতি প্রচার কবেন। এই সবের জন্য বাজার কুনজরে পড়ে তাঁকে কল্যাণ ছেড়ে পালাতে হয়।
বসবকল্যাণ এখন লিঙ্গায়ৎদের তীর্থ স্থান। মহাবাষ্ট্র ও গুজবাতেও এই সম্প্রদায়েব প্রভাব বিস্তৃত হয়েছে। এদের পুরোহিতদের জঙ্গম বলা হয় বলে এই সম্প্রদায়কে জঙ্গম সম্প্রদায়ও বলা হয়ে থাকে। গৃহস্থ জঙ্গমরা বিবাহ

করেন এবং অবিবাহিত জঙ্গমদের বিরক্ত বলা হয়। সম্প্রদায়ভুক্ত স্ত্রী-পুরুষের এঁদের প্রবল প্রতিপত্তি। কিন্তু বর্তমানে এঁদের মধ্যে আবার জাতিভেদ প্রথা, ক্রিয়াকর্ম ও তীর্থ ভ্রমণের প্রচলন হয়েছে।

আতুর, মানস ও অন্ত সন্ন্যাসী

এঁরা কেউই দশনামী সন্ন্যাসীদের অন্তর্গত নন। দক্ষিণ ভারতে মুমূর্ষু লোককে মৃত্যুর ঠিক পূর্বে সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করাবার একটি প্রথা আছে। তাঁদের ধারণা যে তাতে সেই লোক মৃত্যুর পরে পরলোকে সদ্গতি লাভ করবে। কিন্তু অনেক সময়ে দেখা গেছে যে লোকটির মৃত্যু হয় নি এবং তার পরেও অনেক দিন সে জীবিত আছে। এই রকম লোককে সংসারে গ্রহণ করা হয় না। তাঁরা আতুর সন্ন্যাসী নামে বাকী জীবন যাপন করেন।

যাঁরা মনে মনে সন্ন্যাস গ্রহণ করে গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাসী জীবন যাপন করেন তাঁরা মানস সন্ন্যাসী। এঁরা গেরুয়া পরেন না, অথচ কাজে কর্মে সন্ন্যাসী।

যাঁরা যোগীর মতো ইচ্ছামৃত্যুর জন্য এক জায়গায় বসে উপবাসে থেকে ঈশ্বরচিন্তায় মগ্ন হন, তাঁরা অন্ত সন্ন্যাসী। এ রকম সন্ন্যাসী বিরল হলেও আছেন বলে শোনা যায়।

ভোপা

এঁরা ভৈরবের উপাসক। ভৈরবের মূর্তির উপরে এঁরা পূজা করেন। এঁদের মধ্যেও গৃহস্থ ও উদাসীন এই দুটি শ্রেণী আছে।

দশনামী ভাঁট

এঁরা দশনামী নন, সন্ন্যাসীও নন, দশনামী সন্ন্যাসীদের শিষ্যপরম্পরা লিখে রাখা ও প্রকাশ করাই এঁদের বৃত্তি। এঁরা দশনামীদের নিকট ছাড়া আর কারও নিকটে ভিক্ষা গ্রহণ করেন না। এঁরা গৃহস্থ ও শিব ভক্ত, কিন্তু শিবপূজার আগে সরস্বতীর পূজা করে থাকেন।

শাক্ত সম্প্রদায়

শক্তির উপাসকরা শাক্ত নামে পরিচিত। সাধারণভাবে শক্তি শিবজায়া, কিন্তু কালী তারা দুর্গা প্রভৃতি তাঁর নানা রূপ। পৌরাণিক কাহিনীতে সতী শিবকে ভয় দেখাবার জন্য দশ মহাবিদ্যার রূপ পরিগ্রহ করেছিলেন। প্রকৃত পক্ষে যিনি ঈশ্বর, তিনিই শিব, তিনিই আবার শক্তি। বিষ্ণুও তিনিই। বৈষ্ণবরা বিষ্ণু রূপে, শৈবরা শিবরূপে এবং শাক্তরা শক্তিরূপে ঈশ্বরেরই উপাসনা করেন। নাম ও মূর্তি নিয়েই বিভিন্ন উপাসক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছে।

শঙ্করাচার্য 'আনন্দ লহরী'তে বলেছেন যে শিব ও শক্তি একই তত্ত্ব। শক্তি শিবের দেহ, দুয়ের অঙ্গাঙ্গিভাব সম্বন্ধ। শিব ও শক্তির মিলনের ফলেই বিশ্বপ্রপঞ্চের সৃষ্টি হয়েছে। শিবের সৃষ্টির ইচ্ছা অর্থাৎ শিবের ধর্মকেই শক্তি বলে। এই শক্তিই আদ্যাশক্তি বা মহামায়া। বেদান্তের মায়া জড় পদার্থ, কিন্তু মহামায়া চৈতন্যরূপিনী। বিশ্বের সব বস্তুতে এই চৈতন্যরূপিনী শক্তির লীলা চলছে। তাই সব পদার্থই চেতন। শক্তিকে আশ্রয় করেই ঈশ্বর মূর্তি ধারণ করেন। পুরুষ মূর্তিতে তিনি শিব বিষ্ণু প্রভৃতি পুরুষ দেবতা, স্ত্রীমূর্তিতে তিনিই দুর্গা কালী প্রভৃতি দেবী। এ সবই শিবশক্তির স্ফুরণের ফল। তাঁদের সম্বন্ধ নিত্য, তাই তাঁদেব বিচ্ছেদ নেই। উভয়ের এই মিলকে যুগল বা যামল বলা হয়। শক্তি শিব থেকে ভিন্ন না হলেও শিবের ধর্মরূপা। তিনি যামল রূপে কর্তৃত্বের সম্পাদন করেন। এইভাবেই শিবের সঙ্গে শক্তির কিছু ভেদ কল্পনা করা হয়েছে। পুরুষে শিবভাব ও নারীতে শক্তিভাবের প্রকাশ বেশি।

তন্ত্রশাস্ত্র মতেই শক্তির উপাসনা করা হয়। এই শাস্ত্রে শক্তির স্ফুরণকে কুল বলা হয়েছে। কুলে এই বিশ্বের উদয় ও অস্ত। তিন রকম ভাবে শক্তির উপাসনা করা হয়ে থাকে। এই ভাবত্রয়কে পশুভাব, বীরভাব ও দিব্যভাব বলে। পশুভাবে মদ ও মাংসের ব্যবহার নিষিদ্ধ। এ ছাড়া আচার সাত রকম—বেদাচার, বৈষ্ণবাচার, শৈবাচার, দক্ষিণাচার, বামাচার, সিদ্ধান্তাচার ও কৌলাচার। এই সব আচার একে একে পালন করে যাঁরা

কৌলাচারী হবেন, তাঁদের আর কোনো নিয়ম পালনের প্রয়োজন থাকে না। স্থান কাল পাত্রের বিচারও নিষ্প্রয়োজন।

সাধারণত তান্ত্রিকদের মধ্যে দুটি আচারের প্রাধান্য দেখা যায়। সে দুটি হলো দক্ষিণাচার ও বামাচার। যাঁরা প্রকাশ্য ভাবে শক্তির উপাসনা করেন তাঁরা দক্ষিণাচারী এবং যাঁরা রাত্রে গোপনে পঞ্চ ম-কার সহযোগে উপাসনা করেন তাঁরা বামাচারী। মদ্য মাংস মৎস্য মুদ্রা ও মৈথুন এই পাঁচটিকে পঞ্চ ম-কার বলা হয়। মদের সঙ্গে যা খাওয়া হয় তাকে মুদ্রা বলে। সিদ্ধির জন্য বামাচারীদের এই নিয়ম অবশ্য পালনীয়। শক্তি বা বামা রূপে নিজেকে কল্পনা করা হয় বলেই বামাচারী বলা হয়ে থাকে। তন্ত্রমতে পঞ্চমকার গ্রহণে অতি অল্প আয়াসেই চঞ্চল চিত্ত সাধনায় স্থির হয়।

ভারতের প্রায় সর্বত্রই তন্ত্রমতে শক্তি উপাসনার প্রচলন আছে। দক্ষিণ ভারতে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রাধান্য হলেও শৈব ও শাক্তের সংখ্যাও কম নয়। উত্তর ভারতে শিব ও শক্তির উপাসনাই প্রবল। পূব ভারতে শাক্তই বেশি, আবার বৈষ্ণবও আছেন।

তান্ত্রিকদের মধ্যে প্রধানত তিনটি সম্প্রদায় দেখা যায়—গৌড়, কেরল ও কাশ্মীর সম্প্রদায়। গৌড় সম্প্রদায়ে বামাচারের প্রাধান্য, অর্থাৎ পূজায় পঞ্চমকার অপরিহার্য। কেরল সম্প্রদায়ে পঞ্চমকারের চিন্তা আছে, কিন্তু ব্যবহার কম। কাশ্মীর সম্প্রদায় পঞ্চমকারের অনুকল্প গ্রহণ করেছেন।

শক্তি সাধনা যে খুব প্রাচীন তাতে সন্দেহ নেই। অথর্ব বেদেই তন্ত্র-শাস্ত্রের সূত্র প্রকাশিত হয়েছে। তবে সাধারণ ভাবে মনে করা হয় যে সপ্তম থেকে নবম শতাব্দীর মধ্যে তন্ত্রসাধনা এদেশে প্রবল হয়ে ওঠে। অনেকে মনে করেন যে পরবর্তী কালে এই সাধনার মধ্যে অনেক অবান্তর ও অশ্লীল অনুষ্ঠান স্থান পেয়েছে।

কাপালিক

এঁরা শৈব বা শাক্ত সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। সাধনায় এঁরা বামাচারী। প্রবোধ চন্দ্রোদয় নামক নাটকে পাওয়া যায় যে এঁরা শ্মশানবাসী, নরাস্থি-

মালা এঁদের ভূষণ, নরকপালে এরা ভোজন করেন, ব্রাহ্মণ নরকপালে সুরাপান করেন, নরবলি দিয়ে মহাভৈরবের পূজা করেন এবং নরমাংস আহুতি দেন অগ্নিতে। এঁরা যোনিরূপ আসনে অবস্থিত আত্মার ধ্যান করে নির্বাণ লাভ করেন।

করারী

এঁরা কালী চামুণ্ডা প্রভৃতি শক্তির ভয়ঙ্কর মূর্তির উপাসক। এঁদের সঙ্গে কাপালিক ও অঘোরীর অনেক সাদৃশ্য আছে। আইনে নরবলি এখন নিষিদ্ধ হয়েছে। এঁরা তাই নিজের দেহকেই নানা ভাবে কষ্ট দেন। বাঙলার চড়ক পূজায় এঁদের দেখতে পাওয়া যায়।

ভৈরব ও ভৈরবী

এঁরা শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত পুরুষ ও নারী। গেরুয়া বস্ত্র পরিধান করে দেহে বিভূতি ও কপালে সিঁদুর মেখে ও গলায় রুদ্রাক্ষের মালা পরে ত্রিশূল হাতে এঁরা ঘুরে বেড়ান। শক্তির উপাসনা করেন পঞ্চমকারে। ভৈরবীরা ভৈরবীচক্রে এবং বামাচারীদের কুলচক্রে বসে সমস্ত কুলকর্মের অনুষ্ঠান করেন।

চলিয়াপন্থী

একটি বামাচারী শাক্ত সম্প্রদায়। রাজস্থানে এঁদের বাস। চক্রেশ্বর নামে এই সম্প্রদায়ের গুরুরা সস্ত্রীক শিষ্যদের নিয়ে চক্র রচনা করেন। এই চক্রে একটি নির্দিষ্ট প্রথায় ভৈরবী নির্বাচন করা হয়।

গাণপত্য সম্প্রদায়

গণেশের নামে দীক্ষা নিয়ে যাঁরা গণেশকে ইষ্টদেবতা রূপে পূজা করেন, তাঁরাই গাণপত্য নামে পরিচিত। গণেশ, শিব ও পার্বতীর পুত্র, তাঁরই অন্য নাম গণপতি থেকে গাণপত্য সম্প্রদায় সৃষ্টি হয়েছে। গণেশ বিঘ্ননাশক ও সিদ্ধিদাতা, যে-কোনো দেবতার পূজার পূর্বে গণেশের পূজা করতে হয়। বর্তমান গণেশের উপাসকের সংখ্যা খুব বেশি না হলেও মহারাষ্ট্রে গণেশের

পূজাই সব চেয়ে বড় উৎসব। ভাদ্র মাসের শুক্লা চতুর্থীকে গণেশ চতুর্থী বলে। মাঘমাসের শুক্লা চতুর্থীতেও গণেশের বিশেষ পূজা হয়। তন্ত্রশাস্ত্রে গণেশের নানা রূপের পূজার বিবরণ আছে।

সৌর সম্প্রদায়

সূর্যের উপাসকদের সৌর বলা হয়। সূর্যই বিশ্বের আদি দেবতাদের মধ্যে অন্যতম প্রধান দেবতা। তাঁকে ইষ্টদেবতা রূপে গ্রহণ করে সৌর সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল। এখন এই সম্প্রদায় গাণপত্য সম্প্রদায়ের মতোই অপ্রধান হয়ে পড়েছে।

এক সময়ে যে সারা ভারতে সূর্য পূজার প্রচলন ছিল তার প্রমাণ এখনও আছে। কাশ্মীরে মার্তণ্ড মন্দির, গুজরাতে মঠেরার সূর্য মন্দির এবং উড়িষ্যার কোনার্ক মন্দির সূর্য পূজার প্রতিষ্ঠাব স্বাক্ষর বহন করছে। বিহার ও উত্তর-প্রদেশে সূর্যের ছটপূজা মহা সমারোহে এখনও অনুষ্ঠিত হয়।

হিন্দুধর্মের বিষ্ণু শিব শক্তি গণপতি ও সূর্য এই পাঁচজন দেবতাকে নিয়ে পাঁচটি সম্প্রদায়ের বিবরণ দেওয়া হলো। এর মূল উপাদান অক্ষয়কুমার দত্ত রচিত 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়—' গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত হয়েছে। এই গ্রন্থের দুটি ভাগ শতাধিক বৎসর পূর্বে প্রকাশিত হয়েছিল। জন জীবনে তখন ধর্মচর্চার যে ধারা প্রচলিত ছিল, এখন আর তা নেই। সম্প্রদায়ভেদ মানুষকে এখন আর তেমন প্রভাবিত করে না। তাই বহু সম্প্রদায় এখন নির্জীব। এর পরিবর্তে এখন বহু আশ্রম বা মঠের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। প্রতিষ্ঠাতাদের শিষ্য প্রশিষ্যরা সেই সব আশ্রম বা মঠ পরিচালনা করেন এ সবের আলোচনা অনুচিত হবে বলে মনে হয়।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

আধুনিক যুগের অধ্যাত্মবাদ

বামমোহন রায় ও ব্রাহ্মসমাজ—দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ব্রাহ্মধর্ম—কেশবচন্দ্র সেন ও নববিধান—সহজানন্দ স্বামী ও স্বামী নারায়ণ সম্প্রদায়—দয়ানন্দ সরস্বতী ও আর্য সমাজ—রামকৃষ্ণ পরমহংস—বিবেকানন্দ ও বামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন—নাবায়ণ গুরু—শ্রীঅরবিন্দ—রমন মহর্ষি—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভারতে অধ্যাত্ম চিন্তার ধাবা এখনও অব্যাহত আছে। কত যোগী সাধক ও মহাপুরুষ এ দেশে জন্মগ্রহণ কবে এই চিন্তাকে নানা ধারায় প্রবাহিত করেছেন তার মুল্যায়ন কবা অসম্ভব কাজ বলে মনে হয়। এঁদেব জীবন কথা অলৌকিক ঘটনায় পূর্ণ। এঁবা তাঁদের সাধনার জীবনে যে সত্য উপলব্ধি কবেছেন, সকলে তা প্রকাশ করেন নি। কেউ লিখে রেখে গেছেন, কেউ বলে গেছেন শিষ্যমণ্ডলীকে, কেউ নিঃশব্দে বিদায় নিয়ে গেছেন এই পৃথিবী থেকে। তাই এই সব যোগী সাধক ও মহাপুরুষদের কথা বলতে গেলে তাঁদেব সবাব মতামত লিপিবদ্ধ করা সম্ভব নয়। যত-টুকু জানা গেছে, তাব চেয়ে অজানাই বেশি। কাউকে বাদ দিয়ে কাউকে গ্রহণ করা উচিত হবে না। আবার কয়েক জনের নাম ও মতাদর্শেব কথা না বললে এই প্রসঙ্গ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

রামমোহন রায় ও ব্রাহ্মসমাজ

রামমোহন রায়ের জন্ম ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে, মতান্তরে দু বছর পরে। সারা দেশে তখন পুরাণ ও তন্ত্র মত প্রবল আকার ধারণ করেছে। সাধারণের ধারণা যে উপনিষদের ব্রহ্ম চিন্তা শুধু সন্ন্যাসীদের জন্য। অথচ রামমোহন দেখলেন যে মহানির্বাণ তন্ত্রেও ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের কর্তব্যকর্মের উল্লেখ

আছে। এই আদর্শে প্রভাবিত হয়ে তিনি সংস্কৃতে হিন্দুশাস্ত্র সমূহ, হিব্রু ভাষা শিখে বাইবেল এবং আরবী ভাষায় কোরাণ পড়লেন। এই তিন ধর্মের মূলে যে ঐক্য আছে তা আবিষ্কার করে স্থির করলেন যে ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের লক্ষণ তিনি যুগের উপযোগী করে শিক্ষা দেবেন। এই উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে 'ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠা করলেন। তিনি চাইলেন যে ভারতে এক অসাম্প্রদায়িক উদার ধর্মের প্রতিষ্ঠা হোক। এই ধর্মে হিন্দুর ব্রহ্মোপলব্ধি বা আত্মোপলব্ধি, সর্বভূতে আত্মানুভূতি ও নির্গুণ নিরাকার পরব্রহ্মের উপাসনা থাকবে; খ্রীষ্ট ধর্মের কল্যাণ বাণী থাকবে; আবার ইসলাম ধর্মের জ্ঞান ও প্রেমের সমন্বয়ও থাকবে। যুক্তিবাদী রামমোহন উপনিষদের ব্রহ্মবাদের সঙ্গে পুরাণ ও তন্ত্রের বচনও গ্রহণ করলেন, তারই সঙ্গে প্রতীক বা প্রতিমা পূজার সার্থকতাও স্বীকার করলেন। তিনি আশা করেছিলেন যে ভারতের হিন্দু উপনিষদের ধর্ম গ্রহণ করলে অচিরে একটা সামাজিক ও জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হবে। তাই বলেছিলেন, I think some change should be introduced into their religion, at least for political advantage and social comfort.'

রামমোহন শঙ্করের মায়াবাদকে বর্জন করে তাঁর অদ্বৈতবাদকেই সাধনার শেষ স্তর বলে গ্রহণ করেছিলেন। ব্রহ্মকে নিরাকার ও নির্গুণ বলে মেনে নিলেও তিনি সাধনার বিশেষ স্তরে সগুণ ব্রহ্মের উপাসনাকে অস্বীকার করেন নি। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে বিদেশে রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যু হয়।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ব্রাহ্ম ধর্ম

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে। ছাব্বিশ বৎসর বয়সে তিনি ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তী জীবনে তিনি বেদান্তের অদ্বৈতবাদ ও নির্গুণ ব্রহ্মবাদে আর বিশ্বাস করেন নি। তিনি বলেছেন, "যখন উপনিষদে দেখিলাম, 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম', 'সোঽহং' 'তত্ত্বমসি'—'এই

আত্মা ব্রহ্ম', 'তিনি আমিই', 'তিনি তুমি'—তখনই বুঝিলাম যে ব্রাহ্ম-ধর্মের মূল তত্ত্বের সহিত ইহার সকল বাক্যের ঐক্য নাই।"

তিনি বললেন, 'আত্মপ্রত্যয় সিদ্ধ জ্ঞানোজ্জ্বলিত বিশুদ্ধ হৃদয়ই ধর্মের উৎস। ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মধ্যান ও ব্রহ্মানন্দ রসপানই ধর্মচেতনার প্রধান কথা। উপনিষদ থেকেই তিনি ব্রাহ্ম ধর্মের মূল কথাগুলি আহরণ করলেন, বললেন, সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম, আনন্দরূপম্ অমৃতম্ যদ্বিভাতি, শান্তম্ শিবমদ্বৈতম্ শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্, সত্যং শিবং সুন্দরম্, রসো বৈ সঃ, ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলম, ওঁ তৎ সৎ, ইত্যাদি।

রামমোহনের মতো দেবেন্দ্রনাথও বিশ্বাস করতেন, 'যদি বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করিতে পারি, তবে সমুদয় ভারতবর্ষের ধর্ম এক হইবে, পরস্পর বিচ্ছিন্ন ভাব চলিয়া যাইবে, সকলে ভ্রাতৃভাবে মিলিত হইবে। তার পূর্বেকার শক্তি ও বিক্রম জাগ্রত হইবে এবং অবশেষে সে স্বাধীনতা লাভ করিবে—আমার মনে তখন এত উচ্চ আশা হইয়াছিল।'

কেশবচন্দ্র সেন ও নববিধান

কেশবচন্দ্র সেনের জন্ম ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে। তিনি ব্রাহ্ম ধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের নিকটে। কিন্তু পরে তিনি উপনিষদ বা বেদান্তকে ব্রাহ্ম ধর্মের মূল রূপে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন এবং ব্রাহ্মধর্ম যে হিন্দু ধর্মেরই যুগোপযোগী রূপ তাও মানতে চান নি। যে ব্রাহ্মধর্ম যুক্তি-যুক্ত শাস্ত্র বাণীর উপরে নির্ভরশীল ছিল, তা গ্রহণ না করে তিনি যা বললেন তার অর্থ হলো—এই বিশাল বিশ্বই পবিত্র ব্রহ্ম মন্দির এবং নির্মল চিত্তই তীর্থ। সত্য হলো অনশ্বর শাস্ত্র এবং বিশ্বাস ধর্মের মূল। প্রীতি পরম সাধন এবং স্বার্থনাশই বৈরাগ্য।

কেশবচন্দ্র প্রেরিত পুরুষবাদে বিশ্বাস করেছেন। তাঁর কাছে শাস্ত্র ছিল ঈশ্বরের বাণী এবং ধর্মগুরু ঈশ্বর প্রত্যাদিষ্ট। ধর্ম সমন্বয়ে নিজের বিচার বুদ্ধি দিয়ে গ্রহণ ও বর্জনের নীতিতে তাঁর বিশ্বাস ছিল না। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ব্রাহ্ম ধর্মকে 'নববিধান' বলে ঘোষণা করেন। এতে বিশ্বের সমস্ত

ধর্ম শাস্ত্রের বাণী গ্রহণ করে ব্রাহ্মধর্মকে বিশ্বজনীন সর্ব ধর্ম সমন্বয়ের রূপ দেবার চেষ্টা হলো।

সহজানন্দ স্বামী ও স্বামী নারায়ণ সম্প্রদায়

রামমোহন রায়ের সমসাময়িক ছিলেন সহজানন্দ স্বামী। তাঁর জন্ম ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে অযোধ্যার নিকটে এক গ্রামে এবং ঊনপঞ্চাশ বৎসর বয়সে গুজরাতে তাঁর মৃত্যু হয়। বৈষ্ণব ধর্মে যে দুর্নীতি প্রবেশ করেছিল তা দূর করে এক শুদ্ধ ও পবিত্র ধর্মের পথ প্রদর্শনের জন্য তিনি বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন। এর জন্য তাঁকে কারারুদ্ধ হতে হয়। কিন্তু এই নির্যাতনের ফলে তাঁর জনপ্রিয়তা আরও বেড়ে যায়। মুক্তির পরে তিনি গুজরাতের এক গ্রামে লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির প্রতিষ্ঠা করে ধর্মপ্রচার শুরু করেন। তাঁর সম্প্রদায় এখন স্বামী নারায়ণ সম্প্রদায় নামে পরিচিত এবং কৃষ্ণের পাশে সহজানন্দ স্বামীর মূর্তিও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সম্প্রদায়ের সাধুরা গেরুয়াধারী ব্রহ্মচারী দণ্ড কমণ্ডলু নিয়ে জনসাধারণের মধ্যে ধর্মপ্রচার করেন। এঁদের ধর্মগ্রন্থের নাম শিক্ষাপত্রী, সহজানন্দ স্বামী সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় এটি রচনা করেছিলেন।

দয়ানন্দ সরস্বতী ও আর্যসমাজ

দয়ানন্দ সরস্বতীর জন্ম ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিম ভারতের মোরভি শহরে। তাঁর পিতৃদত্ত নাম মূলশঙ্কর, সন্ন্যাস গ্রহণের পর তাঁর নাম হয় দয়ানন্দ সরস্বতী। তাঁরা শৈব ব্রাহ্মণ ছিলেন, কিন্তু প্রতীক পূজায় বিশ্বাস করতেন না। পিতা তাঁর বিবাহের ব্যবস্থা করলে তিনি পালিয়ে সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করেন। প্রথমে তিনি বেদান্ত পড়েন, তারপর যোগ সাধনা করেন। শেষে মথুরাবাসী সন্ন্যাসী স্বামী বিরজানন্দর নিকট বেদাধ্যয়ন করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে বেদের ধর্মই প্রকৃত হিন্দু ধর্ম এবং পুরাণের প্রতিমা পূজা কুসংস্কার। বেদকেই তিনি ঈশ্বর প্রকাশিত অভ্রান্ত শাস্ত্র বলে মেনে নিলেন এবং পৌরাণিক ধর্মের বদলে সারা দেশে বেদের ধর্মকে পুনরায় প্রতিষ্ঠার

জন্য বদ্ধপরিকর হলেন। এই উদ্দেশ্যেই ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বায়ে আর্য সমাজের প্রতিষ্ঠা করেন।

দু' বছরের মধ্যেই এই সমাজের একটা সুনির্দিষ্ট ধর্ম মত নির্ধারিত হয় এবং সমাজের সভ্য বা আর্যদের দশটি নীতি মেনে চলতে বলা হয়। এই গুলি হলো—ঈশ্বর সকল জ্ঞানের উৎস। তিনি নিরাকার, জগতের কারণ, সত্য স্বরূপ ও সকল গুণের অধিকারী। তাই একমাত্র তিনিই পূজনীয়। আপ্ত শাস্ত্র বা বেদ সকল জ্ঞানের আকর বলে বেদাধ্যয়ন শ্রবণ ও প্রচার সকলের কর্তব্য। আর্যরা সব সময়ে সত্যকে গ্রহণ ও অসত্যকে বর্জন করে চলবেন। ন্যায় অন্যায়ের বিচার করে ধর্মসঙ্গত ভাবে সব কাজ করতে হবে। আর্য সমাজ সর্বদা সকল মানুষের দৈহিক আধ্যাত্মিক ও সামাজিক উন্নতির জন্য চেষ্টা করবে। মানুষের সঙ্গে ব্যবহারে ন্যায় ও প্রীতির দৃষ্টিতে বিচার করতে হবে। অজ্ঞানতা দূর করে জ্ঞানের প্রসারের চেষ্টা করতে হবে। শুধু নিজের মঙ্গল চিন্তা নয়, জনসাধারণের স্বার্থও দেখতে হবে। ব্যক্তিগত ব্যাপারে স্বাধীনতা থাকলেও প্রয়োজন হলে সমাজের বা জাতির স্বার্থে নিজের স্বার্থ ত্যাগ করতে হবে।

দয়ানন্দ নিজের রীতিতে বেদের বিশেষ ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর রচিত 'সত্যার্থ প্রকাশ' আর্য সমাজের ধর্মগ্রন্থ। আর্যরা অদ্বৈতবাদ মানেন না। তাঁরা ঈশ্বর প্রকৃতি ও জীবাত্মা এই তিন তত্ত্বে বিশ্বাস করেন। কর্মবাদ ও জন্মান্তরবাদও তাঁরা মানেন। হিন্দু সমাজে প্রচলিত জাতিভেদ প্রথা সম্বন্ধে তাঁরা মনে করেন যে পুরাকালে রাজনৈতিক ও সামাজিক সুবিধার জন্যই চারি বর্ণের সৃষ্টি হয়েছিল এবং ধর্মের সঙ্গে বর্ণ বিভেদের কোনো সম্বন্ধ নেই। তাই আর্য সমাজে অস্পৃশ্য জাতিরও সমান অধিকার। এমন কি ধর্মান্তরিত হিন্দুকেও পুনরায় হিন্দু হবার সুযোগ দেওয়া হয়।

দয়ানন্দ আজমীরে দেহরক্ষা করেন ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁর অবর্তমানে সমাজে কিছু মতভেদ দেখা দেয় এবং নয় বৎসর পরে এই সমাজ প্রাচীন পন্থী ও নবীন পন্থী এই দুই দলে বিভক্ত হয়ে যায়। এঁদের মতভেদের মূল কারণ দুটি—একটি মাংসাহার ও অপরটি পাশ্চাত্য ধারায় উচ্চ শিক্ষা।

প্রাচীন পন্থীরা মাংসাহার পাপ মনে করেন এবং দয়ানন্দের মতো বেদের শিক্ষা ও প্রচারকেই প্রধান কর্তব্য বলে মানেন। নবীন পন্থীরা বলেন যে মাংসাহারে দোষ নেই এবং শিক্ষা যুগোপযোগী হওয়াই বাঞ্ছনীয়।
আর্য সমাজ উত্তর ভারতের প্রায় সর্বত্র প্রসারিত হয়েছে। কিন্তু দক্ষিণ ভারত ও ভারতের পূর্বাঞ্চলে তেমন জনপ্রিয় হয়ে ওঠে নি। প্রচারের কাজে দয়ানন্দ যখন বাঙলায় এসেছিলেন, তখন তাঁর সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি ব্রাহ্ম সমাজের নেতাদের সঙ্গে পরিচয় ও বন্ধুতা হয়েছিল। কিন্তু মতের মিল হয় নি। পরবর্তীকালে বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি আদি ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিনিধিরা আর্য সমাজের সঙ্গে যোগ স্থাপনের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছিলেন।

রামকৃষ্ণ পরমহংস

১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে বাঙলার কামারপুকুর গ্রামে রামকৃষ্ণের জন্ম। তাঁর বাল্য নাম গদাধর। দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাসমণির কালী মন্দিরে তিনি পূজারী হয়ে আসেন এবং বিভিন্ন ধর্ম মার্গের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন। বৌদ্ধ খ্রীষ্ট ইসলাম ও শিখধর্মের মূল তত্ত্বের সঙ্গে পরিচিত হয়ে তিনি প্রচার করেন, 'সব ধর্মই সত্য ; যত মত তত পথ'।
তিনি তেইশ বৎসর বয়সে ছয় বৎসরের বালিকা সারদামণিকে বিবাহ করেন। উনিশ বৎসর বয়সে সারদামণি যখন দক্ষিণেশ্বরে আসেন, তখন রামকৃষ্ণ তাঁকে দেবীজ্ঞানে পূজা করেন। তাঁর ধর্ম সাধনায় লব্ধজ্ঞান, নিরহঙ্কার ও নিরাসক্ত সরল জীবনযাত্রা, ধর্মোপদেশ ও সঙ্গীতে আকৃষ্ট হয়ে সমসাময়িক কালের বহু জ্ঞানী ব্যক্তি তাঁর ভক্ত হয়েছিলেন।
এক ভৈরবী তাঁকে অবতার বলেছিলেন। তারপর এক ধর্মসভায় মীমাংসার পর ঘোষণা করা হয় যে তিনি সত্যই ঈশ্বরের অবতার। শেষ শয্যায় শুয়ে নিজের দেহটি আঙুল দিয়ে দেখিয়ে তিনি বলেছিলেন, 'ওরে, যে রাম, যে কৃষ্ণ হয়েছিল, সে-ই ইদানীং এই খোলটার ভেতর—তবে এবারে গুপ্ত ভাবে আসা। যেমন রাজার ছদ্মবেশে নিজ রাজ্য পরিদর্শন। যেমনি জানা-

জানি কানাকানি হয়, অমনি সে সেখান থেকে সরে পড়ে—সেই রকম।'
তিনি মনে করতেন, 'ভগবানের সঙ্গে জীবের খুব ঘনিষ্ঠ নিকট সম্পর্ক, যেমন লোহা ও চুম্বক। তবে জীবের প্রতি ঈশ্বরের আকর্ষণ হয় না কেন জান? যেমন লোহাতে কাদা মাখান থাকলে চুম্বক টানে না, সেইরূপ জীবে মায়ারূপ কাদা মাখান থাকলে ঈশ্বর টানে না, লোহার কাদা ধুয়ে গেলে চুম্বক টানে। সেই রকম তাঁর কাছে কাঁদলে যখন জীবের মায়ারূপ কাদা ধুয়ে যায় তখন ভগবান টানেন।'

'সকল মানুষের ভিতরে ভগবান বিদ্যমান, মানুষের বহিরাবরণটা শুধু স্বতন্ত্র। মানুষ কেমন? যেমন বালিশের খোল। বালিশের খোলে যেমন নানা রং থাকে—কোনোটা লাল, কোনোটা সাদা, কিন্তু ভিতরে তূলো, মানুষও ঠিক সেই রূপ।'

'ঈশ্বর লাভের জন্য সংসারে থেকে এক হাতে ঈশ্বরের পাদপদ্ম ধরে থাকবে আর এক হাতে কাজ করবে। যখন কাজ থেকে অবসর হবে, তখন দুই হাতেই ঈশ্বরের পাদপদ্ম ধরে থাকবে, তখন নির্জনে বাস করবে, কেবল তাঁর চিন্তা ও সেবা করবে।'

'ঈশ্বরকে ব্যাকুল হয়ে খুঁজলে তাঁকে দর্শন হয়, তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়, কথা হয়; যেমন আমি তোমাদের সঙ্গে কথা কচ্ছি। সত্য বলছি দর্শন হয়।'

'সত্য কথাই কলির তপস্যা। সত্যকে আঁট করে ধরে থাকলে ভগবান লাভ হয়।'

পঞ্চাশ বৎসর বয়সে ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি দেহরক্ষা করেন। তিনি নিজে কোনো ধর্মগ্রন্থ রচনা করেন নি; তার উপদেশ। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে।

বিবেকানন্দ এবং রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন

রামকৃষ্ণের শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন বিবেকানন্দ। তাঁর জন্ম ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা শহরে। নাম ছিল নরেন্দ্র নাথ দত্ত। প্রথম জীবনে

ব্রাহ্ম ধর্মে ও পাশ্চাত্যদর্শনে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। নেম ঋষির মতো তাঁর প্রথম জিজ্ঞাসা ছিল, কে দেখেছে ঈশ্বর, কেন আমরা তাঁর স্তুতি করব? একদিন ব্রাহ্মনেতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে তিনি প্রশ্ন করেছিলেন, মশাই, আপনি কি ঈশ্বর দর্শন করেছেন? আমায়ও কি দর্শন করাতে পারেন? দেবেন্দ্রনাথ এ প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে বলেছিলেন, বাবা, তোমার চোখ দুটি ঠিক যোগীদের মতো। একনিষ্ঠ হয়ে সাধন কর। তুমি সফলকাম হবে। অনেক সাধু মহাত্মাকে তিনি এই প্রশ্ন করেছিলেন। কিন্তু কেউ তাঁকে বলে নি যে ভগবানকে দেখেছি। মিথ্যা কথাও বলেন নি কেউ। তারপর নিজের এক কাকার সঙ্গে যখন দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণের কাছে গিয়ে এই প্রশ্ন করলেন, তখন উত্তর পেলেন, সে কি গো? দেখেছি বৈ কি! এই যেমন তোমাদের দেখছি—এমনি করেই তো রোজ দেখছি! শুধু তাই নয়, তোমাকেও দেখাতে পারি। কিন্তু আমার কথামত চলতে হবে। রাজী হয়ে গেলেন নরেন্দ্রনাথ। তাঁর শিষ্য হয়ে হিন্দু ধর্ম প্রচারেই আত্মনিয়োগ করলেন।

রামকৃষ্ণের মৃত্যুর পরে তিনি ভারত ভ্রমণ করেন ও আমেরিকার শিকাগো ধর্ম মহাসভায় হিন্দু ধর্মের প্রতিনিধিত্ব করেন। ইউরোপেও তিনি এই ধর্মের ব্যাখ্যা করেন। তাঁর মতে ভারতের চিরকালের আদর্শ ত্যাগ ও বৈরাগ্য। তিনি চান নি যে ধর্ম ও সমাজের চাপে এ দেশের মানুষ তার কর্মশক্তি হারাবে। তাঁর চিন্তাধারায় উপনিষদের, বিশেষ ভাবে কঠোপনিষদের নচিকেতার, প্রভাব ছিল যথেষ্ট। তিনি অদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতবাদকে ধর্ম সাধনার তিনটি স্তর বলে মেনে নিলেও 'তত্ত্বমসি' বা 'অহং ব্রহ্মাস্মি'ই উপলব্ধির শেষ কথা বলে মনে করতেন। তাঁর মতে ভয়শূন্য হওয়াই ধর্ম সাধনার মূল কথা। তিনি বলতেন, 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত', 'Awake, arise and stop not till the goal is reached.' তিনি এও বলেছেন, উপনিষদ বা বেদান্ত আমাদের শুধু প্রজ্ঞাবান করে না, বীর্যবাদ ও শক্তিমানও করে। বৈদান্তিকই যথার্থ কর্মযোগী হতে পারেন।

সমাজসেবার এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করেন স্বামী বিবেকানন্দ। সর্ব জীবে দয়ার কথা শুনে রামকৃষ্ণ একদিন সমাধিস্থ হয়ে গিয়েছিলেন। তারপরেই বেগে উঠে বলেছিলেন, 'জীবে দয়া—জীবে দয়া ? দূর শালা। কীটাণুকীট তুই। জীবকে আবার দয়া কি করবি ? দয়া করবার তুই কে ? নানা, জীবে দয়া নয়—শিবজ্ঞানে জীবের সেবা।' এই কথা শুনে বিবেকানন্দ বলেছিলেন, 'কি অদ্ভুত আলোকই আজ ঠাকুরের এই কথায় পেলাম। বেদান্তজ্ঞান শুষ্ক কঠোর বলেই আমরা জানি। ভক্তির মিশ্রণ ঘটিয়ে ঠাকুর এ বেদান্তকে কি সরস কি মধুর করে তুললেন। ঠাকুর যা বললেন, তাতে বোঝা গেল, বনের বেদান্তকে ঘরে আনা যায়।' তিনি লিখলেন,

'বহু রূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি' কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর ?
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।'

এই সেবার বাণীকে সফল করার সংকল্প নিয়ে বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই এক মঠ স্থাপন করেছিলেন ; পরে ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। মঠ পূজাপাঠ ধর্ম প্রচার করে এবং মিশন জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে মানুষের সকল প্রকার সেবায় নিযুক্ত হলেন।

মাত্র ঊনচল্লিশ বৎসর বয়সে স্বামী বিবেকানন্দর মৃত্যু হয়। কিন্তু রামকৃষ্ণ মিশন তাঁর আদর্শকে আজও উজ্জীবিত রেখেছে।

নারায়ণ গুরু

বিগত শতাব্দীর শেষের দিকে তার একজন ধর্মগুরুর আবির্ভাব হয় দক্ষিণ ভারতের কেরালায়। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে ত্রিবেন্দ্রামের কিছু উত্তরে বর্কলায় তিনি সমাধিস্থ হয়ে দেহরক্ষা করেন। তাঁর সমাধিস্থলেই শিবগিরি মঠ স্থাপিত হয়েছে। নারায়ণ গুরু শুধু ধর্মগুরু নন, একজন সমাজ সংস্কারকও ছিলেন। তিনি একটি সরল বিশ্বাসের কথা প্রচার করে গেছেন—'মানুষের এক জাতি, এক ধর্ম ও এক ঈশ্বর'। 'ধর্ম যাই হোক না, মানুষকে প্রগতির পথে এগোতে হবে।'

শ্রীঅরবিন্দ

অরবিন্দের জন্ম বাঙলায় ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের পনরই অগস্ট। শিক্ষার জন্য সাত বছর বয়সেই তিনি বিলেতে যান। গ্রীক লাতিন জর্মন ফরাসী ও ইতালীয়ন শেখেন। চোদ্দ বছর পর দেশে ফিরে কর্মজীবন শুরু করেন। অরবিন্দ ছিলেন একাধারে বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ, দার্শনিক ও যোগী। কিন্তু তাঁর রাজনৈতিক জীবন খুবই সংক্ষিপ্ত—১৯০২ থেকে ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। এক সময়ে তিনি সশস্ত্র বিপ্লবের প্রয়োজন আছে মনে করেছিলেন, পরে বুঝতে পেরেছিলেন যে পরাক্রান্ত শত্রুর সঙ্গে সাক্ষাৎ সংঘর্ষে জাতির ক্ষতি হবে।

অরবিন্দ বিশ্বাস করতেন যে ভারত আধ্যাত্মিক দেশ এবং এ দেশের ধর্ম সভ্যতা ও সংস্কৃতি আদিকাল থেকে সারা বিশ্বে আলোক বিকীর্ণ করে আসছে। এই পথের সন্ধানে তিনি পণ্ডিচেরীতে চলে এলেন ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে। আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এইখানেই বসবাস করেন। তাঁর মৃত্যু হয় ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে।

এখানেই তিনি বেদ ও উপনিষদ পড়েন। উপনিষদের ব্যাখ্যা করেন নিজস্ব দার্শনিক মতবাদের ভিত্তিতে। শঙ্করের মায়াবাদ তিনি মেনে নেন নি। বলেছেন, এই জীবনের প্রতি বিমুখ না হয়ে জীবনকে গ্রহণ করেই দিব্য জীবনের জন্য সাধনা করতে হবে। তিনি বিশ্বাস করেছেন যে অধ্যাত্ম উপলব্ধির শেষ কথা আছে উপনিষদেই। উপনিষদের ঋষিরা মানুষের দিব্য জীবন লাভেরও পথনির্দেশ করে গেছেন। অতি মানসিক অধ্যাত্ম সত্যের সঙ্গে মানব জীবনের সমন্বয় হবে কী করে, তারও ইঙ্গিত তাঁরা দিয়ে গেছেন।

অরবিন্দ যোগী ছিলেন। যোগের চরম লক্ষ্য হলো উপলব্ধি। কিন্তু অরবিন্দের পূর্ণ যোগে ব্যক্তিগত উপলব্ধি হলো তার কাজের আরম্ভ, আর তার মুখ্য উদ্দেশ্য হলো প্রকাশ। এর জন্য প্রথমে তিনি অতিমানস শক্তির নাগাল পেতে চাইলেন ; সেখানে ওঠার উদ্দেশ্য হচ্ছে সে শক্তিকে নামিয়ে আনা। তিনি বিশ্বাস করলেন যে সেই শক্তির স্পর্শ পেয়ে আমাদের চেতনা

আলোকময় হবে। রূপান্তর হবে মন প্রাণ ও দেহের। সেই অতিমানসের শক্তি বস্তু জগতের উপরে তার প্রভাব ফেলে যুগান্তর আনবে ধীরে ধীরে। অন্ধকারে আচ্ছন্ন এই বস্তু জগতের রূপান্তর এক দিনে হবে না। তার জন্য অপেক্ষা করতে হবে, ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে হবে। অরবিন্দ বুদ্ধের মতো জাবজ্বালার প্রকাশ চক্র থেকে অব্যাহতি চান নি; চেয়েছেন জীবনের পূর্ণ রূপান্তর। অধ্যাত্মের আলোয় বস্তুর রূপান্তর হবে। আমাদের দেহ আত্মোপলব্ধির অন্তরায় না হয়ে উপলব্ধির সহায় হবে।

তাঁকে কেন্দ্র করে তাঁরই আদর্শ সার্থক করবার জন্য পণ্ডিচেরাতে একটি আশ্রম গড়ে উঠেছে। এই প্রতিষ্ঠান 'অরোভিল' নামে আর একটি পরিকল্পনা রূপায়ণ করেছেন। অরবিন্দের নামের এই শহরটি এমন হবে যে পৃথিবীর মানুষ এই পরিচয় দিয়ে সব দেশের মানুষই সেখানে স্বাধীন ভাবে থাকতে পারবে। এই আন্তর্জাতিক শহরে মৌলিক চিন্তার অধিকার থাকবে সব মানুষের।

রমণ মহর্ষি

রমণ মহর্ষির নাম ছিল ভেঙ্কটরমণ আইয়ার। জন্ম অরবিন্দের সাত বৎসর পরে ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে তামিলনাড়ু রাজ্যে। তিনি এই রাজ্যেরই অরুণাচলম তীর্থে সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করে অরবিন্দের মতোই ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে দেহরক্ষা করেন। মহর্ষি তাঁর সারা জীবনের উপলব্ধির কথা 'আমি কে' নামে একটি গ্রন্থে চল্লিশটি তামিল শ্লোকে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। এই গ্রন্থ নানা ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

মহর্ষি বলতেন, আমাদের নৈতিক সূত্র যখন অসংখ্য থেকে একে দাঁড়াবে, তখনই আমাদের জীবন পূর্ণ হবে। বহুর জ্ঞান তো জ্ঞান নয়, একের জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান। এই একের জ্ঞানেই মুক্তি, আর মুক্তিই জীবনের উদ্দেশ্য। মুক্তি পূর্ণতা, মুক্তিতেই বিশ্বাত্মবোধ।

মৃত্যুর পরে আত্মার কী হয়, এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, মৃত্যুর পরে আত্মার কী হয় তার জন্য মাথা না ঘামিয়ে জীবন থাকতেই আত্মাকে

জানতে হয়। আত্মার সম্বন্ধে জ্ঞান হলেই আর সব কিছু জানা হয়। আত্ম-জ্ঞান থেকেই বিশ্বজ্ঞান ও ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে।

মৃত্যুর পূর্বে মহর্ষি দেহকে কলাপাতার সঙ্গে তুলনা করেছেন। জীবনের ভোজ শেষ হয়ে গেলে উচ্ছিষ্ট কলাপাতার মতো দেহটাকে বিসর্জন দিতে কোনো দুঃখ হয় না। মৃত্যুর পরে মানুষ তো কোথাও যায় না ; যেখানে ছিল সেইখানেই থাকে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এই প্রসঙ্গে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের কথা না বললে আধুনিক যুগের অধ্যাত্ম চিন্তার কথা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তাঁর জন্ম বাঙলায় ১৮৬১ এবং মৃত্যু ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে। তিনি সাধক বা দার্শনিক বলে পরিচিত নন, কিন্তু বৈদিক ভারতের দিব্যদৃষ্টি সম্পন্ন ঋষিদেব মতো প্রজ্ঞাবান কবি। উপনিষদের বাণী তিনি নিজের হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন এবং সেই উপলব্ধির কথা তাঁর নৈবেদ্য ও গীতাঞ্জলির কবিতায় এবং শান্তিনিকেতন, ধর্ম, মানুষের ধর্ম প্রভৃতি প্রবন্ধ গ্রন্থে প্রকাশ করে গেছেন।

ঈশ্বর-প্রেমের মত্ততাকে তিনি শ্রদ্ধা করেন নি। বলেছেন—

> যে ভক্তি তোমারে লয়ে ধৈর্য নাহি মানে,
> মুহূর্তে বিহ্বল হয় নৃত্য-গীত-গানে
> ভাবোন্মাদমত্ততায়, সেই জ্ঞানহারা
> উদ্‌ভ্রান্ত উচ্ছল যেন ভক্তিমদধারা
> নাহি চাহি নাথ। —নৈবেদ্য ৪৫

তিনি শ্রদ্ধা করেছেন উপনিষদের তত্ত্বদর্শী ঋষিকে। তিনি বলেছেন—

> তোমারে বলেছে যারা পুত্র হতে প্রিয়,
> বিত্ত হতে প্রিয়তর, যা-কিছু-আত্মীয়
> সব হতে প্রিয়তম নিখিল ভুবনে,
> আত্মার অন্তরতর, তাদের চরণে
> পাতিয়া রাখিতে চাহি হৃদয় আমার। —নৈবেদ্য ৭৯

মানুষের কর্তব্যের সম্বন্ধে তিনি বলেছেন—

ক্ষমা যেথা ক্ষীণ দুর্বলতা,
হে রুদ্র, নিষ্ঠুর যেন হতে পারি তথা
তোমার আদেশে। যেন রসনায় মম
সত্য বাক্য ঝলি ওঠে খরখড়্গসম
তোমার ইঙ্গিতে। যেন রাখি তব মান
তোমার বিচারাসনে লয়ে নিজ স্থান।
অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে। —নৈবেদ্য ৭০

স্বামী বিবেকানন্দর মতো তিনিও ভয়কে জয় করতে বলেছেন।—

এ দুর্ভাগ্য দেশ হতে হে মঙ্গলময়
দূর করে দাও তুমি সর্ব তুচ্ছ ভয়—
লোক ভয়-রাজ ভয়, মৃত্যু ভয় আর। —নৈবেদ্য ৪৮

ঈশ্বর যে এক দিকে সত্য ও জ্ঞান স্বরূপ এবং অন্য দিকে আনন্দ ও অমৃত স্বরূপ, রবীন্দ্রনাথ এ কথা নিজের মতো করে বলেছেন।—
'ঈশ্বরের ইচ্ছা যে দিকে নিয়ম রূপে প্রকাশ পায়, সেই দিকে প্রকৃতি—আর ঈশ্বরের ইচ্ছা যে দিকে আনন্দ রূপে প্রকাশ পায়, সেই দিকে আত্মা। এই প্রকৃতির ধর্ম বন্ধন আর আত্মার ধর্ম মুক্তি। এই সত্য এবং আনন্দ, বন্ধন এবং মুক্তি তাঁর বাম এবং দক্ষিণ বাহু। এই দুই বাহু দিয়েই তিনি মানুষকে ধরে রেখেছেন।'
তাই তিনি বলেছেন—

বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি, সে আমার নয়।
অসংখ্য বন্ধন-মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ।...
...ইন্দ্রিয়ের দ্বার

রুদ্ধ করি যোগাসন, সে নহে আমার।
যে কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে
তোমাব আনন্দ ববে তাব মাঝখানে।

মোহ মোর মুক্তিরূপে উঠিবে জ্বলিয়া
প্রেম মোব ভক্তিরূপে বহিবে ফলিয়া। —নৈবেদ্য

নবম পরিচ্ছেদ

উপসংহার

বিশ্বের প্রাচীনতম রচনার যে নিদর্শন আমরা দেখতে পাই, তা থেকে সে যুগের মানুষের মন ও চিন্তাধারার সম্বন্ধে কিছু অনুমান করা সম্ভব। নিজের চারিদিকে পৃথিবীর বুকে ও অন্তরীক্ষে প্রকৃতির আশ্চর্য রূপ ও বিচিত্র লীলা দেখে মানুষ যুগপৎ আনন্দ ও বিস্ময়ে অভিভূত হতো; কখনও বা তার রুদ্র মূর্তি দেখে ভয় ও ভাবনায় বিহ্বল হতো। মানুষের প্রথম প্রার্থনার মন্ত্র উচ্চারিত হলো প্রকৃতির এই সব শক্তির উদ্দেশে। আকাশের সূর্যই বোধহয় প্রাগৈতিহাসিক যুগের প্রথম দেবতা। তারপর একে একে যুক্ত হলেন বজ্রের দেবতা ইন্দ্র, চন্দ্র, অগ্নি ও জলাধিপতি বরুণ। কিন্তু এই সব দেবতার পূজা প্রচলিত হবার আগেই সৃষ্টি-শক্তির আধার রূপে লিঙ্গ পূজার প্রচলন হয়েছিল বলে মনে হয়। প্রাগ্‌বৈদিক যুগে ব্যাবিলনে ও মিশরে সূর্যের স্তব-রচনা হয়েছে এবং সিন্ধু উপত্যকায় আবিষ্কৃত হয়েছে শিবের মূর্তি ও লিঙ্গ পূজার নিদর্শন।

তারপর মানুষের মনে সেই চিরকালের প্রশ্ন জাগল। প্রকৃতির যে রূপ দেখে আমরা আনন্দে বিস্ময়ে ও ভয়ে দেবতা জ্ঞানে স্তোত্র পাঠ করি। তাদের সৃষ্টি করল কে? এই বিশাল বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা কি কেউ নেই? কার শক্তিতে চন্দ্র সূর্যের উদয়াস্ত হয়? কার শাসনে প্রকৃতি এমন নিয়ম-বদ্ধ? সবার চোখের আড়ালে থেকে কোনো বিরাট শক্তি কি সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করছেন না? উচথ্যের অপত্য দীর্ঘতমা ঋষি প্রশ্ন করলেন, আমি অজ্ঞান কিছু না জেনেই জ্ঞানী মেধাবীগণের নিকট জানবার জন্য জিজ্ঞাসা করছি। যিনি এই ছয় লোক স্তম্ভন করেছেন, যিনি জন্ম-রহিত-রূপে নিবাস করেন তিনি কি সেই এক?—

অচিকিত্বাঞ্চিকিতুষশ্চিদত্র কবীন্ পৃচ্ছামি বিদ্মনে ন বিদ্বান্।
বি যস্তস্তম্ভষলিমা বজাংস্যজস্যব্রূপে কিমপি স্বিদেকম্॥

—ঋগ্বেদ ১।১৬৪।৬

এই সৃষ্টিকর্তাব চিন্তা থেকেই ঈশ্ববেব জন্ম। ঈশ্বব আছেন কি নেই, থাকলে তাঁব ৰূপ কা গুণ কী, আব না থাকলে এই বিশ্ব প্রকৃতি কেমন কবে চলছে—এই চিন্তাই যুগে যুগে মানুষকে নানা ভাবে আলোড়িত কবেছে।

ভাবতেব বৈদিক সমাজে ঈশ্ববেব সন্ধান দুটি ভিন্ন পথে অগ্রসব হযেছিল। কোনো ঋষি যাগ-যজ্ঞ প্রভৃতি কর্মকাণ্ডেব দ্বাবা ঈশ্বব বা দেবতাদেব কৃপা-লাভেব জন্য সচেষ্ট হলেন, আবাব কেউ জ্ঞানকাণ্ডই প্রশস্ত পথ ভেবে জ্ঞানার্জন ও তপস্যায ঈশ্ববেব অনুসন্ধান কবতে লাগলেন। ঈশ্বব অনু-সন্ধানেব এই দুটি ধাবা আজও অব্যাহত আছে।

বেদেব ধর্ম কোনো সাম্প্রদাযিক ধর্ম নয, এ বিশ্বমানবেব ধর্ম। তাই হিন্দুব বেদ যুগোত্তীর্ণ হযে প্রতিষ্ঠা পেযেছে বিশ্বে। বেদেব ঋষিবা সহজ সবল জীবনযাত্রাব আদর্শে একটি গভীব অধ্যাত্ম বিশ্বাসেব ভিৎ বচনা কবে গেছেন। কোনো ঋষি বেদেব অঙ্গ ব্রাহ্মণে কর্মকাণ্ডেব নিযমাদি বিধিবদ্ধ কবলেন এবং অবণ্যে কী পাঠ কবতে হবে তাব নির্দেশ দিলেন আবণ্যকে, আর অন্য ঋষিবা উপনিষদে বললেন যে যাগযজ্ঞ ও পূজার্চনায ঈশ্বব চিন্তা ও শান্তিলাভ হতে পাবে, কিন্তু ঈশ্ববকে পাওযা যাবে না। তাঁব কাবণ ঈশ্বব পাবাব মতো কোনো বস্তু নন। একমাত্র জ্ঞানেব দ্বাবাই তাব অন্বেষণ সার্থক হতে পাবে।

ঋষিবা বললেন যে সকল জ্ঞানেব আশ্রয হলো আত্মজ্ঞান। আত্মাকে না জানলে কোনো বস্তুই জানা হয না। আব আত্মাই পবব্রহ্ম। তাঁকে চোখ দিয়ে দেখা যায় না। সেই পুরুষেব জন্ম নেই, মৃত্যু নেই, কোনো কাবণে তাঁব উৎপত্তি হয নি। তিনি নিজেও নিজেব কাবণ নন। তিনি জ্ঞান স্বৰূপ, তিনি অজ নিত্য শাশ্বত ও পুবাতন। দেহ বিনষ্ট হলেও তিনি নিহত হন না। তিনি আনন্দৰূপ অমৃত। আনন্দ থেকেই সবকিছু উৎপন্ন

হয়েছে, আনন্দেই তা বিধৃত আছে এবং অন্তিমে আনন্দেই সবকিছু বিলীন হচ্ছে।

এর পরে ঋষিরা কল্পসূত্রে সমগ্র কর্মকাণ্ডের আলোচনা বিধিবদ্ধ করলেন। আর একই সময়ে কয়েকজন ঋষি তাঁদের দার্শনিক মতবাদ প্রচার করলেন। ষড়দর্শন আজও ভারতে সুপ্রতিষ্ঠিত। কপিলের সাংখ্য দর্শন, কণাদের বৈশেষিক দর্শন, গৌতমের ন্যায় দর্শন। পতঞ্জলির পাতঞ্জল দর্শন বা যোগশাস্ত্র, জৈমিনির পূর্ব মীমাংসা এবং বাদরায়ণ বা বেদব্যাসের বেদান্ত দর্শনে জীব-জগতে দুঃখের কারণ অন্বেষণ করে সুখের সন্ধান দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। এ ছাড়াও আছে চার্বাক দর্শন।

এই ষড়দর্শনকে স্থূলভাবে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। সাংখ্য ও পূর্ব মীমাংসা এক শ্রেণীর, ন্যায় ও বৈশেষিক দ্বিতীয় শ্রেণীর এবং পাতঞ্জল ও বেদান্ত অন্য এক শ্রেণীর দর্শন। সাংখ্য ও মীমাংসা দর্শনে প্রকারান্তরে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করা হয়েছে, ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার না করলেও বলা হয়েছে যে মানুষের সুখদুঃখের সঙ্গে ঈশ্বরের অস্তিত্বের কোনো সম্পর্ক নেই এবং পতঞ্জলির যোগশাস্ত্র ও বেদ-ব্যাসের বেদান্ত দর্শনে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়েছে। যোগশাস্ত্রে ঈশ্বরের সান্নিধ্যের উপায় নির্দেশ করা হয়েছে, কিন্তু তা হয়তো মুখ্য উপায় নয়। শুধু বেদান্তেই স্পষ্টভাষায় বলা হয়েছে যে ঈশ্বর বা ব্রহ্মই সত্য, আর সব মিথ্যা ; পরমাত্মার সঙ্গে আত্মার মিলন হলেই সকল দুঃখের অবসান হয়।

কিন্তু চার্বাক দর্শনের সার কথা হলো, 'দেহ ভিন্ন অন্য আত্মার অস্তিত্ব নেই। আত্মাই দেহ, আত্মার ধ্বংসেই দেহের ধ্বংস। ইহ সংসারের সুখই পরম পুরুষার্থ। পরলোক ও পুনর্জন্ম নেই। মৃত্যুই অপবর্গ।' চার্বাকের উপদেশ, যতদিন বাঁচবে সুখভোগ করে খাও, দেহ ভস্মীভূত হলে আর তো ফিরে আসবে না!

মনে হয় যে এই সব দর্শনশাস্ত্র প্রচারিত হবার অব্যবহিত পরেই ঋষিরা জনসাধারণের উপযোগী স্মৃতিশাস্ত্র প্রচার করেন। মানুষকে ধর্মপথে পরি-

চালিত করবার জন্য বেদের উপদেশ সংকলন করে কুড়িটি স্মৃতি বা ধর্ম সংহিতার প্রচার হয়। তার মধ্যে মনুসংহিতাই প্রধান, তারপর যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতার স্থান। এই সব স্মৃতিগ্রন্থে সেকালের একটি সভ্য সমাজের চিত্র পরিষ্কার ভাবে ফুটে উঠেছে। ইহলোকের পাপপুণ্যের জন্য পরলোকে তাব ফল ভোগের কথা আছে, কিন্তু ঈশ্বরেব সম্বন্ধে কোনো দার্শনিক আলোচনা নেই। স্মৃতি রচয়িতা ঋষিরা ঈশ্ববেব অস্তিত্ব প্রমাণের কোনো চেষ্টা করেন নি।

অষ্টাদশ পুরাণ ও অষ্টাদশ উপপুবাণেও ঈশ্ববেব অস্তিত্ব নিয়ে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করা হয় নি। ঈশ্বর ও দেবতাকে স্বতঃসিদ্ধ বলেই মেনে নেওয়া হয়েছে। পবলোক ও জন্মান্তর নিয়েও কোনো সন্দেহ প্রকাশ কবা হয় নি। একদা পুরাণ পাঠের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল লোকশিক্ষা, আচাব প্রতিষ্ঠা, সমাজে শৃঙ্খলা রক্ষা এবং ধর্মাচবণ শিক্ষা। এবই জন্য সৃষ্টিবহস্য থেকে আরম্ভ করে দেবতার মাহাত্ম্য, ভতত্ত্ব পুবাতত্ত্ব ইতিহাস দর্শন জ্যোতিষ ও জ্ঞানবিজ্ঞানেব নানা আলোচনা এই সব গ্রন্থে পাওয়া যায়। ধর্ম-অধর্ম ও পাপ-পুণ্যেব সংজ্ঞা পুবাণে খবই স্পষ্ট। তাই পুবাণকে আমবা বেদেব মতোই পবিত্র ধর্মগ্রন্থ বলে মেনে নিতে পাবি।

মহাভাবতের অন্তর্গত গীতাও আমাদেব ধর্মগ্রন্থ। পুরাণেব মতো মহাভাবত তথা গীতাও বেদব্যাসেব বচনা। বেদব্যাস মনে কবেছিলেন যে ষড়দর্শনেব গভাব তত্ত্ব সাধারণ মানুষের উপযোগী হয় নি। কপিলেব সাংখ্য মতে প্রকৃতি পুরুষেব প্রভেদ জ্ঞানে যে আত্মজ্ঞান লাভ হয় তা তপস্বাব পক্ষেই সম্ভব। তাঁর নিজেব প্রচারিত বেদান্তদর্শনের ব্রহ্মজ্ঞানও অল্পবুদ্ধি মানুষকে উদ্‌ভ্রান্ত করেছে। মানুষ যাতে পবমাত্মাকে বিস্মৃত না হয়, তাবই জন্য তিনি মহাভারতের বিশাল কাহিনার মধ্যে গীতাব স্থান দিলেন। বললেন, কর্মকাণ্ডে যেমন মুক্তিলাভ সম্ভব তেমনি আত্মজ্ঞান লাভেও সম্ভব। আত্মা পরমাত্মাবই রূপ, প্রতি আত্মায় বিশ্বাত্মা আছেন। নিজেব আত্মার মধ্যেই সেই পরমাত্মার বিশ্বরূপ দর্শন সম্ভব। এই তত্ত্বকথা তিনি কৃষ্ণের মুখ দিয়ে বললেন, কৃষ্ণের মধ্যে অর্জুন দেখলেন সেই বিশ্বরূপ।

তন্ত্রমতও অর্বাচীন নয়। এই মতে শিব ও শক্তিব উপাসনায় দ্বৈত ও অদ্বৈত ভাবেব প্রকাশ হয়েছে। কখনও বা তাঁদেব এক বলা হয়েছে—তিনি এক ও অদ্বিতীয, তিনি সত্য ও সদ্রূপ, তিনি পবাৎপব ও স্বপ্রকাশ। তিনি সদাপূর্ণ ও সচ্চিদানন্দ। জল থেকে যেমন বুদ্বুদ উঠে জলেই মিলিযে যায, তেমনি প্রকৃতি থেকেই ব্রহ্মাণ্ডেব সৃষ্টি হযে প্রকৃতিতেই লয প্রাপ্ত হয। ইহলোকে যে যেমন পাপপুণ্য কবে, তাব সেই মতোই নবক ভোগ। দেহ থেকে দেহান্তবে যায জীব। মুক্তি লাভই তন্ত্র সাধনাব মুখ্য উদ্দেশ্য।

বিশ্বেব বিভিন্ন ধর্মেব আলোচনায আমবা কোনো নূতন কথা পাই না। যে সব প্রশ্ন হিন্দু ঋষিদেব গভীব ভাবে নাড়া দিযেছে এবং যা তাঁবা বিভিন্ন দর্শন শাস্ত্রে নানা যুক্তি-তর্কেব সাহায্যে আলোচনা করেছেন, তাবই কিছু প্রতিচ্ছবি দেখা যায অনেকগুলি ধর্মে।

সাংখ্য-দর্শন প্রণেতা কপিলেব মতো জৈনবা ঈশ্ববেব অস্তিত্বস্বীকাব কবেন না। তাঁদেব মতে মহাবীবই মুক্তিদাতা, সব প্রাণীব হৃদযে তিনি জীবরূপে অবস্থান কবছেন। এই আত্মাই সকলেব দেহে আছে। জীব লোক সিদ্ধ ও সিদ্ধিতত্ত্বেব জ্ঞান হলেই মানুষ পবমপদ লাভ কবে। চার্বাকেব মতো জৈনবাও বিশ্বেব স্রষ্টাকর্তারূপে ঈশ্ববেব অস্তিত্ব মানেন না।

বৌদ্ধদেব মধ্যে হীনযান সম্প্রদায গৌতম বুদ্ধ প্রচাবিত ধর্মই গ্রহণ কবেছিলেন। তাবাও ঈশ্ববেব অস্তিত্ব স্বীকাব কবেন না। তাঁদেব মতে দেহ নশ্বব, ধ্যান ও যোগেব দ্বাবা জ্ঞানলাভ হয, নির্বাণ মুক্তি তাব পবে। মহাযান সম্প্রদায শূন্যবাদ মেনে নিযেছেন এবং এক ঈশ্ববেব অস্তিত্ব স্বীকাব না কবলেও পববর্তী কালে তন্ত্রোক্ত হিন্দু দেবদেবী তাদেব পূজা-উপাসনায স্থান লাভ কবেছে। তাবা বলেন, আত্মা ভোগী বিনাশী ও ক্ষণস্থাযী, শূন্যতাই নিত্য অক্ষয ও অব্যয। বিশ্বসৃষ্টিব পূর্বে সবই শূন্য ছিল, শূন্য ছাড়া আব সবই মিথ্যা।

জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মেব জন্মভূমি ভাবত। এই দুই ধর্মে ঈশ্ববেব অস্তিত্ব স্বীকাব কবা হয নি, কিন্তু জন্মান্তববাদে বিশ্বাস কবা হযেছে। ধর্ম বলে যা স্বীকাব কবা হযেছে তা নৈতিক জীবন যাপনেব নীতি। জৈনবা ঈশ্ববেব

পরিবর্তে চব্বিশ জন তীর্থঙ্করের অর্চনা করেন এবং বৌদ্ধরা বুদ্ধকেই দেবতা জ্ঞানে উপাসনা করেন। মহাযান বৌদ্ধদের মধ্যে তান্ত্রিক দেবদেবীর পূজাও প্রচলিত আছে।

এশিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে যে কটি ধর্মের জন্ম হয়েছে, তারা এক ঈশ্বরে বিশ্বাসী। জরথুশ্ত্র এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন। পার্সীদের মতে তিনিই বিশ্বে সর্বপ্রথম এক ঈশ্বরের কথা প্রচার করেছেন। তিনি দ্বৈতবাদী ছিলেন। মন বাক্ ও কর্ম—এই তিনের উপরে তাঁর ধর্ম প্রতিষ্ঠিত।

ইহুদীদের জুডা ধর্মও খুব প্রাচীন। তারাও একেশ্বরবাদী। ঈশ্বরই জগৎ সৃষ্টি করে তা পালন করছেন। তাঁর মসীহ বা অবতারের জন্ম এখনও হয় নি। তাদেব মধ্যেই তিনি জন্মগ্রহণ করবেন। মৃতরা সেদিন কবর থেকে উঠে তাঁর স্তব করবে। তাদের কোনো আচার্য নেই, যজ্ঞবেদী বা ধর্মানুষ্ঠান নেই। কিন্তু পাপ-পুণ্যেব বিচাব আছে। জীবাত্মাব দেহান্তব গ্রহণেও তারা বিশ্বাস করে।

এই ইহুদী সমাজেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন যীশু খ্রীষ্ট। খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বীরা এঁকেই ঈশ্বরের পুত্র বলে মেনে নিয়েছেন। এবাও এক ঈশ্বর বিশ্বাসী এবং এ কথাও বিশ্বাস করে যে, যীশু খ্রীষ্টকে অবলম্বন করেও মুক্তি লাভ হবে।

পরবর্তী কালে ইসলাম ধর্মেরও জন্ম হয়েছে এই অঞ্চলে। এক ঈশ্বরে অপরিসীম বিশ্বাস এই ধর্মেব মূল কথা। তিনিই বিশ্বের স্রষ্টা। তার মহিমা উপলব্ধি করে প্রচারের জন্য তিনি হজরত মোহাম্মদকে প্রেরণ করেছিলেন। তাঁরই কাছে পৌঁছে দিয়েছেন ইসলাম ধর্মের কথা।

এশিয়ার অন্য প্রান্তে চীন দেশে আরও দুটি ধর্মমত প্রচারিত হয়েছিল। এই অঞ্চলে যে ধর্মমত প্রচলিত ছিল লাও-ৎসু তাকেই সুসংবদ্ধ করে তার নাম দেন তাও বাদ। এই তাও শব্দটি হিন্দু ধর্মের ঋত শব্দের মতো গভীর অর্থব্যঞ্জক। যে পথে লক্ষ্যে পৌঁছনো যায়, সেই পথকেই তাও বলে। সকল গুণের অতীত এক সত্তাকে তাও বলা হয়েছে। তাও নিরাকার শক্তি, ঈশ্বর তাঁরই সাকার প্রকাশ। নিষ্কাম ধর্মাচরণে যে জ্ঞান

লাভ হয়, সেই জ্ঞানেই তাওকে জানা যায় ও তাঁর সঙ্গে একাত্ম হওয়া যায়।

এই চীন দেশেই জন্মগ্রহণ করে কনফুশিয়স ঈশ্বরের চিন্তা করেন নি; বুদ্ধের মতো তিনি শুধু মানুষের দুঃখের চিন্তাই করেছিলেন। তিনি বলেছেন, মানুষকে জানাই জ্ঞান, মানুষকে ভালবাসলেই পুণ্য এবং মানুষের দুঃখ দূর করাই ধর্ম।

গুরু নানকের শিখধর্মের জন্ম ভারতে। তার বহু আগেই হিন্দু ধর্মে নানা সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছিল। শঙ্করাচার্য বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের প্রভাব খর্ব করে সনাতন হিন্দু ধর্মের প্রতিষ্ঠা স্থাপনের জন্য দিগ্বিজয় করেছিলেন। তিনি তাঁর অদ্বৈতবাদে ঈশ্বরকেই একমাত্র সত্য ও জগৎকে মায়া বলেছেন। কিন্তু যাগ যজ্ঞ ও প্রতিমা পূজার বিরোধিতা করেন নি। পরবর্তী বৈষ্ণবাচার্যেরা বিষ্ণু ও তার অবতারের পূজার বিধান দিয়েছেন। শৈবরা শিব পূজা, শাক্তরা শিবের শক্তির নানা দেবীরূপের পূজা, গাণপত্যরা গণেশের পূজা এবং সৌররা সূর্যের পূজা প্রশস্ত বলে মনে করেছেন। শক্তিপূজায় তান্ত্রিক মত প্রবল হয়ে উঠেছিল।

মধ্যযুগের আরব বণিকরা তাদের দেশ থেকে ইসলাম ধর্ম ভারতে আমদানি করে। আর দেশের ভক্ত ও সন্তরা বলতে থাকেন, ধর্ম নয়, সম্প্রদায় নয়, জাতি বর্ণের বিচার নয়, ভক্তি দিয়েই ভগবানকে পাওয়া যায়। এই সমন্বয় সাধনের যুগেই গুরু নানক তাঁর নিজের ধর্মমত প্রচার করলেন। পর পর দশ জন গুরু এই ধর্মমতকে একটা সুসংহত রূপ দিয়ে তাকেই শিখধর্ম বলে প্রতিষ্ঠা করলেন।

এ যুগের কেউই ঈশ্বরকে অস্বীকার করলেন না। সব ধর্মেরই এক ঈশ্বর. তিনিই সৃষ্টিকর্তা, তাঁরই কৃপায় মানুষের মুক্তি। কিন্তু হিন্দুধর্মে ঈশ্বর নিরাকার না তাঁর রূপ আছে। এই নিয়েই প্রধান মতভেদ। ঈশ্বরকে যাঁরা নিরাকার বললেন, তাঁরা জ্ঞানের দ্বারা তাঁর কাছে পৌঁছতে চাইলেন। আর যাঁরা তাঁর রূপে বিশ্বাস করলেন, তাঁরা পৌরাণিক মতে অসংখ্য দেব-দেবীর কল্পনা করে নানা সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করলেন; বললেন যে প্রতীক

মূর্তির উপরে পূজা করেই ঈশ্বরকে পাওয়া যাবে।

আজকের জগতে বিজ্ঞানের অবিশ্বাস্য উন্নতির পরেও একটি মূল প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় নি। একদা বেদের নেম ঋষি যে প্রশ্ন করেছিলেন—ক ঈঃ দদর্শ, কমভি স্টবাম? কে ঈশ্বরকে দেখেছে, কেন আমরা তার স্তুতি করব?—আজ পর্যন্ত কেউ এ প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারেন নি। ঈশ্বরকে যাঁরা স্বীকার করেন নি, তাঁরা এইজন্যই স্বীকার করেন নি যে এর কোনো প্রমাণ নেই। প্রমাণের অভাবে কোনো সত্যকেই সত্য বলে মেনে নেওয়া যায় না।

কিন্তু একটি মূল সত্যকে অস্বীকার করাও যায় না। উদ্ভিদ বা প্রাণীর জন্মের পিছনে যেমন একটা বীজ আছে, তেমনি সৃষ্টির পিছনেও আছেন একজন সৃষ্টিকর্তা। জীবাত্মা যেমন জীবকে পরিচালনা করে, তেমনি সৃষ্টি পরিচালনার জন্যেও একটা বিরাট শক্তি নিশ্চয়ই আছে। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের কোন্‌খানে সেই শক্তির উৎস, বিজ্ঞান আজও তার কোনোও সন্ধান পায় নি। বিজ্ঞান তাই নীরব। জানি না বলে কিছু অস্বীকার করা বিজ্ঞানের ধর্ম নয়।

প্রকৃতির অপরিসীম শক্তির মধ্যে আমরা ঈশ্বরের কল্পনা করি। প্রকৃতির ধর্মই আমাদের ধর্ম, যুগ যুগ ধরে অর্জিত জ্ঞানই আমাদের গুরু। প্রকৃতির নিয়মেই পাপ পুণ্যের বিচার—নিয়ম পালনে পুণ্য ও লঙ্ঘনে পাপ। কর্মফল এই জীবনেরই সঞ্চয়, এই জীবনেই তার ভোগ। জন্মান্তরের কল্পনা মানুষকে ধর্ম পথে পরিচালনার জন্য। ঈশ্বরে ভক্তি ও জ্ঞানে ঈশ্বরের অনুসন্ধান মানুষের জীবনকে মহিমান্বিত করে।

● শুভমস্তু ●

গ্রন্থপঞ্জী

1. The World's Great Scriptures by Lewis Browne.
2. Encyclopedia of Religion and Ethics by Hastings.
3. Development of Religion and thought in Ancient Egypt by J. H. Breasted.
4. Sacred Books of the World by A. C. Bouquet.
5. A short History of the World by H. G. wells.
6. Glimpses of Ancient India by Radha Kumud Mukherjee.
7. North Indian Saints—Published by G. A. Natesan & Co.
8. A Sketch of the Religious Sects of the Hindus by H. H. Wilson.

৯। অক্ষয়কুমার দত্ত রচিত ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায় প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ।

১০। নগেন্দ্রনাথ বসু সংকলিত বিশ্বকোষ ২২ খণ্ড।

১১। দুর্গাদাস লাহিড়ী প্রণীত পৃথিবীর ইতিহাস।

১২। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত ভারতকোষ ৫ খণ্ড।

১৩। সাক্ষরতা প্রকাশন কর্তৃক প্রকাশিত বিশ্বকোষ।

১৪। ধীরেন্দ্র মোহন দত্ত রচিত ধর্ম সমীক্ষা।

১৫। ক্ষিতিমোহন সেন রচিত ভারতের সংস্কৃতি।

১৬। নলিনীকান্ত ব্রহ্ম রচিত ভারতের অধ্যাত্মবাদ।

১৭। দুর্গাদাস লাহিড়ী সম্পাদিত ঋগ্বেদ সংহিতা।

১৮। রমেশচন্দ্র দত্ত অনূদিত ঋগ্বেদ সংহিতা।

১৯। হরফ প্রকাশনা প্রকাশিত বেদ ৫ খণ্ড।

২০। হরফ প্রকাশনা প্রকাশিত উপনিষদ ২ খণ্ড।

২১। হরফ প্রকাশনা প্রকাশিত কোরআন শরীফ।

২২। বসুমতী সাহিত্য মন্দির প্রকাশিত উপনিষদ গ্রন্থাবলী।

২৩। প্রবোধ চন্দ্র বাগচী রচিত বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য।

২৪। অমূল্য চন্দ্র সেন রচিত জৈনধর্ম।